বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা

বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

- শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
- ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
- ডক্টব শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু
- শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী
- শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
- কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়
- শ্রীকালিপদ সেন
- শ্রীরাধারাণী দেবী
- শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
- শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
- ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
- শ্রীসজনীকান্ত দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা ১২

বিষয়-সূচী

জন্ম : ২৪ পরগণা : কাঁঠালপাড়া : ১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫ : ইংরাজী : ২৬শে জুন, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ : রাত্রি ৯ ঘটিকা ॥

মৃত্যু : ২৬শে চৈত্র, ১৩০০ : ইংরাজী : ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ ॥

বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

দুর্গেশনন্দিনী ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ)

দুর্গেশনন্দিনী-প্রকাশের তারিখ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হইয়া আছে। উহা যে কেবল একখানি নূতন গদ্য-কাব্যই নয়, পরন্তু বাংলা-সাহিত্যের নবজন্মের নিঃসংশয় প্রমাণ, এবং কেমন প্রমাণ, তাহা আজিকার দিনে বুঝিয়া লইতে হইলে, উহার সেই প্রকাশ-তারিখ ইং ১৮৬৫ সালে ফিরিয়া যাইতে হয়। উহার পূর্বের ইতিহাস বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস; প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক নিরন্তর প্রয়াসের ফলে সেই গদ্য কিছু শক্তি ও শ্রী-সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সে পর্যন্ত তাহাতে সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টি—সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিতগণের রুচি ও আদর্শ-অনুযায়ী সাহিত্য-রচনা—সম্ভব হয় নাই। ততদিনে অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, তারাশংকর প্রভৃতির রচনায় যে সাহিত্য-শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা অনেকটা শ্রমশিল্পের মত,—সৃষ্টি-প্রতিভার দিব্যদীপ্ত তাহাতে ছিল না। এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত, বঙ্কিমচন্দ্র নামক এক ইংরেজীনবিশ নবীন যুবা 'দুর্গেশনন্দিনী' নাম দিয়া যে উপন্যাসখানি সেই সমাজে সহসা নিক্ষেপ করিলেন,তাহাতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'দুর্গেশনন্দিনী' যে একটা যুগান্তর বা নবযুগসংক্রান্তির তোরণদ্বার হইয়া আছে, তাহার কারণ কিন্তু ঐ রসসৃষ্টির অভিনবত্ব; পূর্ববর্তী সেই গদ্য-সাহিত্যের ধারা অর্থাৎ বাংলা গদ্যের সেই বিকাশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক অল্পই ছিল। সেইকালে বাংলা গদ্যে ভাষার যেটুকু উন্নতি হইয়াছিল—ভাষার সেই প্রথম যৌবন-চিহ্নও দুর্গেশনন্দিনীতে নাই; বিদ্যাসাগরী ভাষার যে প্রভাব উহাতে আছে বলিয়া মনে হয়, লেখক পদে পদে সেই প্রভাবকে যেন অগ্রাহ্যই করিয়াছেন; এমন অশুদ্ধ—শুধুই ব্যাকরণ নয়—ইডিয়ম-বিরুদ্ধ, শিথিল, এবং ছন্দোহীন বাক্যযোজনা কোন সার্থক রসসৃষ্টিমূলক রচনায় কখনো লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ ভাষা-হিসাবে দুর্গেশনন্দিনীর মত অপকীর্তি আর নাই; সেদিক দিয়া বিচার করিলে, লেখককে অতিশয় অক্ষম বলিয়া বিদায় দিতে হয়। ইহার ভাষা শুধু দুর্বলই নয়, লেখনীও অনভ্যস্ত বলিয়াই মনে হইবে;—উহার বাক্‌ভঙ্গি বাংলা নয়—সংস্কৃত, তাহাও কষ্টকৃত ও হাস্যকর। মাঝে মাঝে যেখানে মাতৃভাষা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেইখানে লেখককে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়, নতুবা মনে হইবে, একজন বিলাতী পণ্ডিত কিছু সংস্কৃত শিখিয়া, তাহারই সাহায্যে কোনক্রমে এই বাংলা উপন্যাস রচনা করিয়াছে। আমি এখানে ঐ ভাষার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিব—সংস্কৃত-ভঙ্গির বাক্য-রচনা নয়, বাক্‌-ভঙ্গির সাধারণ লক্ষণ কিরূপ তাহারই একটু পরিচয় দিব।

"মানসিংহ নিজের প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন" (যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন)।

"বর্ষাপ্রভাতে" (অর্থাৎ 'বর্ষার শেষে')।

"পঞ্চদশ সহস্র ভগ্ন করিলে অধিক থাকে না"। (বাংলা ইডিয়মের সংস্কৃত-করণ)।

"আকবর শাহের সহিত যুদ্ধে কার্য কি?" (ঐ)

"জগৎসিংহ কৌশলময়।"

"দিগ্‌গজের হৃদ্বোধ হইল।"

"বিমলা দ্রুতপদবিক্ষেপে শীঘ্র মান্দারণ পশ্চাৎ করিলেন।"

"ঐ প্রদেশ শত্রুব্যস্ত হইয়াছে।"

"রাজপুত্রের কর্ণে লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।"

"গুণের সীমা দিতে পারি না।"

"জগৎসিংহের লয় হইবার সম্ভাবনা।"

"কপালে ক্ষত কেন? রুধির যে বাহিত হইতেছে!"

"আমি তাঁহার নিকট আর একবার সাক্ষাতের প্রার্থিতা।"

"মন্ত্রপূত ব্যতীত পাণিগ্রহণ।"

"আমাকে বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ় করিয়া দিলেন" (যাহাতে শিখিতে পারি সেইরূপ করিলেন)।

"আত্মপ্রতিশ্রুতি উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে (যেমন, ইংরেজী—'to redeem a pledge')

"জগৎসিংহের আরোগ্য জন্মিতে লাগিল।"

"আয়েষা প্রকৃতি-নির্মিত রাজ্ঞীস্বরূপ।"

"ঋণবদ্ধ আছি, কখন যে তাহার প্রতিশোধ করিব।"

"অভিরামস্বামী দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহিত্রী করিলেন।" (ভাষা যেমনই হোক—কন্যা বরের পাণিগ্রহণ করে!)

"করে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল।"

"যাহা প্রয়োজন ইচ্ছাব্যক্তির পূর্বেই পাইতেছেন।"

"এ চতুর্বিংশতির পরপারে পড়িয়াছে।"

"আমাদের নদী কলকল রবে প্রবহণ করে।"

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা এমনই, অথচ বাংলা গদ্যের তখন এমন নিরুপায় অবস্থা নহে। ভাষা এইরূপ হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না,—ঠিক যে কারণে আজ পুনরায় এক সম্প্রদায়ের হস্তে ভাষার ঐরূপ দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ঐরূপ হওয়া সত্ত্বেও যে কারণে তাহা মার্জনীয়যোগ্য, সে আলোচনা পরে করিব। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু জন্মদিবস হইতে আজ পর্যন্ত

কেন যে কেহই উহার ভাষায় ঐ দুঃসাহসিক অনাচার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন নাই, তাহা সেইকালের পণ্ডিত পাঠকদের কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে—উহার ঐ ভাষাও তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ব্যাকরণ বা বাক্যরীতি যেমনই হোক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে প্রথমতঃ কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন....(তথাপি) "মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে, অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি'।"

ঐ শেষ উক্তিটি অতিশয় মূল্যবান, পরে আমাদের কাজে লাগিবে।

দুর্গেশনন্দিনীর এই ভাষা হইতে প্রমাণ হয় যে, একদা বালক-বয়সে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-ভাষায় যে একটু ছেলেখেলা করিয়াছিলেন, পরে তাহা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমনও মনে করিলে ভুল হইবে না যে, তিনিও মধুসূদনের মত ইংরেজীর মোহে মাতৃভাষাকে বর্জন করিয়াছিলেন, অন্ততঃ পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা গদ্য-ভাষা ও সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল তাহাতে আকৃষ্ট হন নাই, ইংরেজী সাহিত্যের রসই আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন; বরং শ্রদ্ধার সহিত সংস্কৃত-কাব্যের কিঞ্চিৎ চর্চা করিয়াছিলেন, তবু তাঁহার সেই আভিজাত্যগর্বী মন গ্রাম্য রুচি ও পণ্ডিতী রস বিচারের মল্লভূমিকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাই যখন কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার সুপ্ত-প্রতিভা জাগিয়া উঠিয়া সৃষ্টির আবেগে অধীর হইয়াছিল, তখন তিনি আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—নিজের শক্তিকে মাত্র সম্বল করিয়া—একটা দুঃসাহসিক কার্যে ব্রত হইয়াছিলেন। আজ এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয় যে, ঐ লগ্নটা সত্যই বড় অনুকূল হইয়াছিল, নহিলে এই উপন্যাসের সর্ববিধ দোষ অগ্রাহ্য করিয়া সেকালের শিক্ষিত পণ্ডিত-সমাজও সেই পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবককে এমন মহোৎসাহে মাল্যচন্দনের দ্বারা অভ্যর্চিত করিত না। সেদিন তাহারা যে শুভকর্ম করিয়াছিল, তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য-সূচনা হইল; 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যদি ঐরূপ আশাতীত সাফল্যলাভ না করিতেন, তবে কে জানে, তাঁহার মত পুরুষ ঐ পথে আর অগ্রসর হইতেন কি না। আশ্চর্য নয় কি যে, উত্তরকালে যে-প্রতিভা বাংলা-সাহিত্যের আকাশে, চন্দ্র-সূর্য—দুইরূপেই পূর্ণ রশ্মি বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রথম স্ফুরণ হইয়াছিল এইরূপ একখানি লোকচিত্তগ্রাহী, যুবক-যুবতী-মনোরঞ্জন, কিংবা আদিরস-রসিক পণ্ডিতগণের তাম্রকূট-সেবাবসর-বিনোদন রোমাঞ্চকর উপকথায়!

(২)

কারণ, দুর্গেশনন্দিনী স্রেফ উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে—যতই সুকল্পিত বা সুরচিত হউক। ইংরেজীতে যাহাকে রোমান্স-জাতীয় নভেল বলে উহা তাহাই। সেকালের পাঠক উহাকে 'নভেল'ই বলিত, আমরাও বাল্যকালে 'বঙ্কিমের নভেল' পড়িয়াছি। এখন

তাহার পরিবর্তে, দেশী ও সংস্কৃত নাম 'উপন্যাস' দিতে গিয়া আমরা জিনিষটাকে আরও বি-নামী করিয়া তুলিয়াছি। উহা যে এক ধরণের বিলাতী গল্প—এমনই নূতন যে, 'টেবিল' 'চেয়ার'-এর মত উহার ঐ ইংরেজী নামটাই বাংলা করিয়া লইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ ছিল না। উহা আরব্য-উপন্যাস, কাদম্বরী, গোলেবকাওলি কোনটার সঙ্গেই মেলে না। উহার ঘটনাগুলো চমকপ্রদ বটে, তবু অসম্ভব মনে হইলেও সম্ভাবনার দাবী রাখে। তার পর, সেই ঘটনাবলীর একটা স্থান ও কাল-নির্দেশ আছে। মানসিংহ ও কতলু খাঁ এককালে সত্যই বর্তমান ছিল ; শুধু কি তাই ? গড়মান্দারণ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়! আর, ঐ তিলোত্তমা-আয়েষার কাহিনী,—আহা কি অপূর্ব! পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, ইতিহাসের সুপরিজ্ঞাত ঘটনার সহিত এমনই কত অজ্ঞাত অথচ মনুষ্যজীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী জড়িত থাকে, থাকাই তো স্বাভাবিক। উহার দ্বারাই ইতিহাসের অস্পষ্ট বিবরণ যেমন আরও জীবন্ত হইয়া উঠে, তেমনই নর-নারীর গভীরতর হৃদয়কাহিনীও—গভীর বলিয়াই যাহা আমাদের চোখে পড়ে না, এবং অসাধারণ বলিয়া মনে হয়—সেই কাহিনী ইতিহাসের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া এমনই একটি মহিমা লাভ করে—সেই বৃহত্তর পটভূমিকার উপযোগী বেশবাস ও কুলশীলের আঢ্যতায় মণ্ডিত হইয়া, বাস্তবই একটি অবাস্তব-রমণীয় শোভা ধারণ করে। ইহাই এ কাহিনীর কাব্যরস। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এই যে লুকাচুরি পাঠকের মনকে সাময়িকভাবে রসাবিষ্ট করে, ইহাই তো এ ধরণের উপন্যাসের মূলীভূত অভিপ্রায়। এদেশের কথাসাহিত্যে এইরূপ ইতিহাসসন্ধী আখ্যায়িকা এই প্রথম। ঐ প্রয়োজনেই ইহাতে ইতিহাসের গল্পমাত্র আছে—ঘটনার সত্য-মিথ্যা নিতান্তই অবান্তর। ইহার ভিতরকার উপাদান—আসল উপাদান—অন্যরূপ, সেইজন্যই উহা এত অভিনব ও চিত্তাকর্ষক। ইহার পাত্রপাত্রীগুলোয় বাস্তব নর-নারীর মুখের আদল আছে, এবং কাহিনী যতই কল্পনাপ্রধান হউক, তাহাতে মানুষের কামনা-বাসনার বাস্তব প্রবৃত্তিবেগের গভীর বর্ণ-বিন্যাস আছে; অর্থাৎ, এ কল্পনা প্রাচ্য নহে—পাশ্চাত্য; উহার ঐ অন্তর্গূঢ় মানবতাই চিত্ত-চমৎকারের কারণ; তাহাতে যেমন সমাজগত ব্যবধান নাই, তেমনই দেশ-কালের ব্যবধান নাই। এইজন্য বিলাতী ধরণের কাব্য হইলেও 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলার পণ্ডিতসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যে ছাঁচে উহাকে ফেলা হইয়াছে, তাহা সেকালের ইংরেজীওয়ালাদের নিকট অতিশয় পরিচিত, তাহারই নাম 'নভেল'। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, বিলাতী কথাসাহিত্যের উহাই ছিল প্রসিদ্ধ রীতি—সার ওয়াল্‌টার স্কটের উপন্যাসগুলিরও নাম ছিল 'Waverley Novels', বাংলাতেও সেই নাম বহাল হইল; ইংরেজী-অনভিজ্ঞ বাঙালী বুঝিল, ঐ সুন্দর বস্তুটিকেই 'নভেল' বলে। কিন্তু পরে যখন নভেল মানুষের বাস্তব জীবনের আরও নিকটবর্তী হইল, তখন ঐ পূর্বেকার 'নভেল'কে রোমান্স বা কল্পনা-প্রধান বলিয়া পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হইল। আমাদের বাংলাতেও শীঘ্রই উহার মর্যাদাহানি হইল, উহার নাম হইল "রীতিমত নভেল"। ইহার আরও কারণ—বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে যাহারা রাশিরাশি নভেল বা গল্প লিখিতে লাগিল, তাহারা বাস্তবের সকল দায়িত্ব মোচন করিয়া

উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে, ঐ প্রকার নভেলের একরূপ ব্যঙ্গ-অনুকৃতি রচনাই করিয়াছিল। আমরা 'রীতিমত' শব্দটি সদর্থেই ব্যবহার করিব—ঐ রোমান্স-জাতীয় নভেলকেই 'রীতিমত নভেল' বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' কিরূপ উপন্যাস, উহার ঐ 'নভেল' নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিয়াছি। অধুনা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে যে একশ্রেণীর উপন্যাস বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে, 'দুর্গেশনন্দিনী' সেই শ্রেণীর উপন্যাস নহে। অতীতকালের ঘটনা বা ইতিহাস-পরিচিত ব্যক্তির যেটুকু সংস্রব উহাতে আছে, তাহা ঐরূপ রসসৃষ্টির প্রয়োজনে; আমি পূর্বে সেই রসের উল্লেখ করিয়াছি। স্কটের নভেলগুলি যে অর্থে ঐতিহাসিক, বংকিচন্দ্রের উপন্যাসও তাহার অধিক নহে, অর্থাৎ তাহাতে কল্পনার ইতিহাস যতটা আছে, ইতিহাসের ভাবনা ততটা নাই। স্কট যদি তাঁহার গল্পগুলিতে, সেই কল্পনার ইতিহাসকে অধিকতর ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ এই যে, সেই কল্পনায় মিশাইবার মত ঐতিহাসিক মশলা তাঁহার কিছু বেশী ছিল—গাথা, গল্প, কিম্বদন্তী প্রভৃতির অভাব ছিল না। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিচন্দ্রের একটি সহজাত শক্তি ছিল, তিনি অতীতের একটা রূপ সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। সেই কল্পনাশক্তি যে তাঁহার ছিল, এই 'দুর্গেশনন্দিনীতে'ও তাহার প্রমাণ আছে, পরে সে কথা বলিব। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও 'দুর্গেশনন্দিনী' একখানি রীতিমত নভেল অর্থাৎ, সেইরূপ রসসৃষ্টির সকল উপাদানই ইহাতে রহিয়াছে; ইতিহাসের মশলা বা গন্ধচূর্ণ সেই কারণেই মিশাইতে হইয়াছে। তথাপি, এমন কথা বলা যাইবে না যে, গড় মান্দারণ ও কতলু খাঁ, মোগল-পাঠানের যুদ্ধ, এ সকল উপাদান নিতান্তই বাহিরের,—উহার ঐ কল্পনা-মিশ্রিত ইতিহাসই তো উপন্যাসের গ্রন্থি-স্বরূপ হইয়াছে, এবং সেইটুকু ইতিহাসই যথেষ্ট। রীতিমত নভেলের কয়েকটি লক্ষণ এইরূপ—

(১) কাহিনীটি অতীতের কাহিনী হইবে। (২) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ থাকিবে। (৩) এমন জীবনযাত্রা বা এমন সমাজের বর্ণনা থাকিবে যাহা ভয় অথবা সম্ভ্রম উদ্রেক করে। (৪) বিজন প্রদেশ, প্রাচীন প্রাসাদ, ভগ্ন অট্টালিকা, অরণ্য, দুর্গম পথ প্রভৃতি গল্পের ঘটনাস্থান হইবে। (৫) নায়ক-নায়িকা উচ্চবংশীয় হইবে; চরিত্রগুলিতে কোনরূপ জটিলতা থাকিবে না—প্রত্যেকের স্বভাব বুঝিতে পারা যাইবে, এবং ঘটনাবিশেষে তাহারা নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করিবে। (৬) নায়ক যেমন প্রেমিক, তেমনই আদর্শবীর হইবে; প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে; যুদ্ধ থাকিবে; আর থাকিবে প্রথম দর্শনে প্রেম। (৭) শেষ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার মিলনই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহাতে একটা বিষাদের ছায়া জড়িত হইয়া থাকিবে—পূর্ণসুখের মধ্যেও যেন একটা অপূর্ণতা-বোধ জাগে; খাঁটি মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত হইলে গল্পটি যথোচিত তৃপ্তিকর হয় না। রীতিমত নভেল মোটামুটি এইরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র সেই রীতি বজায় রাখিয়া এমন একটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন, যাহা ইংরেজী সাহিত্যের নকলনবিশীর চূড়ান্ত হইলেও, তাঁহার প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণও তাহাতে আছে। এইবার তাহাই দেখিব। এই প্রথম উপন্যাসেই বঙ্কিম-

চন্দ্র তাঁহার অসাধারণ গল্পরচনাশক্তি (Story-telling)-র পরিচয় দিয়াছেন। সেই মুন্সিয়ানার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে—

(১) উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই সমগ্র কাহিনীর বীজ উপ্ত হইয়াছে—ইহার মত উৎকৃষ্ট শিল্প-কৌশল আর কিছুই হইতে পারে না। এই প্রথম পরিচ্ছেদের মত উৎকৃষ্ট রচনাখণ্ডও এই উপন্যাসে আর নাই, আবার, এই-জাতীয় নভেলের যা কিছু সদ্‌গুণ তাহাও ঐ একটি স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে—নাটকীয় সংস্থিতি (Situation); অবস্থার সম্ভাব্যতা; ঘটনাটির আদি, মধ্য ও অন্তের সুনিপুণ যোজনা ও কার্য-কারণ নির্দেশ সেকালের সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রী এবং আদর্শ বীরপুরুষের মধ্যে আলাপ-আচরণের অপূর্ব শালীনতা; স্থান, কাল ও পাত্রের দৈব যোগাযোগে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার, এবং বিপদকালে পুরুষের উপরে নারীর স্বাভাবিক নির্ভরতা। সর্বোপরি শুধুই পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সংযম নয়, লেখকের লেখনীরও শিল্পীজনোচিত সংযম। এই সকল গুণে ঐ প্রথম পরিচ্ছেদেই যেমন গল্পরস নিমেষে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনই এই মুন্সিয়ানার গুণেই পাঠকের চিত্তে একটি স্থায়ী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; ইহার পর যত কিছু স্খলন-পতন-ত্রুটি ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

(২) প্রথম হইতেই বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলা-ঘটিত যে একটি সুগভীর রহস্যের সূত্রপাত হইয়াছে, মূল আখ্যানের তলে তলে আর একটি প্রচ্ছন্ন কাহিনীর মত উহাই পাঠকের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট করে। শুধু তাহাই নয়, ঐ কাহিনীর নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা অল্প নয়। প্রথমতঃ, উহা যেন গল্পের মধ্যে আর একটি গল্প, রীতিও স্বতন্ত্র; বিমলার আত্মকাহিনীর যে রীতি তাহাই প্রাচীন কাহিনী-রচনার রীতি, তাহার রস অন্যরূপ; তাহা কাণে শোনার কাহিনী; মূল-কাহিনী চোখে-দেখার কাহিনী অর্থাৎ ঘটনাগুলি নাটকীয় দৃশ্যের মত; ইহাই নব্য রীতি। অতএব লেখক একই উপন্যাসে দুই ভঙ্গীরই সুযোগ লইয়াছেন। আবার ঐ বিমলা ও বীরেন্দ্র-ঘটিত কাহিনী উপন্যাসে একটা গৌণ স্থান অধিকার করিলেও, অর্থাৎ তাহা সাক্ষাতে না ঘটিলেও, দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যান-অংশের যতকিছু জটিলতা (Intrigue) ঐ একটির দ্বারাই ঘটিয়াছে; বিমলা এ কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে যতখানি জড়িত পরোক্ষভাবে তাহার অনেক বেশী। সে-ই বীরেন্দ্রসিংহের নিয়তি-রূপিণী; মোগল পাঠানের যুদ্ধে তাহার পক্ষাবলম্বন দুরূহ হইয়াছিল বিমলার জন্যই; আবার, সেই অত্যুগ্র জাত্যভিমান বা কুলগর্বের শাস্তি সে যে অবস্থায় ও যে ঘটনাচক্রে ভোগ করিল তাহাও বিমলাই ঘটাইল,—যেন সেই কুলগর্বের বশে সে ঐ নারীর প্রতি যে ঘোরতর অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, তাহা নারী ক্ষমা করিলেও বিধাতা করিলেন না—সেই নারীরই ছদ্মবেশে তাহার নিয়তি ঐ শাস্তি তাহাকে পাওয়াইল। অতএব, কাহিনীর একটা বড় অংশে লেখক মানুষের চরিত্রগত নিয়তির সেই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—ইহা শুধুই গল্পরচনা-শক্তি নয়, সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টির পরিচায়ক; নবীন লেখকের পক্ষে ইহাও কম গৌরবকর নহে।

(৩) রীতিমত নভেলের খাঁটি গল্প-রস ও তাহার উপযোগী ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি যে

একটি বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ, তাহা অনুকরণপটুতার শক্তি নহে; ঘটনাকে মুখ্য করিয়াও চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যেমন দুরূহ, তেমনই, ঘটনাগুলাকে সম্ভাবনার অতিরিক্ত করিয়াও, অন্ততঃ গল্পপাঠকালে পাঠকের চিত্তে সেই প্রশ্ন দমন করার শক্তিও—সেই 'willing suspension of disbelief' সৃষ্টি করার শক্তিও সাধারণ শক্তি নয়। পদেপদে সেইরূপ ছোট ও বড় চমক সৃষ্টি করিতে—যাদুকর যেমন দর্শকের চোখ লইয়া খেলা করে, তিনিও তেমনই পাঠকের মনের বিশ্বাস লইয়া খেলা করিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। নবাব-অন্তঃপুরে যেমন অবরোধের বালাই নাই, তেমনই হিন্দু ভূস্বামীর অন্তঃপুরিকারাও পুরীর বাহিরে যত্রতত্র যাতায়াত করিতে পারে—ইহাতে পাঠকের কোন আপত্তি নাই। ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটিতে থাকে যে, তাহাদের সম্ভাব্যতার সন্দেহ করিবার অবকাশও থাকে না। পাঠান-সৈন্য যে উপায়ে গড়-মান্দারণ দুর্গে প্রবেশ করিল তাহা যতই অবিশ্বাস্য হউক, সেই সাক্ষাৎ ঘটনাটি এমন চমকপ্রদ যে, তাহাদের সেই কৌশলগুলা যে লেখকেরই কৌশল তাহা একবারও মনে হয় না, আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ঘটনাটি এমন প্রত্যক্ষবৎ ঘটিয়া যায়; দুর্গপ্রাচীরের একস্থানে যে আশ্চর্য কলকৌশলময় জানালা বসানো ছিল তাহা যে ঐ স্থানে ঐরূপ থাকিতে পারে না, এমন চিন্তা ইচ্ছা করিয়া চাপিতে হয়; সেই ভীষণ সংকট হঠাৎ যেমন ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কোন্ পাঠক সে সময়ে তর্ক করিতে বসিবে? ঐরূপ শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের কালেও দুর্গের বাহিরে কোন পাহারা নাই, তাহার নিকটবর্তী অরণ্যে বা পথে শত্রুর সৈন্য বা গুপ্তচর স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে—এমন অসম্ভব অবস্থাও সম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ঐ দুর্গজয়ের ব্যাপারটি এত রকমের চমক এবং অনিশ্চয়তার উদ্বেগে পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে, ঘটনার গতিও এত দ্রুত যে, উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর (plot) এই সবচেয়ে বড় ঘটনা-সন্ধি সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া যায়—লেখক একটা বড় জয়লাভ করেন। বধ্যভূমিতে বীরেন্দ্র ও বিমলা যে একটি ছোটখাট নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় করে, তাহা এতই ভাবোদ্দীপক যে, সেই অবস্থায় উহা সম্ভব বা স্বাভাবিক কিনা, তেমন কথা একবারও মনে হইতে পারে?

এই ভাবোদ্দীপনের শক্তি এবং তজ্জন্য নাটকীয় সংস্থিতির যোজনা-কৌশল এই উপন্যাসের একটি বিখ্যাত দৃশ্যে আছে—নিশীথে বন্দীকক্ষে নবাবপুত্রী ও রাজপুতবীরের সেই মিলন ও সহসা সেইকালে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব। ঘটনাটি অতি-নাটকীয় হইলেও, ঐ দৃশ্যে একটা নারী-হৃদয় ও নারী-জীবনের সমগ্র কাহিনী কেন্দ্রীভূত হইয়া যেন একটী বিন্দুতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে; এক দিকে আত্মসম্মান রক্ষার দায় এবং অপর দিকে হৃদয়ের চির-গোপনীয় অতিনিরুদ্ধ মর্মকথা প্রকাশ না করার সংকল্প, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে সেই আকস্মিক বিস্ফোরণ—আয়েষার সেই দৃপ্তকণ্ঠে নির্ভীক প্রেম-বেদনা, উহা যতই অতিকল্পিত হউক, ঐ নাটকীয় সংস্থিতি, এবং passion— ঐ শোণিত-রাঙা বেদনার উৎসার, সেকালের পাঠকসমাজকে কিরূপ অভিভূত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—আয়েষার সেই উক্তি আজও একটা কাব্য-প্রবাদ হইয়া আছে: আজ হয়তো তাহার আতিশয্যটাই বেশী করিয়া লাগে—

রসটা বড় কাঁচা বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ, ওখানে নাটকীয় ভঙ্গিতে কাব্যরসেরই বাড়াবাড়ি হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও বড় প্রতিভার প্রয়াসচিহ্ন আছে—যতই অপরিপক্ক হউক, শক্তির প্রমাণ আছে। এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, লেখক নবীন হইলেও, এবং এই প্রথম উপন্যাসে কল্পনা ও কৌশলের মৌলিকতা অধিক না হইলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' বিলাতী ছাঁচের প্রথম বাংলা উপন্যাস, তথা বাংলা-সাহিত্যের নবযুগ-সূচনার প্রথম নিঃসংশয় কবি-কীর্তিই নয়,—ইহার উদ্ভাবনী কল্পনা, উপাদান-সংগ্রহ ও নির্মাণ-কৌশলে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাহা বঙ্কিম-প্রতিভার ভবিষ্যতের সূচনাও বটে।

আমি 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঘটনা-বিন্যাসে নবীন লেখকের সেই শক্তির কথা বলিতেছিলাম সেই যাদু-শক্তি, যদ্দ্বারা পাঠক-চিত্ত প্রতিপদে এমন মুগ্ধ ও চমকিত হয় যে, সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্নই তাহার মনে জাগে না, বরং যাহা ঘটিতেছে তাহা সত্যই ঘটিতেছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। এ জাতীয় উপন্যাসে—প্রাচীন কথা-কাহিনীর মত নয়—বিশ্বাসের, অন্ততঃ সাময়িকভাবে পাঠকের আত্ম-প্রতারণার প্রয়োজন আছে; কল্পনার উদ্ভটতাই চিত্তচমৎকারের কারণ নয়। 'দুর্গেশনন্দিনী'র লেখক সেই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—কোন্ উপায়ে তাহাও বলিয়াছি। যেখানে কোন অসম্ভাব্যতা আছে, সেইখানে ভয়, বিস্ময়, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ অথবা অতিরিক্ত কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া তিনি অনায়াসে সে সংকট উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তজ্জন্য যে কবিশক্তির প্রয়োজন তাহাও প্রতিভাসাপেক্ষ। পাঠান কর্তৃক গড়মান্দারণ-অধিকারও যেমন, তেমনই বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁর হত্যাসাধন ও নির্বিঘ্নে পলায়ন—এই দুই ঘটনারই মূলে আছে যে কূট-কৌশল ও অসীম সাহস তাহাতেই ঐরূপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না; লেখক আরও কিছু বস্তু উহাতে যোগ করিয়াছেন। একটিতে শত্রুর গতিবিধি এরূপ সতর্ক ও গোপনতাময় যে একটি সুগভীর রহস্য-রসে পাঠকের মন আচ্ছন্ন হয়; দ্বিতীয়টিতে, অতিপ্রবল প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য অমানুষিক ধৈর্য এবং অত বড় সতীত্বের সেই আত্ম-লাঞ্ছনা পাঠকচিত্তকে এমনই আলোড়িত করে যে, ঘটনার সম্ভাব্যতার কথা মনের কোণেও স্থান পায় না। আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে ভীতি ও বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহল উদ্রেক করিবার কৌশল—লেখকের উদ্ভাবনীশক্তি ও কবিকল্পনা, দুইয়েরই সাক্ষ্য আছে। অরণ্যমধ্যস্থ ভগ্ন-অট্টালিকার নির্জন অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া পাঠক তাহার একপ্রান্তে একটা সদ্য-খোদিত কবর এবং অপর প্রান্তে একটা সদ্য-নির্মিত চিতা দেখিয়া যেমন বিস্মিত, তেমনই বিমূঢ় হইয়া যায়; তেমনই পরে সেই দ্বৈরথ-যুদ্ধ—সেই সম্পূর্ণ বিদেশীয় বীরপ্রথা তাহাকে এমনই চমৎকৃত করে যে, ঘটনা হিসাবে উহা যে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া", তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না; বরং বন্দী-কক্ষে নবাবপুত্রীর সেই স্বীকারোক্তির মত, এখানেও নিরাশ প্রেমিক ওসমানের ঐ আত্মহত্যার সংকল্প এবং তাহার সেই বেদনা-বীরত্বময় উক্তি পাঠকের ভাবাবেগ-পিপাসাকে আশাতীতরূপে চরিতার্থ করে। এই সকল হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, এই নবীন গল্পলেখক, গল্পসৃষ্টিতে সর্ববিধ কলাকৌশলের প্রয়োগ-নৈপুণ্য তো বটেই, তাহারও অধিক এক উচ্চতর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—মানব-হৃদয়ের সেই অতিবেগবতী প্রবৃত্তিগুলোর

(passions) মূল-সন্ধান এবং তাহার উদ্দীপনে যথোচিত ঘটনার উদ্ভাবন। দুর্গেশ-নন্দিনীতে সেই passion চরিত্র হইতে একটু পৃথকভাবে ঘটনাকেই আশ্রয় করিয়াছে বটে, তবু তাহা এই ধরণের উপন্যাসের অতিশয় উপযুক্ত হইয়াছে। চরিত্রগুলোর কথা পরে বলিব।

(৩)

এইবার আমি এই উপন্যাসের কল্পনামূলে আরও যে একটি প্রেরণা উঁকি দিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। 'দুর্গেশনন্দিনী' কি অর্থে, কতটুকু ঐতিহাসিক, পূর্বে তাহা বলিয়াছি; ইহাও বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র এক ধরণের 'নভেল'ই লিখিয়াছেন; একালে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলিতে যাহা বুঝায় তাহার স্পষ্ট ধারণাও যেমন সেকালে ছিল না, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের তাহাতে প্রয়োজনও ছিল না। তথাপি পরবর্তীকালে উপন্যাসে ঐতিহাসিক কল্পনার যে বিশুদ্ধতা দাবী করা হয়,--কোন সজ্ঞান উদ্দেশ্য না থাকিলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসে তাহার একটা সহজাত প্রেরণা ছিল, অতীতের সমাজ ও ধর্ম প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁহার একটি স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা ছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাত্রপাত্রী ও ঘটনার ঐতিহাসিকতা যেমনই হউক (জগৎসিংহ ও ওস্‌মান উভয়েরই—একের ঐ নাম এবং অপরের পরিণাম, দুই-ই ইতিহাস-বিরুদ্ধ), গল্পটির ঐ কাল নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা সেই কালের কয়েকটি বিশেষ প্রবৃত্তি বা সংস্কার--তাহার ধর্মাধর্মবোধ, বিশ্বাস ও নীতিজ্ঞান যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, গল্পটিকে খুব ভিতরের দিকে তাহার অনুবর্তী করিয়াছিল। তিনি পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্তে অতীতের একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা এতই গূঢ় এবং গূঢ় বলিয়াই এমন স্বাভাবিক যে, পাঠক তাহা অনুভব করে মাত্র, ঐতিহাসিক বলিয়া বুঝিতেও পারে না; এই কারণেই এ পর্যন্ত কোন পণ্ডিত পাঠকও তাহা লক্ষ্য করেন নাই। কোন যুগের ঐতিহাসিক চিত্র বলিতে, রাজবংশ, রাজসভা, যুদ্ধবিগ্রহই তাহার সব নয়--সমাজের চেহারাটাই আসল। আমাদের দেশে, এই সমাজের বিশেষ কোন পরিবর্তন বহুকালেও হয় না; বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে, অর্থাৎ ইংরেজী আমোলের মধ্যভাগে, সমাজের উচ্চস্তরে একটা মানস-পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল; কুলপ্রথা, নারীর অধিকার, যৌন-জীবনের নীতি-দুর্নীতি প্রভৃতির যে সংস্কার পূর্বকালে অর্থাৎ ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রে ও ঘটনায় তাহার পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন। আয়েষা, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ, ওসমান—ইহাদের কেহই ঐতিহাসিক নহে, উহারাই উপন্যাসের কল্পনা-অংশ; কিন্তু বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহ ও অভিরাম স্বামী—ইহারা প্রত্যেকে সেই যুগের ঐতিহাসিক সমাজ-চিত্রের এক একটি অবয়ব। বিমলার পাতিব্রত্য--বিবাহিত জীবনে নারীর পৃথক আত্ম-মর্যাদা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া পুরুষের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রভুত্ব সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লওয়া—ইহা সেই যুগেরই নারী-পুরুষ-সম্পর্কের একটি লক্ষণীয় নিদর্শন। বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রেও, সেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর

পুরুষের একটা বিশেষ মনোবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; ঐ কুলগর্ব, জাত্যভিমান বা আভিজাত্য-গর্বই সকল ধর্মের উপরে বলিয়া যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল, বীরেন্দ্রসিংহ তাহারই এক দুর্ধর্ষ প্রতিমূর্তি। তাই বিমলার প্রতি তাহার ঐ আচরণ এমন স্ববিরোধী, এমন কি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়; লেখক এই অস্বাভাবিকতাকেই বিশেষ করিয়া আমাদের চক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তার কারণ, তিনি সেই যুগের আভ্যন্তরীণ পরিচয়টি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান। প্রেম বীরেন্দ্রসিংহের একটা passion বা প্রবল হৃদয়বৃত্তি মাত্র, কিন্তু তাহার **'ruling passion'** বা পরমার্থ—ঐ কুলগর্ব।

কিন্তু এ বিষয়ে লেখকের সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম ও অব্যর্থ হইয়াছে অভিরামস্বামী-নামক চরিত্রটির পরিকল্পনায়। সেকালের পাঠক—সেই স্মৃতিরত্ন তর্করত্নের দল—সম্ভবতঃ ঐ চরিত্রে আপত্তি করিবার কিছু দেখেন নাই, বরং ঐ মহাজ্যোতিষী, মহাপণ্ডিত ও মহাহিন্দু সন্ন্যাসীর রাজগুরুপদ অতিশয় উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার পাঠক ঐ চরিত্রটির কীর্তিকলাপ এবং সেই কীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলির দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই উহার ঐ মহাত্মা-সুলভ অভিমান ও ভক্তিভাজনত্ব কোন্ চক্ষে দেখিবে? বস্তুতঃ এমন প্রশ্নই স্বাভাবিক যে, লেখক অত বড় একজন সাধু-পুরুষকে পাঠকের সম্মুখে এমন বে-আবরু করিয়া দিলেন কেন? একবার নয়, দুইবার সেই একই প্রকার কীর্তির কাহিনী তিনি নিঃসংকোচে বিবৃত করিয়াছেন। স্বকর্মের দায়িত্ব-বোধ বা অনুশোচনা তাঁহার নাই; আমরা যাহাকে morality বা নীতিজ্ঞান বলি তাহার লেশমাত্র সংস্কার ঐ চরিত্রে নাই। লেখক ঠিক তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। সেকালের হিন্দুসমাজের দুইটি প্রধান সংস্কার ছিল; একটা আচারগত, আরেকটা আদর্শগত। আচারগত রীতি এই ছিল যে, সতীত্ব নারীরই ধর্ম—সেই সতীত্ব-রক্ষার দায় তাহারই; সে শক্তি নারীর স্বভাবেই আছে; সে যদি তাহা নষ্ট করে, তবে তাহার পূর্ণ ফলভোগ তাহাকেই করিতে হইবে, সেজন্য পুরুষ কিছুমাত্র দায়ী হইবে না। অপর পক্ষে ঐরূপ দৈহিক শুচিতা পুরুষের অবশ্য পালনীয় নহে—এইজন্য পুরুষ বহু বিবাহও করিতে পারে। যৌবনে পদস্খলন পুরুষের পক্ষে বয়োধর্মের একটা অসংযম মাত্র, বয়োবৃদ্ধির সহিত উহা দমিত বা প্রশমিত হইতে পারে; অতএব তেমন শক্তিমান হইলে, পুরুষ—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তান —উহা হইতে মুক্ত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার বলে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। ইহাই সে যুগের ব্রাহ্মণ্য আদর্শ; উহাতে আধুনিক morality, যাহা মুখ্যতঃ খ্রীষ্টিয় বা হিব্রু, তাহার লেশমাত্র নাই। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা সে যুগের চিত্র এমন অসংকোচে ও দৃঢ়তাসহকারে অংকিত করিয়াছে।

তেমনই, এই উপন্যাসের অনৈতিহাসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে। প্রথম-দর্শনে প্রেম যদি-বা সর্বদেশ ও সর্বকালের সত্য হয় কিন্তু তাহাতে পুরুষের ঐরূপ কঠোর একপত্নীব্রত, বিশেষ করিয়া ঐ সমাজে, অভাবনীয় বলিলেই হয়। সুন্দরী রমণীর প্রতি পুরুষের আসক্তি, এবং সেই কারণে তাহাকে বিবাহ করিয়া শুদ্ধান্তঃ-

পুরে আরও অনেকগুলির মধ্যে স্থান দেওয়া, এবং তাহাদের কোন একটিকে বিশেষ অনুগ্রহ-পাত্রী করা—ইহার অধিক ঐ যুগের ঐ সমাজের সংস্কার-বিরুদ্ধ। এ প্রেম বিলাতী প্রেম, এবং তাহাতেও বিলাতী নভেলের সেই Knight-errantry ও Chivalry-র হুবহু অনুকরণ রহিয়াছে। বিমলা-বীরেন্দ্রসিংহের যুগে, এবং তাহাদেরই এত নিকটে ঐরূপ প্রেমাভিনয় নিতান্তই নভেলী হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার এই পর্যন্ত। এক্ষণে সাধারণভাবে অন্যান্য চরিত্র-গুলির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, আমরা এই উপন্যাসখানিকে একজন নবীন লেখকের স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার দুঃসাহসিক কীর্তি বলিয়াই গণ্য করিব। চরিত্র-সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ইহার মুখ্য প্রয়োজন নয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। মুখ্যতঃ গল্পের প্রয়োজনেই চরিত্রগুলি রচিত হইয়াছে; গল্পে রসের বৈচিত্র্য চাই, তার জন্যই চরিত্রসৃষ্টি আবশ্যক। বিদ্যাদিগ্‌গজকে লইয়া আশমানির ও বিমলার যে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক-ক্রীড়া, তাহাতে নবীন লেখকের মাত্রাজ্ঞান কিছু কম বলিয়াই মনে হইবে। সে কালে যাত্রার শেষে যে 'সং' দেওয়া হইত, উহা তাহারই একটু ঘোরালো সংস্করণ। তবু তাহাতেও একটা অপর উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ হইয়াছে, লেখক সমসাময়িক সমাজের সংস্কৃতশিক্ষাভিমানী সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপরে বেশ এক হাত লইয়াছেন; আশমানির রূপবর্ণনা ব্যপদেশেও, তৎকাল-প্রসিদ্ধ দেশীয় কবি এবং সংস্কৃত কাব্যরীতির (যাহার ভক্তি-পূর্ণ গবেষণা এক্ষণে মহাপাণ্ডিত্যের কর্ম হইয়াছে) যে গুণ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক রুচি ও আদর্শের আভিজাত্য ঘোষণা আছে। গল্পের ঘটনাস্রোতের দুইকূল রক্ষা করে যেমন নায়ক-নায়িকা, তেমনই তাহার বেগ ও কলমর্মর বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ চরিত্রের প্রয়োজন; সেইরূপ একটি প্রয়োজনে আশমানি ও বিদ্যাদিগ্‌গজকে হাজির করিতে হইয়াছে; তাহারা মূল আখ্যানেরও দুই একটি ফরমায়েস খাটিয়াছে। কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে চরিত্র-সৃষ্টি করিতে এক জায়গায় লেখক সত্যই দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন—সে ঐ কতলু খাঁ-চরিত্রটি। এই চরিত্র যেন একটা অতিশয় কৃত্রিম রং-মাখানো পুত্তলিকা মাত্র, এবং ইংরেজীতে যাহাকে বলে Vulgar—তাহাই। হয়তো Contrast বা বৈপরীত্য-প্রদর্শনের জন্য এমন একটা চরিত্রের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া লেখক পরবর্তী কালের বাংলা নাটকের নবাব-বাদশাহগণের একটি সুলভ পরিচয়ের উপায় করিয়া দিয়াছেন। পাঠকের মনে অবশ্য একটা বিস্ময় জাগে, তাহা এই যে, এমন অমেধ্য পঙ্ককুণ্ড হইতেও আয়েষার মত শ্বেত শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ঐ চরিত্রে অপরিমিত ভোগ-লালসাই আছে, এতটুকু শক্তির লক্ষণ নাই; এজন্য অপর পক্ষের নেতা-হিসাবে কতলু খাঁর অস্তিত্ব যেমন অনাবশ্যক, তেমনই বিমলার প্রতিহিংসা-পূরণ ছাড়া, ঐরূপ চরিত্রহীন চরিত্র এ কাহিনীর কোন প্রয়োজনে লাগে নাই; উহা একটা প্রক্ষিপ্ত উপসর্গ মাত্র। এইরূপ কল্পনা লেখকের দুর্বলতা, এমন কি রুচির নিকৃষ্টতা প্রমাণ করে।

সমগ্র উপন্যাসখানিতে একটি চরিত্রই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত—সে বিমলা; সে-ই এ কাহিনীর

গতি-যন্ত্রটি চালনা করিতেছে; গল্পের চক্রটিও যেমন সে-ই প্রথম ঘুরাইয়া দিয়াছে, তেমনই সেই ঘূর্ণনের যত কিছু ঊর্ধ্ব ও নিম্নাবর্তন তাহার দ্বারাই ঘটিয়াছে। তাহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আলাপ-কুশলতা এবং স্নেহ, প্রেম, প্রতিহিংসা—এই তিন হৃদয়বৃত্তির প্রবলতাই সমগ্র উপন্যাসকে গতিবেগ দান করিয়াছে; সর্বশেষে, অর্থাৎ ঘটনাধারার পরিসমাপ্তিতেও, বিমলাই কর্ত্রীপদ অধিকার করিয়াছে।

তিলোত্তমার চরিত্র কিশোরী-চরিত্র বলিলেও হয়। তাহার বয়স ষোল বৎসর হইলেও হৃদয় আরও তরুণ। উহার ঐ নব অনুরাগ, এবং তাহাতে যে পূর্বরাগ-বিরহ-মিলন ঘটিয়াছে, তাহা খাঁটি কাব্যশাস্ত্রসম্মত; সেই কোমলতার মধ্যেও যে কারণে যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও নারীর চরিত্রে স্বাভাবিক; উহাতে নারী-প্রেমের কোন নূতন রূপ-বিকাশ নাই। তিলোত্তমা নারী-প্রেমের একটি কিশোরী কাব্য-প্রতিমা মাত্র।

তথাপি উহাতেও যে চিরন্তন নারীচরিত্রের মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কাব্যের সত্য অক্ষুণ্ণ আছে। আয়েষা-চরিত্রের আলোচনা পরে করিব; এখানে ঐ নারী-প্রেমের তুলনায় প্রেমিক পুরুষ দুইটির চরিত্র একটু দেখিয়া লইলে ভালো হয়। উহাদের কাহারও প্রেম পুরুষোচিত নয়, দুইজনেই দুর্বল। জগৎসিংহ কর্তৃক তিলোত্তমাকে প্রত্যাখ্যান পুরুষ-চরিত্রের মহত্ত্ব নয়, দুর্বলতারই পরিচায়ক; তাহার প্রেম এমনই অনুদার ও আত্মসর্বস্ব যে, তাহা ঐরূপ অবিশ্বাসের উপরে উঠিতে পারিল না; ঐ প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটির মত কাপুরুষতার দৃশ্য আর কি হইতে পারে? ওসমান-চরিত্রটিও লেখক অতি সাবধানে গজ-ফিতা ধরিয়া একটি আদর্শের মাপে তৈয়ারী করিয়াছেন; প্রতি-নায়ক হিসাবে আদর্শ বীরচরিত্রে যে কয়টি মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহাই অলঙ্কারের মত সে পরিধান করিয়াছে। তথাপি, তাহার বীরত্ব ও শিষ্টাচার যেমনই হোক, তাহার প্রেমেও পৌরুষ নাই, কাঙালপনাই আছে। অতএব এই উপন্যাসে লেখক পুরুষের যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ভাবের উদ্দীপনাই আছে, চরিত্রের দৃঢ়তা নাই—নারীর প্রেমে যে শক্তি বা মহত্ত্ব আছে, পুরুষের প্রেমে তাহা নাই।

সর্বশেষে, যে-একটি চরিত্রের আলোচনা বাকি থাকে,—সেই আয়েষার চরিত্রই এই উপন্যাসখানিকে সর্বোচ্চ কাব্যকল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছে; উপন্যাসের গল্প-রসকেও অতিক্রম করিয়া, অথবা সেই রসকেই সুরভিতর করিয়া তাহাতে একটি দিব্যস্বাদ দান করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের কবিপ্রাণ যেন ঐ একটি চরিত্র চিত্রিত করিবার জন্য তুলিকাটিকে বারবার সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত করিয়াছে; উহাতেই কবি আপন প্রাণের আনন্দ-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আয়েষা-চরিত্র সৃষ্টি করিতে তিনি গল্পের দিক দিয়া যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা হয়তো সর্বাংশে উপযোগী হয় নাই; তথাপি যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত, বিধর্মী ও বিজাতি বীরযুবকের শুশ্রূষা-ভার লইয়া এবং দিবারাত্রি সেই নির্বাণোন্মুখ প্রাণশিখার পানে চাহিয়া নারীর চিত্তে যে অপরিসীম করুণার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক, সেই করুণাই ঐরূপ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল; অথবা সেই মরণাহত অসহায় যুবার দেহকান্তি ও শৌর্য-বীর্য তাহার কুমারী-হৃদয় জয় করিয়াছিল—এই দুই-ই সম্ভব। লেখক যে এই চরিত্রটিতেই,

প্রথম-দর্শন ছাড়াও, নারীর প্রেম-সঞ্চারের গভীরতর হেতু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, এই চরিত্রটিই উপন্যাসের মধ্যমণি; সে কথা গ্রন্থমধ্যে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—"যেমন উদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকার মধ্যে তেমনই আয়েষা।"

এই আয়েষাকে কবি তাঁহার যৌবন-স্বপ্নের নারী-প্রতিমারূপেই গড়িয়াছেন; তাই তিলোত্তমার বয়স ষোল বৎসর, আয়েষার বাইশ; অর্থাৎ, তিলোত্তমা পূর্ণ যুবতী নয়, তখনও তাহার নারীত্বের পূর্ণবিকাশ হয় নাই (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পঁচিশের পূর্বে তাহা হয় না); আয়েষা বিংশতি পার হইয়াছে, পঞ্চবিংশতির মুখে। ঐ বয়সের কথাটাই নারী সম্পর্কে একটা বড় কথা। আদর্শ-নায়িকা আয়েষার চরিত্রে আর চাপল্য নাই যাহাকে সমর্থা নায়িকা বলে সে তাহাই। ঐ বয়সে নারী যেমন অন্তরে আত্মসচেতন হয়, তেমনই বাহিরে নারীসুলভ লাবণ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আয়েষার রূপবর্ণনায় লেখক কবিত্বের একশেষ করিয়াছেন; সেই রূপ যেন আকাশ-বিহারিণী অপ্সরার রূপ, তাহা কবির মানস-নেত্র হইতে —দেহে নয়—পটে প্রতিফলিত হইয়াছে। এমন নারীর চরিত্র কেমন হইবে? তাহার প্রেম কি মাটির বন্ধন মানিবে? সে যাহার মৃত্যুশয্যা আগুলিয়া বসিয়াছিল, যেন নিজের সকল কামনা-বাসনার বিনিময়ে সে যাহাকে অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার নিকটে সে নিজের জন্য কি চাহিবে? কবি বঙ্কিম তাঁহার আদর্শ প্রেম-প্রতিমাকে সর্ব-মালিন্যমুক্ত করিবার জন্য ঐ সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন; করুণা হইতে প্রেম, এবং প্রেমের করুণা—তাহার মত স্বর্গীয় আর কি আছে? এমন ভালবাসা নারীই বাসিতে পারে—ইহাও তাঁহার বিশ্বাস; তাই আয়েষাকে সেই আত্মত্যাগের যত কিছু পরীক্ষায়—কঠিনতম পরীক্ষায়ও —উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তিনি যেন এমনই পণ করিয়াছেন; যেন চন্দনকে ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার দারুত্ব লোপ করিবেন, সবটুকু সুরভি-সার হইয়া উঠিবে। আয়েষার প্রেম সেই আদর্শেই পরিকল্পিত বটে, আয়েষা মানবী নহে, দেবী।

কিন্তু নারীকে দেবীরূপে পূজা করিতে কবিপ্রাণ যতই উৎসুক হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেবীর প্রেমে একটু প্রাণের ধর্ম চাই, নহিলে দেবীরও নারীদেহ ধারণ করার অর্থ হয় না। আয়েষা যখন তাহার জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, শূন্য-দিগন্তের অস্তমান সন্ধ্যাতারার মত, শেষবার আমাদের সম্মুখে উদয় হইল, এবং অঙ্গুলি হইতে 'গরলাধার অঙ্গুরীয়ক' উন্মোচন করিয়া সেই গরল পান করিতে গিয়া লজ্জিত হইল—প্রাণের দুর্বলতা দমন করিল, কিন্তু তখনই আবার সেই প্রাণকে অবিশ্বাস করিয়া, দুর্গপ্রাকারসংলগ্ন পরিখার জলে সেই অঙ্গুরীয়ক ফেলিয়া দিল—তখন সেই দেবীও তাহার মানবীত্ব স্বীকার করিল। আমরা বুঝিলাম, সে একটা কবি-কল্পিত আদর্শমাত্র নয়; তাহার মন যত বড়, যত দৃঢ় হউক, দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাহাও কম বড় নয়; সেই প্রাণের ব্যথা যত বড়, যত অসীম ও অপ্রতিবিধেয় প্রাণও তত বড়; কারণ—"Behind every sorrow there is a soul"; সেই ব্যথার কাহিনীই অমৃতসমান। ইহাও দেখিলাম যে সেই ব্যথার শোণিতোৎসাব হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ করিতে গিয়া আয়েষার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে! এই আয়েষা

'আইভান-হো'র 'রেবেকা'র প্রতিলিপি মাত্র নয়, ইহাতে কবি-কল্পনার একটি স্বতন্ত্র ও মহত্তর আদর্শ রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'-উপন্যাসের এই দুই নারীচরিত্র—বিমলা ও আয়েষা—ইহাদেরই অনুভাবনায় কবি বঙ্কিমের কবিজীবন-যাত্রা সুরু হইয়াছে। একদিকে বিমলা, অপরদিকে আয়েষা; একদিকে নারীর সংসার-রস-রসিকতা, তাহার হৃদয়ের সেই প্রাণপূর্ণ ক্ষুধা ও তাহারই প্রতিরোধে-অমৃতের বিষ-বিকার; অপরদিকে আত্মত্যাগের অসীম শক্তি। নারী-চরিত্রে এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব—ভোগ ও ত্যাগ, প্রেম ও বৈরাগ্যের একই গ্রন্থিস্বরূপ যে নারী-হৃদয় তাহারই রহস্য—বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসে উত্তরোত্তর ঘনাইয়া উঠিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বের ধাঁধা উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি অতঃপর এইরূপ গল্পমাত্র রচনা না করিয়া, উপন্যাসের আকারে অতি গভীর নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে বিমলা ও আয়েষা—নারীর ঐ দুই রূপ স্ফুটতর হইয়া উঠিল; কোথাও পৃথক থাকিয়া, যেমন—হীরা ও কুন্দ, রোহিণী ও ভ্রমর, শৈবলিনী ও দলনী; কোথাও একেরই মধ্যে, যেমন—লবঙ্গলতা, দরিয়া ও শান্তি; আবার কোথাও বা দুই রূপকে অতিক্রম করিয়া, যেমন—মনোরমা, কপালকুণ্ডলা ও শ্রী—একটি মূলা-নারীপ্রকৃতির রহস্যময় রূপ, তান্ত্রিক সাধকের ইষ্টদেবতার রূপ—একই নারী-মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম-কাব্যের সেই কল্পনা-বীজ মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে; আয়েষা তাঁহার মানস-আকাশে সেই নারী-মহিমার ঊষা-জ্যোতিঃ; তাই তাহা আকাশেই মিলাইয়া যায়, ধরণীপৃষ্ঠ স্পর্শ করে না।

(৪)

'দুর্গেশনন্দিনী'র এই আলোচনার আরম্ভে বলিয়াছিলাম, উহার ঐ আবির্ভাব আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের একটা বড় সন্ধিক্ষণে হইয়াছিল। তাহার পূর্বে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একটা বড় শক্তির সূচনা করিয়াছিল বটে, একটা বড় আর্ট বা ষ্টাইলকে বাংলা ভাষায় ধরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার কল্পনা-ক্ষেত্র ছিল জীবনের দিক দিয়া সংকীর্ণ; মানবজীবনের—নারী-চরিত্রের—গভীরতর বাস্তব-জিজ্ঞাসা বা আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা তাহাতে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' তাহার তুলনায়, আর্ট হিসাবে, ভাষার সুবলয়িত সৌষ্ঠবে নিকৃষ্ট হইলেও আমরা তাহার এই যে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিলাম, তাহাতে দেখা যাইবে, উহা একখানি 'রীতিমত নভেল' হইয়াই বাংলার নরনারী-চিত্তকে এমন চকিত-চমকিত করিয়াছিল কোন্ গুণে। সে যেন একটা ঝড়ের মত আসিয়া সে কালের সাহিত্যিক গুমট্ ভাঙিয়া দিয়াছিল। তাহার মত এমন কাহিনী-রচনার কৌশল পূর্বে আর কোথাও ছিল না; আবার, ঘটনা যতই বাস্তবাতিরিক্ত হউক, তাহাতে নরনারী-হৃদয়ের যে বৃত্তিগুলা, যেমন—ভয়, উদ্বেগ, স্নেহ, প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি, প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক। ইহাতে বাংলার পাঠকসমাজ যেমন একটা নূতন সাহিত্যরস আস্বাদন করিল, তেমনই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই একরূপ জীবন-রস-পিপাসাও জাগিল।

কিন্তু তরুণ লেখকের দিক দিয়াও এই উপন্যাসের কয়েকটি লক্ষণ বিচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ উহার ঐ ভাষা, তাহার একটু পরিচয় পূর্বে দিয়াছি, এখন আর এক দিক দিয়া সে ভাষার বিচার করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, তরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, ভাবুকতা, রসবোধ ও কল্পনাশক্তি সকলই আছে, কিন্তু ভাষা নাই; মধুসূদনও ভাষায় যে ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন তিনি তাহা করেন নাই; যেমন করিয়া হৌক, তিনি নিজের ভাষা নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইবেন, পূর্ববর্তী কোন গদ্যরীতিই, এমন কি ইডিয়ম পর্যন্ত স্বীকার করিবেন না! ভাষা বলিতে আমরা রীতির কথাই বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র কোন রীতিই মানিবেন না, শব্দযোজনা-রীতিও নয়; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহার কল্পনাজগৎ এতই স্বতন্ত্র যে, তাহার জন্য যে ষ্টাইল আবশ্যক, সেই ষ্টাইলের পক্ষে প্রচলিত কোন রীতিই কাজে লাগিবে না—ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল। সেই ষ্টাইলে অকারণ বাগ্‌বাহুল্য থাকিবে না, তাহা পাথরে খোদিত করার মত দৃঢ় ও গাঢ়বন্ধ হইবে; একটা নিজস্ব আভিজাত্য থাকিবে অথচ, তাহা জীবনের অন্তর ও বহিরাকাশের রং রূপ ও তাহার আলো-ছায়া প্রতিফলিত করিবে—ঠিক তাঁহার দৃষ্টি-অনুযায়ী। এক কথায়, ভাষারও পূর্বে চাই ষ্টাইল; এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষার ষ্টাইল নয়—ষ্টাইলের ভাষা নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। অক্ষম হইলেও ইহারই উদ্যম 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আছে; অর্থাৎ, বাংলা-সাহিত্যে 'Personality'-প্রকাশের প্রথম প্রয়াস উহাই। সেই ষ্টাইলের সমস্যাই ছিল তাঁহার নিকট বড়, তাহাকে তিনি ভয়ও করেন নাই, ফাঁকি দিতেও চাহেন নাই। তিনি যে বেশ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু নিজের শক্তিতে সেই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন বলিয়াই পরে বাংলা-সাহিত্যের মত, বাংলা ভাষাও তাঁহার হাতে নব-কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষায় প্রতিভার দুঃসাহস ও উদ্যমশীলতা দুই-ই আছে; যেন শাবকাবস্থাতেই এই গরুড় ঊর্ধ্বাকাশে উঠিতে চায়; তাহার পক্ষ বিশাল বটে, কিন্তু এখনও অঙ্গসন্ধি দুর্বল, তাই নিম্নাকাশে সন্তরণপটু বিহঙ্গের অবলীলা তাহার নাই, বারবার গতিস্খলন হইতেছে।

তথাপি ঐ অপটু ভাষাতেও ভাবের যে দীপ্তি এবং রসসৃষ্টির যে সার্থকতা আছে, তাহাতে সেকালের পণ্ডিতসমাজও মুগ্ধ হইয়াছিল; ঐ ভাষাই তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ হয়, উৎকৃষ্ট কাব্যমাত্রেই ভাষাকে তাহার অধীন করে—"It is a triumph over language," তাহা নিজেই ভাষার অধীন নয়। সম্ভবতঃ এই 'triumph' ঘোষণা করিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার ঐ উৎকট ভুলগুলিও পরে সংশোধন করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথম উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানস ও কবিশক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সে তাঁহার প্রকৃতি-প্রেম—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনার সেই চিত্রাঙ্কনী শক্তি। সেগুলি যে আলঙ্কারিক কবিত্ব নয়, পরন্তু প্রত্যক্ষের প্রতিলিপি তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেকে হয়তো ইহা লক্ষ্য করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যত প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা নব্য য়ুরোপীয় কাব্য-কলার অনুরূপ, ইহাও বাংলা-সাহিত্যে

নূতন।

তৃতীয়তঃ, পুরুষের প্রেমেও একনিষ্ঠতার যে পাশ্চাত্য আদর্শ ইহার কাব্যরসের উপাদান হইয়াছে, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে—'প্রফুল্ল' ও 'সীতারাম' ছাড়া—পুরুষের অলঙ্ঘনীয় চরিত্র-নীতি হইয়া উঠিয়াছে। বিলাতী সমাজের ঐ নীতি অতি উচ্চ কাব্যমহিমায় মণ্ডিত হইয়া এই বহু-বিবাহের দেশে সমাজ-জীবন প্রভাবিত করিয়াছিল। ঐ জগৎসিংহই নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতির আদি-পুরুষ; স্বদেশ-প্রেমের মত বঙ্কিমচন্দ্রই এদেশে এই দম্পতি-প্রেমের আদি প্রচারক।

চতুর্থতঃ, এই দুর্গেশনন্দিনীতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের একটি প্রচ্ছন্ন সংস্কার উঁকি দিয়াছে—হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা; সে যেন জাতীয় সংস্কৃতির গৌরববোধ। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল গরিমায় মুগ্ধ, হিন্দুর শাস্ত্র বা হিন্দুর ইতিহাস তখনও ভালো করিয়া চর্চা করেন নাই। তথাপি, হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি একটা অবশ অবোধ অনুরাগ, যেন প্রাক্তন সংস্কারের মতই, সেই বিলাতী-বিদ্যামুগ্ধ এবং তদানীন্তন দেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাহীন তরুণ বঙ্কিমের হৃদয়ে সুপ্ত ছিল। অভিরাম স্বামীর মত চরিত্রই তাহার সাক্ষ্য; সে যেন সেই প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধি। সংসারের মনুষ্যজীবনের যত কিছু কর্মজাল, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে যত কিছু সুকৃতি-দুষ্কৃতির অমোঘ ফলভোগ, সে সকল স্বীকার করিয়া লওয়াও যেমন তেমনই জ্ঞানের ও ধ্যানের উচ্চাধিকারে পৌঁছিয়াও নির্লিপ্তভাবে সেই সংসারের হিতসাধনে যতদূর সাধ্য আত্মনিয়োগ করা,—ইহার জন্য ঐরূপ সন্ন্যাসী বা পরমহংসকে গুরুরূপেই চাই। এই মনোভাবের স্পষ্টতর প্রকাশ তাঁহার পরবর্তী উপন্যাসে আছে। মনে হয়, ইহাও যেন বঙ্কিম-প্রতিভার সেই স্বাজাত্য-প্রেরণার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আর একটি লক্ষণের কথা পুনরায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আয়েষা-চরিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বলিয়াছি। দুর্গেশনন্দিনীর গল্প পাঠ করার শেষে, তাহার সেই ঘনঘটাময় কাহিনী, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, প্রেমের লাঞ্ছনা, বধ্যভূমির রক্তস্রোত, পুরুষের পৌরুষ-দম্ভ ও নারীবুদ্ধির অশিক্ষিতপটুত্ব—এই সকলেরও উপরে এবং প্রায় যেন সকলকে নিষ্প্রভ করিয়া পাঠকের চিত্তে কোন্ একটি মহীয়সী প্রতিমা ভাস্বর হইয়া উঠে,—নিশ্চয়ই আয়েষা। পূর্বে বলিয়াছি নারীর ঐ মহিমাকীর্তন করাই যেন এই উপন্যাসে কবির একমাত্র লক্ষ্য। এই নারীই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসের মন্ত্র-দেবতা; ঐ উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়াই তাঁহার কবি-মানস নারী-মহিমার তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষায় সেই তীর্থযাত্রাই সুরু হইয়াছে।

আলোচনা শেষ করিলাম। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিম-প্রতিভার আদি ও অপরিপুষ্ট ফল। সেকালের সেই সমাজে বাংলা-সাহিত্যের সেই সন্ধিক্ষণে উহার আবির্ভাব একটা মাহেন্দ্র-যোগের মত; সেজন্য আজ উহার রস যেমনই হোক সেই খ্যাতি এখনও উহাতে লগ্ন হইয়া আছে। এইরূপ নিছক উপন্যাস বা রীতিমত নভেল সেকালের সেই সাহিত্যে যে কি কারণে

একটা নবসৃষ্টির গৌরবলাভ করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ নিছক উপন্যাস বা রীতিমত নভেল-রচনাই বঙ্কিম-প্রতিভার গৌরব নহে; দুর্গেশনন্দিনীর মত গল্প বঙ্কিম-চন্দ্র পরে আর লেখেন নাই; বরং ইহার পরেই 'কপালকুণ্ডলা' এবং তাহারও অচিরকালমধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', শুধু কাব্যরচনায় নয়, কবি-প্রতিভার বিকাশ-ব্যাপারেও, নিয়তিকৃত নিয়মের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। তবু দুর্গেশনন্দিনীর এই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন ছিল—রস-বিশ্লেষণ বা সাহিত্যিক সমালোচনা নয়; ইহাতে সেই অসাধারণ প্রতিভার যে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, সেই অঙ্কুর হিসাবেই আমি এই উপন্যাসের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিলাম; আশা করি, তাহা বাংলার পণ্ডিত-সমাজে অগ্রাহ্য হইবে না।

শ্রাবণ, ১৩৫৭
বাঁড়শা, ২৪ পরগণা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

[**মোহিতলাল মজুমদার**—বিখ্যাত কবি ও সমালোচক। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জনক হন ত মোহিতলালকে তাহার পালক বলা যায় অনায়াসে। ইনি সমালোচনার এমন একটি নিজস্ব ও বলিষ্ঠ ভংগীর প্রবর্তন করেন যে সমালোচক হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কবিখ্যাতির প্রতিষ্ঠাকে ছাড়াইয়া যায়। সাহিত্য-পাগল এই মানুষটি সাহিত্যধর্ম ও সাহিত-শুচিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, সেদিকে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ও শৈথিল্য সহ্য করিতে পারিতেন না। সেজন্য তিনি নিকটতম বন্ধুকেও কঠোর সমালোচনা করিতে দ্বিধা করেন নাই। 'সাহিত্যের কালভৈরব' এ আখ্যা একদা তিনি নিজেই নিজেকে দিয়াছিলেন, যদিও পরে এই নামটির বহুলপ্রচার হয়। কিছুদিন মেট্রোপলিটান ইস্কুলে শিক্ষকতা করার পর ইনি প্রধানত ডাঃ সুশীলকুমার দে'র চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া যান। অধ্যাপক হিসাবে ইনি অসামান্য যশস্বী হন্। ছাত্ররা যেমন ভয় করিত, তেমনি ভক্তি করিত। দীর্ঘকাল শনিবারের চিঠির সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিয়মিত শনিবারের চিঠিতে ইঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশের জন্যই ঐ পত্রিকাটি পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে—মোহিত-লালও সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন্। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মোহিতলালের অনেক জ্ঞান-গর্ভ এবং ভাবসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পুস্তক আছে। মৃত্যুর পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া বঙ্গবাসী কলেজের স্নাতকোত্তর (বাংলা) বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। সম্প্রতি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।]

কপালকুণ্ডলা ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ)

কপালকুণ্ডলা (ইং) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। আয়তনে এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস হইতে ছোট; কিন্তু শিল্প-কৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার মত সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস সর্বসাহিত্যে বিরল। পটভূমিরচনা, আখ্যায়িকাগঠন, চরিত্রসৃষ্টি, সাঙ্কেতিকতা—যে উপাদানের প্রতিই লক্ষ্য করা যায় দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থ শুধু যে অনবদ্য তাহা নহে, পরম বিস্ময়কর। যখন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা রচনা করেন ও প্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স সাতাশ আটাশ বৎসর; সেই বয়সে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় দেওয়া বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ শক্তি-মত্তাই সূচিত করে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত দুর্গেশনন্দিনীকে বাদ দিলে মনে হয় যে দেবরাজ-দুহিতা মিনার্ভার মত বঙ্কিমের প্রতিভা পরিপূর্ণ মূর্তিতে স্রষ্টার মস্তক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করে। ভাষা-নৈপুণ্য, কাহিনী-রচনা বা ভাব-পরিবেশন—সাহিত্যের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য গৌণ। প্রধান হইতেছে চরিত্রসৃষ্টি; অন্যান্য উপাদান চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াই সার্থকতা লাভ করে। 'কপালকুণ্ডলা'য় দুইটি পরমাশ্চর্য-রমণীর চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিপালিতা, সমাজের প্রভাবমুক্তা; অপর রমণীর চরিত্র সামাজিক জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাদের চরিত্রের বিভিন্নতা হইতে নিসর্গশোভা ও সমাজের জটিল ও সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তুলনা করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে না। তবু ইহা মানিতেই হইবে যে দুই রমণীর চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য যেমন তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমনি তীব্রতা লাভ করিয়াছে ইহাদের পরিবেশের বৈষম্য।

প্রথমে নায়িকা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বিচার করা যাইতে পারে। ইনি বাল্যে পর্তুগীজ দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হইয়া সমুদ্রসৈকতে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তারপর ইঁহার প্রধান সংগী হইল নিসর্গশোভা—আকাশের ও সমুদ্রের বিস্তার ইঁহার মর্মে প্রবিষ্ট হইল; ইহারা ও সমুদ্রতীরস্থ বনানী কপালকুণ্ডলার মনে এক অপরূপ আকর্ষণ জাগাইত। শুধু তাহাই নহে। নিসর্গশোভা স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু ইহা অমানবীয়; তাই মানুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি রহস্যময়ীই থাকিয়া যায়। প্রকৃতির শোভা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে; তাহার মধ্যে এমন একটি লীলাময় মায়া আছে যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না; যাহাকে স্পর্শ করিতে গেলে দেখি যে সে পলাইয়া যায়, যাহা অতিপরিচিত হইলেও দূরবর্তী রহিয়া যায়। এই যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও চঞ্চল মোহিনী শক্তি ইহা প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলায় সংক্রমিত হইয়াছে। যখন নবকুমার তাঁহাকে প্রথম দেখিলেন তখন তিনি প্রকৃতির শোভার অঙ্গীভূত হইয়াই প্রতিভাত হইলেন, যখন তিনি কথা বলিলেন তখন "পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন

মন্দীভূত হইতে লাগিল।" যখন তিনি চলিতে লাগিলেন তখনও তাঁহাকে অশরীরী মায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তাঁহার অলক্ষিত পদবিক্ষেপের সঙ্গে বসন্তকালের মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্রমেঘের সঞ্চরণের তুলনা হইতে পারে। তাঁহার আবির্ভাব, অন্তর্ধান ও ক্রিয়া-কলাপ নিসর্গশোভার মতই লীলাচঞ্চল ও রহস্যময়। পরে তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও নবকুমারকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম দর্শনে তিনি নবকুমারকে সতর্ক করেন নাই, এমন কি তিনিই নবকুমারকে পথ দেখাইয়া কাপালিকের কুটীরে লইয়া আসিলেন। কাপালিক নবকুমারকে বধার্থ লইয়া যাইবার পূর্বে কপালকুণ্ডলা আর তাঁহার কাছে আসেন নাই। কেন আসেন নাই, কেন পূর্বে সতর্ক করেন নাই, কোথায় তিনি থাকিতেন, এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। যখন পথিমধ্যে তিনি নবকুমারকে পলায়ন করিবার উপদেশ দিলেন তখনও তাঁহাকে বিদ্যুৎ-চঞ্চলা মায়া বলিয়াই মনে হইয়াছে। যখন খড়্গহস্তে জীবনদাত্রীরূপে তিনি নবকুমারের কাছে উপস্থিত হইলেন তখনও তিনি অর্ধেক মানবী, অর্ধেক মোহিনী-মায়া—তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে। কেহ কেহ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার তুলনা করিয়া থাকেন। এই তুলনা অনেক দিক্ দিয়াই ভ্রান্ত। মীরাণ্ডা সমুদ্র-উপকূলে প্রতি-পালিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সমুদ্রশোভার অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। শকুন্তলা তরুমূলে জলসেচন করিতেন, বনজ্যোৎস্নাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, মৃগশিশুকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিয়াছেন, পতিগৃহে যাইবার সময় ইহাদের নিকট হইতে করুণভাবে বিদায় লইয়াছেন। ইহাতে শকুন্তলার অনুভূতির বিস্তৃতি প্রমাণিত হয়, কিন্তু শকুন্তলা সম্পূর্ণা মানবীই রহিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার অধরের সঙ্গে কিশলয়রাগের, তাঁহার বাহুর সঙ্গে কোমল বিটপের এবং তাঁহার যৌবনের সঙ্গে লোভনীয় কুসুমের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে অলৌকিকের কোন স্পর্শ নাই। প্রকৃতির মধ্যে যে অতি-প্রাকৃতের ইঙ্গিত আছে, নিসর্গশোভা যে অনৈসর্গিক মহিমার বহিঃপ্রকাশমাত্র, সেই দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, লীলাচপল শক্তিকে যদি কেহ কোথাও পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিয়া থাকেন, তবে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলাকে যদি শুধু নিসর্গমায়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন সমুদ্র-তীরে মনুষ্যসমাজ হইতে বহুদূরে; তাঁহার প্রতিপালক শক্তি-উপাসক দুরন্ত কাপালিক। তান্ত্রিক কাপালিকেরা লোকালয় হইতে দূরে নির্জন বনে নরদেহের উপর উপবেশন করিয়া কালীর সাধনা করিতেন; তাঁহাদের সাধনার অন্যতম উপকরণ নরকপালস্থিত তেজস্বী আসব। কাপালিকেরা অন্যান্য বীভৎস আচারও পালন করিতেন এবং এই সকল কারণে ইঁহারা অতিশয় হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট হইতেন। কিন্তু এই সাধনার মূলে রহিয়াছে শক্তির উপাসনা এবং সেই উপাসনার সাহায্যে মোক্ষলাভ। তান্ত্রিকের সাধনা লোকালয় হইতে দূরে আচরিত হয় এবং মানুষের হত্যা যে সাধনার অঙ্গ তাহার সঙ্গে মনুষ্যসমাজের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কপালকুণ্ডলা আশৈশব এই সাধনার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন; এই সাহচর্য তাঁহাকে

মনুষ্যসমাজসম্পর্কে উদাসীনই করিয়াছে এবং ভগবানের যে রূপ তাঁহার মনে অংকিত হইয়াছে তাহা প্রলয়ংকরী শক্তির রূপ। অধিকারীও তাঁহাকে এই কালীকেই উপাসনা করিতে শিখাইয়াছেন, যদিও অধিকারী কোমলস্বভাববিশিষ্ট এবং তিনি কালীকে জগতের মাতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই উভয়ের সাহচর্যে আসিয়া কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে গভীর ধর্ম্মমোহ অংকিত হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তি সাংসারিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া সঞ্জীবিত হয় নাই; তিনি পূজা করিয়াছেন এক লোকাতীত শক্তিকে যিনি ভয়ংকরী, যিনি জগন্মাতা, যাঁহার নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়, অনমনীয়। প্রকৃতির সুগভীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি লৌকিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন হইয়াছিলেন; তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা এই ঔদাসীন্যকে আরও বর্ধিত করিয়াছিল।

এই উভয় শক্তির প্রভাব তাঁহার চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল; লৌকিক কর্মের মধ্যে তিনি অলৌকিকের অঙ্গুলিসংকেত অনুসন্ধান করিতেন এবং সেই সংকেতকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। সাংসারিক জীবনে যে সব ধর্মান্ধলোক দেখা যায় প্রায়শঃ তাহাদের ধর্মনিষ্ঠায় একটি সংকীর্ণতা থাকে; তাহা ঐহিকের সামান্য আকাঙ্ক্ষাপূর্তির জন্য নিয়োজিত হয় অথবা অকিঞ্চিৎকর আচার-পালনে তাহা নিঃশেষিত হয়। কপালকুণ্ডলার ধর্মবিশ্বাসে এই ক্ষুদ্রতা নাই। তাঁহার কোন ঐহিক কামনা নাই; শুধু সকল কর্মে তিনি ভবানীর সুনির্দেশ্য সংকেত খুঁজিতেন ও দেখিতে পাইতেন। এই কারণে তাঁহার সীমাবদ্ধ জীবনের উপরে অসীমের রেখাপাত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্রে ও কর্মে যাহা কিছু খাপছাড়া ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহারও সুসমঞ্জস মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে পরোপচিকীর্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; সংসারের স্বার্থদিগ্ধ পথে পরিভ্রমণ করেন নাই বলিয়াই হউক অথবা স্বাভাবিক প্রাবল্যের জন্যই হউক কপালকুণ্ডলা নরবলি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং সর্বদা পরের উপকার করিতে উদ্যত হইতেন।* এই প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবীকে তিনি এমনি অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইয়াছিলেন যে নিজের জীবনের প্রতি তাঁহার কোন মমত্ব জন্মায় নাই। তিনি যে বিবাহে সম্মতি দিলেন তাহার কারণ তিনি ইহার মধ্যে করালীর ইংগিত দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সপ্তগ্রামে সাংসারিক জীবনে যে মন বসাইতে পারিলেন না তাহার একটি কারণ সমুদ্রতীরের উন্মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণ; অপর কারণ এই যে আসিবার সময় তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র ভবানী গ্রহণ করেন নাই। যিনি সকল বিষয়ে অনৈসর্গিক শক্তির ইংগিত সন্ধান করেন, তিনি যে জীবনের সংকটমুহূর্তে স্বপ্নের মধ্যে নিগূঢ় নির্দেশ

* 'কপালকুণ্ডলা' নামটি সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধব' হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত নাটকে কপালকুণ্ডলা কাপালিক সন্ন্যাসী অঘোর ঘণ্টের শিষ্যা ও সহকারিণী। তিনি প্রাণরক্ষা করেন না, বরং প্রাণিহত্যায় কাপালিককে সাহায্য করেন। এই নাটকেও কপালকুণ্ডলা খড়্গ ধারণ করিয়াছেন; তবে তাহা বধ করিবার উদ্দেশ্যে নহে, প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

দেখিতে পাইবেন ইহা একান্ত স্বাভাবিক। সেই স্বপ্নে তাঁহার নৌকা জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে এবং তিনি শুনিতে পাইলেন, ভবানী কাপালিকের কাছে তাঁহার জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। কাপালিক ও নবকুমার যখন তাঁহাকে বধার্থ প্রেতভূমে লইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি আকাশে নবনীরদনিন্দিতমূর্তি ভৈরবীকে দেখিতে পাইলেন; ভৈরবী যেন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রাণবিসর্জনের নির্দেশ দিলেন এবং কপালকুণ্ডলা দেবীর চরণে নিজেকে বলি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কপালকুণ্ডলা যে এইরূপ সংকল্প করিলেন ইহার মূলে প্রকৃতির আকর্ষণ ও ধর্মমোহ অবশ্যই ছিল। কিন্তু ইহার একটি প্রধান কারণ তাঁহার সংসারের প্রতি অনাসক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, যদি কোনও স্ত্রীলোক সমাজের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে প্রতিপালিত হয় এবং পরে বিবাহ হইলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহা হইলে তাহার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্তন হইবে কিনা এবং কাপালিকের প্রভাব পরবর্তী কালেও তাহার উপর থাকিবে কিনা। এই বিষয়টি লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার একবৎসর কাল গৃহিণী থাকার পর তাঁহার চরিত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই পরিবর্তন স্থায়ী বা গভীর হয় নাই। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রণয়প্রবৃত্তির অভাব। কেহ কেহ মনে করেন যে এইরূপ অপরিণতি অস্বাভাবিক; একবৎসর কাল নবকুমারের ঘরে থাকিয়া কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আসংগলিপ্সা জাগিবে না ইহা হইতে পারে না। এই প্রশ্নের আলোচনার সময় একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। সাহিত্যের চরিত্র বাঁচিয়া থাকে সাহিত্যের মধ্যেই, সেইখানে সে সম্পূর্ণরূপে প্রাণবন্ত, সাহিত্যের বাহিরে তাহার কোন সত্তা নাই। অপর রমণী কপালকুণ্ডলার অবস্থায় পড়িলে কি করিত অথবা কপালকুণ্ডলার কি করা উচিত ছিল তাহা বিচার্য নহে। উপন্যাসের পক্ষে ইহাই চরম সার্থকতা যে তাহার মধ্যে কপালকুণ্ডলার সকল কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রণয়ের অভাবের সংগে জড়িত হইয়া আছে সাগরতীরের প্রতি আকর্ষণ ও ভবানীর নির্দেশ। ভবানী যে তাঁহার বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই তাহা বিবাহিত জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে তাঁহাকে সন্দিহান করিয়াছে; আর সাগরতীরের আকর্ষণ তাঁহাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে গৃহিণীপণার মোহ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই। প্রণয়প্রবৃত্তি সকলের হৃদয়ে সমানভাবে জাগ্রত হয় না; কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে ইহা যে অতিশয় অপরিণত ছিল তাহার সংগত কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার সপত্নী পদ্মাবতীও অসাধারণ রমণী; তাঁহার চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়াছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে। কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিত হইয়াছেন লোকালয়ের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনানীর মধ্যে, মতিবিবি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন মনুষ্য-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিমণ্ডলে, আগ্রার রাজপ্রাসাদে; সেইখানে তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। নানাবিদ্যার চর্চায় কল্পনা ও রসবোধ পরিমার্জিত হইয়াছে, মনের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ নীতি-

জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই। প্রত্যেকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিরাট পটভূমিকার পুরোভাগে, কিন্তু সেইখানেও প্রভেদের অন্ত নাই। এক দিকে রহিয়াছে আকাশ, সমুদ্র ও নিবিড় বন; অপর দিকে রহিয়াছে ভারত ইতিহাসের এক বিরাট অংশ, সেখানে সাম্রাজ্যের ভাগ্যপরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে। এই উভয় পটভূমিকার সান্নিধ্যে এই দুইটি রমণীর চরিত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ইঁহাদের ভিতরকার পার্থক্য সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নাই; ঔপন্যাসিক নিজেই বলিয়াছেন, "এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না।" অপর পক্ষে লুৎফ-উন্নিসার আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সেও স্বাধীনতা খুঁজিয়াছে কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা নহে, সংসারে থাকিয়া প্রবৃত্তির যথেচ্ছ পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা। কপালকুণ্ডলা একটি গৃহের কর্তৃত্বও চাহেন নাই, লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহেরও বাদশাহ হওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলার ধর্মবিশ্বাস এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি আত্মবিসর্জন সম্পর্কেও সংকোচশূন্যা ছিলেন; লুৎফ-উন্নিসার ধর্মবোধ এত শিথিল ছিল যে তিনি রাজপ্রাসাদে বহু পুরুষের সংসর্গে আসিলেও কাহাকেও কোনদিন ভালবাসেন নাই এবং যে সেলিমের তিনি প্রণয়ভাগিনী ছিলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। প্রণয়ের বন্ধনকে স্বীকার করিতে পারিলেন না বলিয়া কপালকুণ্ডলা বনচর হইতে চাহিলেন, লুৎফ-উন্নিসা পুষ্পে পুষ্পে বিহরণের শূন্যতা বুঝিতে পারিয়া নবকুমারের গৃহিণী হইবার জন্য আগ্রার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। উড়িষ্যার পথে ইঁহাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই দিন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া ইঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সর্বশেষ সাক্ষাতের দিনেও সেই বিস্ময় ঘুচে নাই, একে অপরের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। কিন্তু তিনি এমনি সুকৌশলে ঘটনার সমাবেশ এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে সর্বত্র অনুভব করা যায় যে হয়ত কোন অনৈসর্গিক শক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং মানুষের হৃদয়েই সে আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই রীতি বিশেষভাবে শেক্সপীয়রীয় রীতি। এই গ্রন্থের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে সমুদ্রের উপকূলে, তীরস্থিত স্তূপ-শিখরে, নদীর তীরে, কাননতলে; সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে প্রদোষে অথবা অন্ধকারে। স্থান ও কালের এই সংগতি লোকাতীত শক্তির ইঙ্গিত দেয় এবং এই ইঙ্গিত নানাভাবে সমর্থিত হয়। তান্ত্রিকের পৈশাচিক আচার, অধিকারীর ধর্মবিশ্বাস এবং কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বাদ দিলেও এমন অনেক সংকেতময় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে যাহা দৈবের অংগুলিসঞ্চালনের আভাস দেয়। বিবাহের পর কপালকুণ্ডলা কালীর পদতলে অভিন্ন বিল্বপত্র দিয়াছিলেন, সেই বিল্বপত্র প্রতিমাচরণচ্যুত হইলে বিষণ্ণ হইয়া অধিকারী কহিলেন, "এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সংগে সংগে যাইতে হইবে।" গ্রন্থের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে প্রেতভূমে, যেখানে নবকুমারের সংগে সংগে

কপালকুণ্ডলা গিয়াছেন এবং শেষে উভয়ে নদীর তরঙ্গমালায় মিলাইয়া গিয়াছেন। ইহা কি একেবারেই আকস্মিক না ইহার মধ্যে নিয়তির নির্দেশ রহিয়াছে? যদি নিয়তির লীলাই না থাকিবে তাহা হইলে কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর পত্র হারাইবেন কেন, সেই পত্র তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্তেই নবকুমারের হাতে পড়িবে কেন এবং পত্র খুঁজিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলাই বা আলুলায়িতকুন্তলা হইবেন কেন? এই সকল ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাহিনীর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে নিগূঢ় অর্থের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও এই সাঙ্কেতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সন্দেহ ও ঈর্ষার দ্বারা দগ্ধ হইয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি, কিন্তু ঘটনার পরম্পরা বিচার করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনি দৈবাহত, তাঁহার সন্দেহ ভৈরবীপ্রেরিত। বাস্তবিক পক্ষে মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি মানবের নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও অনেক সময় তাহারা মানুষকে এমন অন্ধ আবেগের সহিত চালিত করে যে আমাদের সন্দেহ হয় যে হয়ত তাহাদের এই অপ্রতিরোধনীয় গতি কোন বাহিরের শক্তি হইতে আহৃত হয়। যদি তাহারা অন্তর্লীন প্রবৃত্তিমাত্র হইবে তবে মানুষ তাহাদিগকে সংযত করিতে পারিবে না কেন? নিয়তির এই সংকেত বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় লুৎফ-উন্নিসার চরিত্রের পরিণতিতে। লুৎফ-উন্নিসা 'প্রকৃতিচপলা যোষিৎ', স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় আগ্রার রাজপ্রাসাদের নন্দননরকে বহু প্রণয়ীকে কৃপাবিতরণ করিয়াছেন। স্বীকার করা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়লালসার সঙ্গে বাহিরের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যে সময় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইল, সেই সময়ই তাঁহার পূর্বপতি নবকুমার শর্মার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল কেন? মানিয়া লইতে পারি যে এই সাক্ষাৎ একান্তভাবে আকস্মিক, কিন্তু এই অপ্রাপণীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিবে কেন? "আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?" ইহার একমাত্র উত্তর—"ললাটলিখন।" লুৎফ-উন্নিসা স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের লোক; কিন্তু তিনিও অনুভব করিয়াছেন যে মানুষের সকল অনুভূতি ও প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে—ললাটলিখন।

কাহিনীর গঠনকৌশল এই উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আমি অন্যত্র এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থে দুইটি রমণীর বিচিত্র কাহিনীকে অতি অপরূপভাবে একত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থের একদিকে রহিয়াছে পশ্চিমভারতস্থিত আগ্রার রাজধানী, অপরদিকে রহিয়াছে পূর্বউপকূলবর্তী নিবিড় বন। অথচ কোথাও জটিলতা নাই, কোথাও বহু ঘটনার বা বর্ণনার বাহুল্য নাই; যে চরিত্রের সম্পর্কে যতটুকু জানা প্রয়োজন শুধু ততটুকুই বিবৃত হইয়াছে, কোথাও আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই। মেহের-উন্নিসার চরিত্রের একটি অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তিনি অপ্রধান বলিয়া তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে অংকিত করা হয় নাই। গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ বিষয় কপালকুণ্ডলার বিবাহ ও মৃত্যু; গ্রীক ট্রাজেডির মত সকল ঘটনা ও অন্য সকল চরিত্র

অনিবার্যভাবে কাহিনীকে তাহার বিষাদময় পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। পট-ভূমিকা যত বিশালই হউক, তাহা মূল চিত্রকে অস্পষ্ট করিতে পারে নাই; রাজনৈতিক উত্থান পতন বা তান্ত্রিকের সাধনা যতই বিস্ময়কর হউক, সেই সকল ব্যাপার উপন্যাসকে মুহূর্তের জন্যও কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে নাই। এই কেন্দ্র হইতেছে কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিণতি ও তাঁহার চরিত্রের রহস্য। ঔপন্যাসিক সর্বত্র লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাহিরের প্রতিবেশ ও সংকেত যত অর্থপূর্ণই হউক না কেন সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও বিস্ময়কর রহস্য নিহিত রহিয়াছে মনুষ্য-হৃদয়ে। যিনি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন, তিনিই স্রষ্টা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

[**সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত**—ইংরাজী সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক হইলেও সুবোধবাবু বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সমালোচকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'শরৎচন্দ্র' নামক পুস্তক দুইটি প্রথম ইঁহাকে যশ ও প্রতিপত্তি আনিয়া দিলেও পরে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও রেডিও মারফৎ প্রচারিত সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি উঁহাকে বিশিষ্ট সমালোচকের মর্যাদা দিয়াছে। পরবর্তীকালে 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ এবং 'ধ্বন্যালোকে'র অনুবাদ বিখ্যাত হইয়াছে। সুবোধবাবু আলোচ্য রচনার বিচার করিতে গিয়া তাহার মূল সূত্রটি ধরেন এবং সাহিত্যধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার বিচারকে সীমাবদ্ধ রাখেন। সমালোচকের আর একটি বিশেষ গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান্—কোথাও বক্তব্যের খেই হারাইয়া ফেলেন না। ইনি এখনও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন।]

মৃণালিনী ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ)

(১)

ঐতিহাসিক কালের দিক্ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'মৃণালিনী' সর্বাগ্রবর্তী। ইহার সংঘটন-কাল একাদশ শতক, মুসলমান কর্তৃক প্রথম বঙ্গ বিজয়ের যুগ। সেই সুদূর অতীত আমাদের নিকট চিহ্নহীন দিক্-চক্রবালে বিলীন হইয়াছে। সেই যুগের সামাজিক রীতি-নীতি, সাধারণ লোকের মনোভাব, জীবন-যাত্রার বৈশিষ্ট্য আজ আর কল্পনার সাহায্যেও পুনর্গঠন করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ সেই যুগে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধটি, সহনশীলতার অন্তরালে গোপন বিরোধের ইঙ্গিতটির, ধর্মবিরোধের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার যথার্থ রূপটী আজ রহস্যাবৃত। আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সহজ-সাধ্যতার ব্যাখ্যাস্বরূপ বাংলার বৌদ্ধ অধিবাসীদের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ ও বৈদেশিক আক্রমণকারীর সহিত গোপন সহযোগিতাকে অন্যতম সম্ভাবিত কারণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক দেশ অধিকারের কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ইহার পশ্চাতে দেশবাসীর একটি বিশিষ্ট অংশের বিভীষণ-বৃত্তি নিশ্চয়ই ক্রিয়াশীল ছিল। মুসলমান অধিকারের পর বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ, দেশের বৌদ্ধ সমাজ ব্যাপকভাবে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল কি না, এই জাতীয় কৌতূহল-মিশ্র প্রশ্নের উদ্রেক করে। সে যাহা হউক, বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাসের মর্মগত এই তথ্যানুসন্ধানের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। তাঁহার সময় ইতিহাসের ঘটনাগত স্থূল বাহিরাবরণের মধ্যে সমাজতত্ত্বঘটিত সূক্ষ্মতর শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতনার উন্মেষ হয় নাই। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত হেমচন্দ্রের গোপন পরিণয়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হিসাবে প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ধর্ম-সংঘাতের যে জটিল জাল দেশব্যাপী প্রসারিত ছিল, বঙ্কিম তাহাকে গুটাইয়া আনিয়া নায়িকার প্রেমপ্রবণ, কোমল অন্তরের জন্য একটি সলজ্জ-মধুর অন্তরাল রচনা করিয়াছেন, নিয়তির ঘনকৃষ্ণ যবনিকাকে প্রেমিকার ভীরু, বেপথুমান হৃদয়ের আবরণকারী রেশমী ওড়নায় পরিণত করিয়াছেন। ইতিহাসের বিশাল পক্ষপুটের আশ্রয়ে প্রেমের ক্ষুদ্র নীড় রচিত হইয়াছে।

'মৃণালিনীতে' যদিও ইতিহাসের বৃহত্তর পরিবেশ উপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি যুগটি যে ইতিহাসের কেন্দ্রীয় প্রলয়াগ্নিশিখায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার সমস্ত দীপ্তি ও দাহ বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। বখ্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গলা অভিযান ও বাঙ্গালা বিজয় একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক সংঘটন। বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে এই দেদীপ্যমান সূর্যের প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা কোন কল্পনা-সর্বস্ব ঔপন্যাসিকের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বঙ্কিম সমস্ত অনুভূতি দিয়া, হৃদয়ের সমস্ত সংবেদনশীলতা দিয়া, ঐতিহাসিক কল্পনার সমস্ত

নির্মিত-কৌশল একত্রীভূত করিয়া এই জ্বলন্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও পাঠককে প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। পন্ডিত-শাসিত, দেশাত্মবোধহীন, আত্মরক্ষা-প্রচেষ্টায় শিথিল রাজসভার চিত্রে এই শোচনীয় জাতীয় বিপৎপাতের বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিকা রচিত হইয়াছে। এইরূপ সাধারণ অপ্রস্তুতি ও ঔদাসীন্য ছাড়াও দুরাকাঙ্ক্ষা-দেশদ্রোহিতাও এই সর্বধ্বংসী বহ্নি-প্রজ্বালনে ফুৎকার দিয়াছে। তাই বিশ্বাসঘাতক, স্বজাতিদ্রোহী পশুপতির পরিকল্পনা—"ঊর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।" শেষ পর্যন্ত অমোঘ নীতি-বিধানে ঊর্ণনাভ নিজের পাতা জালে নিজেই বন্দী হইয়াছে—ধর্মজ্ঞানহীন, স্বার্থসর্বস্ব শাঠ্য চতুরতর অথচ উন্নততর নীতির দ্বারা সমর্থিত শাঠ্যের নিকট আপনার উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করিয়াছে। দুইটি অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে বঙ্কিম এই যুগান্তকারী রাষ্ট্রবিপ্লবের সমস্ত বিভীষিকা, ইহার ধ্বংসলীলার সর্বগ্রাসী বহ্নিবেষ্টন, ইহার দুর্বিষহ মর্মজ্বালা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তথ্যজ্ঞানের দ্বারা অসমর্থিত ঐতিহাসিক কল্পনার চরম সৃষ্টিনৈপুণ্য এই অধ্যায়গুলিতে উদাহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কল্পনার বর্ণসমাবেশে সর্বাপেক্ষা অবিচার করা হইয়াছে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের উপর—লেখকের তুলি হইতে সর্বাপেক্ষা ফিকে রং,—নৈর্ব্যক্তিকতার ধূসর অবজ্ঞা ও বিস্মৃতি—তাঁহারই উপর বর্ষিত হইয়াছে। যবন-বিপ্লবের প্রবল প্লাবনে তিনি একটি নামহীন বুদ্বুদের মত ভাসিয়া গিয়াছেন; এই বৈদেশিক অভিযানে তাঁহার একমাত্র সক্রিয় অংশ মহিষীর হাত ধরিয়া খিড়কি দরজা দিয়া পলায়ন। একদা দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী, শত্রু কর্তৃক উদ্গীত-প্রশস্তি সার্বভৌম নৃপতির উপর এই অনপনেয় কলংকলেপন রাজ-নৈতিক পরাধীনতা অপেক্ষাও মর্মান্তিক অপমান। আর এই অপমান আসিয়াছে অজ্ঞাতসারে তাঁহারই হাত হইতে, যিনি আধুনিক বাংলার জাতীয় জীবনে দেশাত্মবোধের প্রথম পুরোহিত, যাঁহার দৃষ্টি গভীর আত্মগ্লানি ও মর্মবেদনার সহিত নবদ্বীপের এই অস্তমিত গৌরবরশ্মি-রেখার প্রতি নিবদ্ধ ছিল, যিনি বাংলার স্বাধীনতার এই শেষ যুগে তাঁহার মানস বৃন্দাবন ও বঁধুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের সময় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হয় নাই; কাজেই যে রাজার আমলে দেশের স্বাধীনতা-লোপের দুর্ভাগ্য ঘটে তাঁহাকে হীন বর্ণে, অক্ষম কাপুরুষরূপে চিত্রিত করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা, বঙ্কিম তাহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। স্বভাব-দুর্বলা বঙ্গভূমি অতি মন্দভাগিনী; তাহা না হইলে যে প্রতিভাবান সাহিত্যিক মাতৃভূমির কলংকক্ষালনে একান্ত উৎসুক তাঁহার নিকট ঐতিহাসিক সত্য অপরিজ্ঞাত থাকিবে কেন?

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গৌণ; ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চরিত্র-চিত্রণের অসাধারণত্বই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাসের উচ্চ রঙ্গমঞ্চে নায়ক-নায়িকার পদক্ষেপ মহিমামন্ডিত ও আভিজাত্যদ্যোতক হইয়া থাকে; ইহার বর্ণবহুল শোভাযাত্রায় প্রেমের রংমশাল ইহার দুর্গম পথকে আলোকিত করে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। রাষ্ট্রবিপ্লবের

যুগে মানবজীবনের সাধারণ গতিবেগ বর্ধিত হয়; ইহার ধমনী-প্রবাহিত মন্থর রক্তধারা খরস্রোতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রভাবে অতি-মানবের আবির্ভাব হয়; তাহার শৌর্য-বীর্য, তাহার অভীপ্সা সাধারণ মানকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া আদর্শ লোকের দিকে প্রয়াণ করে। মানবচিত্তের অপ্রত্যাশিত, বিচিত্র স্ফুরণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রবল দোলা, কঠোর ব্রতসাধনের অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা মানবিকতার এক গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় লিপিবদ্ধ করে। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে নর-নারীর সাক্ষাৎ পাই, তাহাদের কার্য ও চিন্তাধারা ঠিক সাধারণ মানবের স্তরের নহে; সাধারণ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া এক ঊর্দ্ধ্বতন জগতের মাধ্যাকর্ষণ তাহাদের জীবনের কক্ষপথকে নিয়মিত করে। সেইজন্য ইহাদের চিত্র যেমন একদিকে ভাস্বর, তেমনি অপরদিকে অস্পষ্ট হইয়া থাকে; ইহাদের অন্তর-রহস্যের পূর্ণ পরিচয়টি আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় না। শিরস্ত্রাণাবৃত সৈনিকের মুখমণ্ডলের মত ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এক সাধারণ শ্রেণীর নির্বিশেষ লক্ষণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণগুলি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই সুপরিস্ফুট হয় না। ইতিহাস-প্রাসাদের গৃহসজ্জার উপকরণের ন্যায় ইহারা সকলেই আপন আপন সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—ব্যক্তিত্বের প্রবল, অচিন্তিতপূর্ব আবেগ ইহাদের প্রত্যাশিত গতিবিধির কোন উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়সাধন করে না। তাই ইহারা সাধারণ পাঠকের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক—তাহাদের চোখে রংএর প্লাবন বহায় ও মনে মোহাবেশের সঞ্চার করে—কিন্তু অপ্রমত্তবুদ্ধি মনস্তত্ত্ববিদের নিকট ইহারা যেন রংকরা পুতুলের মত যন্ত্রারূঢ় ও ক্ষীণপ্রাণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুদূরে সৌরমণ্ডলস্থিত জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের ন্যায় ইহাদিগকে দূরবীক্ষণের দূরপাল্লায় দেখিতে হয়; কাছে আনিয়া অণুবীক্ষণের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ইহাদিগকে দেখিবার উপায় নাই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই সাধারণ প্রবণতা 'মৃণালিনীতে' উদাহৃত হইয়াছে। ইহার নায়ক হেমচন্দ্র ঠিক রোমান্স-জগতের রাজপুত্র—সর্বগুণান্বিত, কাজেই অবাস্তব। যবনধ্বংস অপেক্ষা নিজ হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনেই সে অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত। শত্রু-নিধনের উপায় উদ্ভাবন অপেক্ষা নিজ প্রেমদীর্ণ হৃদয়ের ব্যথা-রোমন্থনই তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। অবশ্য বঙ্কিম বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, গৌড়-রাজসভার অসহযোগিতাই তাহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। কিন্তু হেমচন্দ্র নিজেও যে সক্রিয়ভাবে রাজসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। তবে তাহার অভিমান-প্রবণতা ও হঠকারিতা তাহার অনিন্দনীয় চরিত্র-গৌরবকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার প্রতি বাস্তবতার আরোপ করিয়াছে। হেমচন্দ্র যেমন বাহুবলের, মাধবাচার্য তেমনি অধ্যাত্মবলের ব্যর্থতার প্রতীক্। তিনি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, কিন্তু "পশ্চিম দেশীয় বণিকের" ব্যাখ্যায় তাঁহার ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি অন্ধ হইয়াছে। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার চক্রান্তজাল ভেদ করিতে পারে না। উপন্যাসে তাঁহার একমাত্র সক্রিয়তা মৃণালিনীর সহিত হেমচন্দ্রের বিচ্ছেদ সংঘটন। যে দুরূহ ব্রত সম্পাদনের জন্য তিনি হেমচন্দ্রকে অনন্যমনা রাখিতে চাহিয়াছেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের সময় না তাঁহার, না তাঁহার দেশোদ্ধারের

অব্যর্থ অস্ত্রস্বরূপ রাজপুত্রের কোন সন্ধান মিলিল। তাঁহার শাণিত অসি বাষ্পোচ্ছ্বাসে সিক্ত হইয়া উহার দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে। যেমন গৌড়েশ্বরের সভায়, তেমনি যবন প্রতিরোধমন্ত্রণায় শাস্ত্রবিদের অস্ত্রধারণ-প্রয়াস হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তৎকালীন ইতিহাসে এই সাধারণ নিয়মের প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম আছে—হলায়ুধ ও ভবদেব ব্রাহ্মণসচিবের রাজনীতিজ্ঞতা ও শাসন-কৌশলের বাস্তব উদাহরণস্থল। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে, ব্রাহ্মণের জ্যোতিশাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতা, পারলৌকিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা তাহাদের কূটনীতি-প্রয়োগকে বিড়ম্বিত করিয়াছে। মাধবাচার্য, অভিরামস্বামী ও চন্দ্রচূড়ের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত যাজকতন্ত্রশাসিত রাজনীতির এই দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

(৩)

এইবার নায়িকা-চরিত্রের আলোচনা করা যাইতে পারে। রোমান্সের নায়ক ও নায়িকা যদিও চরিত্র-পরিকল্পনার দিক দিয়া প্রায়ই অভিন্নজাতীয়, তথাপি ইহাদের মধ্যেও একটা পার্থক্য অনুভব করা যায়। নায়ক-চরিত্রে আদর্শ অনুসৃতির সঙ্গে খানিকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংমিশ্রণ থাকে। পুরুষের আদর্শ একেবারে চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট হয় না—শৌর্য-বীর্য-উদারতা-মহানুভবতা প্রভৃতি সাধারণ গুণের অন্তরালে প্রতিটি নায়কের খানিকটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে—অবস্থাভেদে ও উপরোক্ত গুণসমূহের তারতম্যভেদে দুই সমজাতীয় নায়ককে পৃথকভাবে চেনা যায়। কিন্তু বাঙলাদেশে রোমান্সের নায়িকার আদর্শ সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে একেবারে চিরকালের জন্য ঢালা হইয়া গিয়াছে। কোমল-স্বভাবা, নিরভিমানা, পতিব্রতা সাধ্বীর দৃষ্টান্তপ্রভাব ইঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহিরের কার্যকলাপের ছন্দটি নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। মাঝে মধ্যে তেজস্বিতা ও চরিত্রদার্ঢ্যের আকস্মিক স্ফুরণ ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন নমনীয়তার মধ্যে খানিকটা অস্থি-কাঠিন্যের সঞ্চার করে। মৃণালিনী বৌদ্ধযুগের নারী হইয়াও আমাদের সনাতন পৌরাণিক আদর্শকেই জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কেবল দুর্বৃত্ত ব্যোমকেশের দুরভিসন্ধির প্রতিবাদ স্বরূপ তাহার সতীত্ব-সৌকুমার্যের পিছনে যে কুলিশ-কঠোর সংকল্প অলক্ষ্যভাবে অবস্থান করে, তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত বিকাশ কোথাও স্ফুরিত হয় নাই—আত্মাধিকারশীল অদৃষ্টবাদের স্নিগ্ধচ্ছায় আকাশ-তলে ইহার খরদীপ্ত ও তাপ স্তিমিত হইয়াছে। মৃণালিনী 'দুর্গেশনন্দিনীর' ব্রীড়াসঙ্কুচিত, অস্ফুটবাক্ তিলোত্তমারই সমগোত্রীয়া—কিন্তু বিপদের অভিজ্ঞতা তাহাকে খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি দিয়াছে। সে সম্পূর্ণরূপে অবস্থার ক্রীড়নক নয়, অবস্থার প্রতিবিধানোপযোগী ন্যূনতম শক্তির অধিকারণী। সে গৌড় হইতে নবদ্বীপে আসিতে কতকটা সজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে গিরিজায়ার অনুসরণ করিয়াছে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমচন্দ্র, মৃণালিনী কেহই নহে, সে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্বসৃষ্টি—মনোরমা। 'দুর্গেশনন্দিনীর' সহিত তুলনায় 'মৃণালিনীতে' বঙ্কিমের চরিত্র-

পরিকল্পনা যত গভীরতর ও অন্তঃপ্রবেশশীল হইয়াছে, মনোরমা চরিত্রই তাহার নিদর্শন। মনোরমা অন্তর-রহস্যের জটিলতা প্রথম দৃষ্টিতে ভেদ করার মত নহে—ইহার মূল প্রেরণা অনিশ্চিত ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল অভিপ্রায়ের চক্রব্যূহে বন্দী। তাহার রহস্যময় দ্বৈত প্রকৃতির মূলসূত্রটি বঙ্কিম উদ্‌ঘাটন করেন নাই, কিন্তু তাহার অনবদ্য রূপায়নেই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সে অনেকটা উভচর জীব—তাহার একপদ সরল, গার্হস্থ্য জীবনে, আর একপদ ইতিহাসের আঁকা-বাঁকা, অদৃশ্য-গহ্বর-বিকীর্ণ, পিচ্ছিল গিরিসংকট-পথে। এই উভচর বৃত্তির অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই সে তাহার প্রকৃতি-দ্বৈততা অর্জন করিয়া থাকিবে। মনে হয় যে, তাহার যৌবনের নিরুদ্ধ কামনা তাহার স্বাভাবিক পরিণতিকে প্রতিহত করিয়া তাহাকে একদিকে কিশোরীর সংসারানভিজ্ঞ সারল্যে, অপরদিকে প্রৌঢ়ত্বের মহিমাময় গাম্ভীর্যে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া থাকিবে। দৈব প্রতিকূলতার জন্য যে যৌবন-নদীতে সে সাঁতার দিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাহারই দুই কূলে পা দিয়া সে চিরন্তন প্রহেলিকার মতই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যৌবন-জলতরঙ্গ তাহার দেহে-মনে প্রতিরুদ্ধ হইয়া এই অস্বাভাবিক প্রকৃতি-বৈষম্যের হেতু হইয়াছে—কোথাও বা শীর্ণ, স্বচ্ছ জলধারায়, কোথাও বা কূলপ্লাবী তটিনীর অতলস্পর্শ আবর্তরূপে অসম উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছে। উচ্চ মালভূমি যেমন নদীপ্রবাহকে দুই স্বতন্ত্র খাতে পরিচালিত করে, তেমনি তাহার অকাল-বৈধব্যের অতর্কিত উপলব্ধির নিদারুণ আঘাত তাহার যৌবন-চেতনায় এক দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতবিদারণ-রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাকে বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তিত করিয়াছে। শেষে নিয়তি এই দ্বৈতসত্বার লীলাভিনয়ে যোগ দিয়া এক বিষাদময় পরিণতির ঐক্যে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে। তাহার তথা-কথিত মৃত স্বামীর যখন সত্যই মৃত্যু ঘটিল, তখন তরুণীর এই ধাঁধা-লাগানো আত্মবিভেদ সমন্বয়ে সমাধান লাভ করিয়াছে—স্বামীর চিতানলে আত্মাহুতিতে তাহার এই বালিকা-প্রৌঢ়ার জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের নিরসন হইয়াছে।

(৪)

ইতিহাস-সৌধের অবলম্বনস্বরূপ ইহার ভিত্তিমূলে বাস্তব জীবনের একটা স্তর অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই বাস্তব দ্যোতনার অভাবেই পণ্ডিত-রচিত ইতিহাস প্রায়ই সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিভা ইতিহাসের চারিদিকে খানিকটা বাস্তব জীবনের ইঙ্গিত বিকীর্ণ করিয়াছে। তথ্যজ্ঞানের অভাবে এই বস্তুসমাবেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও সন্দেহ-নিরসনকারী হইয়া উঠে নাই, ইহা স্বীকার্য। গৌড়ের হৃষীকেশের পারিবারিক জীবন, জনার্দন-মনোরমার ক্ষুদ্র জীবনযাত্রা, মৃণালিনী, দিগ্বিজয়, গিরিজায়া—এই সমস্তই ইতিহাসের বাস্তব অবলম্বের নিদর্শন। অবশ্য ইহাদের বাস্তবতা যে নিতান্ত সুপরিস্ফুট তাহা নহে। নায়ক-নায়িকার রাজমহিমা ফুটাইতে উচ্চ সিংহাসনে আরোহণোপযোগী পাদ-পীঠের ন্যায় সখী, দাসদাসী প্রভৃতি জাতীয় সৃষ্টির প্রয়োজন। সুতরাং খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে বাস্তবতার খাতিরে যতটা নয়, ততটা আদর্শ লোকের প্রয়োজনেই এই সাধারণ

স্তরের নর-নারীর প্রবর্তন। সখী-সহচরীর ধারা শকুন্তলা—বাসবদত্তার যুগ হইতে প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। রাজান্তঃপুরের সম্ভ্রম-সংরুদ্ধ প্রতিবেশে ইহাদের মাধ্যমেই সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত থাকে। মৃণালিনী না থাকিলে মৃণালিনীর অন্তরঙ্গ গোপন বার্তাগুলি পাঠককে পরিবেশন করা দুঃসাধ্য হইত। হয়ত বা যাত্রার দলের অধিকারীর ন্যায় লেখককেই বৃন্দাদূতীর অংশে অবতীর্ণ হইয়া নায়িকার মরমের কথাগুলি ফাঁস করিতে হইত। অবশ্য উপন্যাস-লেখক যে এরূপ কার্যে একেবারে অনভ্যস্ত বা অপটু তাহা নহে, তবু দায়িত্ব ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দিলে কলাকৌশলের মাত্রা লংঘিত হয় না। ব্যোমকেশের দুঃশীলতা ও হৃষীকেশের অপরাধী পুত্রের পক্ষসমর্থন ও আশ্রিতা, নিরপরাধা নারীর প্রতি শাস্তি-প্রয়োগ সর্বকালিক মানবীয় চিত্তবৃত্তির উদাহরণ —ইহা বরং যেন আধুনিক যুগের ঘটনা। প্রাচীন যুগের উন্নততর আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় ইহাতে বিশেষ মিলে না। বধির জনার্দনের প্রবর্তন কতকটা হাস্যরসের প্রয়োজনে, কতকটা মনোরমা-প্রহেলিকার একটা পারিবারিক উদ্ভবস্থল নির্দেশের জন্য হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে। পরিচারক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে প্রখর ব্যক্তিত্ব ও প্রখরতর রসনাসম্পন্ন করিলে প্রভু চরিত্রের সহিত বৈপরীত্য-সাধন ও বাস্তবতার প্রবর্তন উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের সমার্জনী-মার্জিত প্রণয়লীলা হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর অশ্রুজলসিক্ত, দীর্ঘশ্বাসক্ষুব্ধ ভুল বোঝার প্রমাদে বিড়ম্বিত, হা হতোঽস্মি জাতীয় প্রেমের সুন্দর বৈপরীত্য-বোধক—এ যেন আদর্শ লোকের তীব্রমথিত হৃদয়াবেগের স্থলে বাস্তবতার ঝাঁটা সঞ্চালন। গিরিজায়া খানিকটা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হইয়াছে, গীতগোবিন্দের যুগে বাঙ্গালা কীর্তন সৃষ্ট হইবার পূর্বেই সে কীর্তন গাহিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার তেজস্বিতা, সৎসাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রহরণরূপে নখদন্তপ্রয়োগে অসংকোচ উৎসাহ তাহাকে মৃণালিনীর অতি মৃদু, ক্ষমাশীল প্রকৃতির পরিপূরকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বাস্তবপ্রবণতার ছিটে-ফোঁটা ছাড়াও, বঙ্কিমের বাস্তব বর্ণনার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় আছে তাঁহার নবদ্বীপ অধিকারের চিত্রে। আগুন যে কেন জ্বলিয়াছে, তাহা তিনি ভাল করিয়া দেখান নাই, কিন্তু উহা যে জ্বলিয়াছে তাহা নিশ্চিত। আমরা প্রতি স্নায়ুতন্ত্রীতে এই অগ্নিকাণ্ডের দাহিকা শক্তি, ইহার ত্বক্-ঝলসানো আঁচ অনুভব করি। যিনি কাল্পনিক চিত্রের মধ্যে এই মহাপ্রলয়ের অনুভূতি জাগাইতে পারেন, যাঁহার শব্দপ্রয়োগের ভিতর দিয়া এক সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার লোলিহান জিহ্বা ফণা ধরিয়া উঠে, তিনি যে একজন বাস্তবরসের রসিক, মৃত্তিকার আদিম রসধারার সহিত তাঁহার মানস লোকের যে একটা নিগূঢ় সংযোগ আছে তাহা অনস্বীকার্য।

২রা শ্রাবণ, ১৩৫৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় } **শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

[**শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**—ইনিও প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের উপর কতকগুলি সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখিয়া এই

দিকে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন। তাঁহার 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থখানি বহুল প্রচারিত শুধু নয়, বহুল আলোচিতও। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' বা বঙ্গভাষার প্রধানাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে অধ্যাপনা ও অফিস পরিচালনার ব্যাপারে অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের পরিচালন ব্যাপারেও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি স্বীয় মাতৃভূমি বীরভূম জেলার একটি অংশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় একটি আসন অধিকার করিয়াছেন এবং ইতো-মধ্যেই সরকার পক্ষের বিরোধীদলের মধ্যে অন্যতম দলপতি হিসাবে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।।

বিষবৃক্ষ ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ)

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক এবং কবি। তাঁহার উপন্যাসগুলির রোমান্স-লক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে কাব্য-মর্যাদা দান করিয়াছে, উপন্যাসের বাস্তব-ভূমিকে ত্যাগ করিয়া কবি-ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্নাকাশে উধাও হইয়া গিয়াছে; কিন্তু শুধু সেজন্য বঙ্কিমকে কবি বলিতেছি না। সে অর্থে তো বটেই আরও গভীরতর অর্থে তাঁহাকে কবি বলিতে হয়। জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া সেই সঙ্গে তাহার বিচিত্র দিকের এক একটি নিজস্ব লোককে এমন তন্ময় হইয়া দেখার প্রবৃত্তি খুব কম ঔপন্যাসিকেরই দৃষ্ট হয়। তখন সেই বিশিষ্ট রূপের জগতটি যে উপন্যাসের নানা ঘটনা ও কাহিনীর অনুরূপ হিসাবে থাকিয়া একটি বৃহৎ অখন্ডতা মাত্র গড়িয়া তুলিতেছে, শুধু তাহাই মনে হয় না, সে নিজেই একটি অখন্ডতার দাবী করে। পাঠককেও ক্ষণিকের জন্য অগ্রগতির প্রতি সকল কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া সেই বিশেষ রূপের ধ্যানেই তন্ময় থাকিতে হয়। এই বিশিষ্ট কবি-প্রবৃত্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসমূলক রচনাকে 'হিউমারে'র লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে। সেখানে গতানুগতিক ধারণা লইয়া আমরা যে জীবন-বোধ গড়িয়া তুলিতেছি তাহা হইতে পৃথক এবং সকল দিক দিয়া ভিন্ন মূল্যবোধবিশিষ্ট জগতকে সহসা দেখিয়া আমরা চমকিত হই এবং তাহার প্রতি এতই আস্থাবান হইয়া উঠি যে, আমাদের এতকালের এত যত্ন-পোষিত ধারণাসমূহের অতিশয় লঘুত্ব সপ্রমাণ হইয়া আমাদিগকে লঘু-হাস্যের অধিকারী করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, সেই নবসৃষ্ট মূল্যবোধ আমাদের জীবনের নিত্যকারের অনাচার-অবিচারের একটা অসংগত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটা নেশারও সৃষ্টি করে। প্রচলিত ধারণায় যাহা পাপ তাহার জন্য শাস্তি বিধানের নিপুণ আয়োজন দেখিয়া হাসি পায়; সকল 'হিউমারে'র ইহাই নিদান। কিন্তু সে কথা বলিতেছি না। উপন্যাসের খন্ড খন্ড দিকগুলিও যে এক একটি অখন্ডতার সৃষ্টি করে বলিয়া ভ্রম হয়, সেই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্র-চরিত্রের আলোচনা করা যাইতে পারে।

উপন্যাসের মূল ট্রাজিডি ভাগে—কুন্দ চরিত্রে সূর্যমুখীর সন্দেহ উৎপাদনে, হীরার সেই রহস্য-সন্ধানের অভিযানে এবং দেবেন্দ্রের প্রতি আসক্তিতে, তাহার কুন্দনন্দিনীর প্রতি ঈর্ষায় কুন্দের মৃত্যু-সংঘটনে এবং নিজের জীবনের শোচনীয় পরিণাম বহনে—দেবেন্দ্রের দান যাহাই হউক তাহার মাতাল-চরিত্রের সমস্ত প্রকাশ এবং পরিণামের সঙ্গে ইহাদের যোগ তেমন নিবিড় বলিয়া মনে হয় না। এ ব্যাপারে কুন্দ শুধু একটা নিমিত্ত এবং দেবেন্দ্রের মৃত্যুকালে হীরার আবির্ভাবকে এতবড় একটা স্থান দেওয়া হইলেও রসের দিক দিয়া তাহা নগণ্য জগৎ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ যে মাতলামি বৃত্তি তাহার বিকাশ এবং পরিণামের ইতিহাসও যেমন স্বতন্ত্র তাহার রূপটাও তেমনি স্বয়ম্পূর্ণ। দেবেন্দ্রের এই জীবনের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা তাহার যৌক্তিকতা যেমনই থাক তাহার প্রকাশ পাঠকের মনকে গভীর করিয়া স্পর্শ করে।

"দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন আর এমন কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর—"

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব, নচেৎ এখন মরি-বাঁচি সমান কথা।" —দশম পরিচ্ছেদ

এই জগতের ভাব এবং ভাষাও—ভাষা বলিতে সে ভাষায় প্রযুক্ত উপমাদি অলংকার এমন কি তাহার শব্দাবলী ও বাক্যভংগীও স্বতন্ত্র। তাহার যে-কোনও অংশ পাঠে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দেবেন্দ্রের মুখের গানগুলিও সেই জাতের। নেশার ঘোরে সে যে গান গায় তাহার ভাষাটাও নেশা মাখানো। শুধু মাতালের উপযোগী ভাষা বলিয়া বলিতেছি না, রসানন্দে মগ্ন পাঠক-চিত্তে সে একটা নেশার সৃষ্টি করে।

"সেই গেলাসে দেবেন্দ্রের মাত্রা পূর্ণ হইল—দুই একবার ঢুলিয়া দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিম্‌কানি মারিয়া গাহিতে লাগিল,—

বয়স তাহার বছর যোলো
দেখ্‌তে শুন্‌তে কালো-কালো
পিলে অগ্রমাসে মলো
আমি তখন থানায় পোড়ে।"

—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কিম্বা অন্যত্র—

"তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গাহিলেন,—

এসেছিল বক্‌না গরু
পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে—"

প্রকৃতিস্থের এবং নেশাগ্রস্তের ভাষায় কোনও ভেদ নাই, তাহার সমস্ত জীবনটাই ঐ নেশার সুরে বাঁধা। দেবেন্দ্রের মৃত্যুকালীন প্রলাপোক্তিতে হীরার যে দান তাহার রূপ অত্যন্ত আকস্মিক এবং অস্পষ্ট। এই অংশের হীরা সম্পর্কিত গুরুত্ব স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি

হয় না, যদিও পরিণামে এই দুইটি জীবনের ট্রাজিডিকে একাকার করিয়া দেওয়ার চেষ্টা আছে। হীরাকৃত অপমান দেবেন্দ্র ভুলে নাই, তাহার প্রতিকার-কল্পে সে যাহা করিয়াছিল তাহার যথার্থ মূল্য-বিচারে দেবেন্দ্রের অন্তর-পোষিত—বাহিরে প্রকাশ রহিত জ্বালাকে খুব বড় স্থান দিলে দেবেন্দ্র-চরিত্রের তন্ময়তাকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। দেবেন্দ্র যে উপন্যাসের শেষে হীরার কণ্ঠের গানের প্রতিধ্বনি করে, সে হীরা-ঘটিত ভুলের স্বীকৃতি নহে। সে ভুল প্রাণের ভুল, সেই ভুলই তাহার মাতাল-জীবনের সঞ্জীবনী।

"সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যু-শয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র বলিয়াছিল—

"পদপল্লবমুদারম্ পদপল্লবমুদারম্।"

-পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের আখ্যানভাগে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর ট্রাজিডি। ঘটনাবস্তু অত্যন্ত সামান্য, মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের যে বাহুল্য আছে তাহাও নহে তবু সমস্ত উপন্যাসটি পড়িয়া মনে হয়, একটা ব্যাপ্তি আছে। ঘটনাবস্তু যতই সংক্ষিপ্ত হউক কল্পনার ঐশ্বর্যে পাঠক-মনকে দীর্ঘ-ভ্রমণের ফল দেয়। উপন্যাসের প্রথম দিকে কুন্দনন্দিনীর মায়ের স্বপ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যস্থলের হীরা-দেবেন্দ্র ঘটিত কাহিনী, সূর্যমুখীর গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া, সন্ন্যাসী কর্তৃক শুশ্রূষা এবং উদ্ধার, নগেন্দ্রের বিবাগী হওয়া এবং শেষ দৃশ্যে দুর্যোগের রাত্রিতে সূর্যমুখীর রহস্যময় আবির্ভাব, হীরার বিষবটিকা সংগ্রহ এবং কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে একটা কার্যকারণগত বিবর্তনের সূত্র থাকিলেও ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটি এমনি একটা ব্যাপক পটভূমির সৃষ্টি করে যে, উপন্যাসটি খুব দীর্ঘায়তন বলিয়া ভ্রম হয়, যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে। কোনও সমালোচক বলিতেছেন—

"বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ঘটনা-সন্নিবেশ অতি কলাকৌশলময়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস যেখানে আখ্যায়িকা নানা খণ্ডে বিভক্ত না হইয়া একটানাভাবে চলিয়াছে; গণিতের ধাপের মত একটির পর একটি পরিচ্ছেদ অনিবার্যভাবে আসিয়াছে। কোথাও অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয় নাই, কোথাও কাহিনী অনাবশ্যকভাবে থামিয়া থাকে নাই।"

ইহা ছাড়াও এই উপন্যাস-নিহিত জীবনেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আজিকার দিনের পাঠকের কাছে সুপরিচিত নয় বলিয়া একটা বিস্ময়রসের সৃষ্টি করে। নাগরিক জীবনের প্রতি মোহ এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ দ্রুত আমাদের দেশের সেই জীবনপদ্ধতিকে গ্রাস করিতেছে। জমিদার নগেন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের যে দিককে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসের ট্রাজিডি রচিত সেই দিকটির সহিত তাঁহার ছয়-মহলা বাড়ীর সমস্তটার যোগ প্রতিপদে স্পষ্ট না হইলেও তাঁহার উত্থান-পতনে সে সমস্তেরও উত্থান-পতন সম্পন্ন হয় বলিয়া উপন্যাসের আদিতে এবং অন্তে সে দিকটির চিত্র 'ট্রাজিডির' রসকে গাঢ় করিতে সহায়তা করিয়াছে।

"গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয়-মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারী বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্যপ্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সঙ্গে বাস করে, কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে কি আকাশের অন্ধকার যায়?"

—দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সূর্যমুখীর ফিরিয়া আসার পর ছয় মহল-জোড়া এই অন্ধকার অপসারিত হইয়াছে। সে আলোক যে জাগরণ সম্পন্ন করে, তাহা শুধু সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের অবরুদ্ধ প্রেম-জীবনের নহে, সেখানে বহু দাসদাসী বহু আত্মীয়-স্বজন ভীড় করিয়া আসে।

"হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহা কলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক। হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া কেশ-রঞ্জনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডালাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্বচন কহিতেছে। বালক-বালিকারা নাচিতেছে, গাহিতেছে এবং করতালি দিতেছে।" —অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

তথাপি এই ট্রাজিডির মূল নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সন্ধান করিতে হয়। সেই দিকটির রূপকে আমরা অতঃপর প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিব।

কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রথম দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে কমলের বাড়ী হইতে হরলাল ঘোষালকে লিখিত পত্রে। সেখানে কুন্দনন্দিনীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বলিতেছেন, "কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে, অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপ্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয় এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত-মাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্প-সৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।" —পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহার পরে তারাচরণের ইতিহাস প্রাসঙ্গিক মাত্র; বঙ্কিমচন্দ্র এই অধ্যায়কে তাঁহার অল্পবস কাব্যের সিঁড়ি বলিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্যের ইতিহাসও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; ঐ অংশের একটা দিক পরবর্তীকালে দেবেন্দ্র-হীরা-কুন্দ সম্পর্কিত ঘটনার মধ্য দিয়া অনুসৃত।

নগেন্দ্র-চরিত্রের পরিবর্তনের কোনও চিত্র নাই, তাহার পরিবর্তনের কথা অতঃপর পাই সূর্যমুখীর পত্রে। ইহার পরের পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের যে দশা দেখি, তাহাতে বুঝা যায়

তিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন সমস্ত সঙ্কোচের মাথা খাইয়া—প্রায় বে-পরোয়া গোছের। সূর্যমুখীর প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"সূর্যমুখি, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।" —দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রের মনে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহার কোনও বিশ্লেষণ উপন্যাসে নাই। সূর্যমুখীর কমলের নিকট পত্রে তাহার কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। আর একবার মাত্র নগেন্দ্র নিরালায় কুন্দের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া বলেন—

"শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।" —ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অতঃপর কুন্দনন্দিনীর হঠাৎ তিরোভাবে নগেন্দ্রের সমস্ত ভদ্রতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সূর্যমুখীকে ইহার কারণ স্থির করিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন। এদিকে নগেন্দ্রের মুখে স্বীকারোক্তির পরে সূর্যমুখীর শেষ আশার বাঁধও ভাঙ্গিয়াছে। তখন সূর্যমুখী মনস্থ করিয়াছেন—

"আমার সর্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড় না আমি বড়!" এই অধ্যায়ের নাম "বিষবৃক্ষের মুকুল।" —একবিংশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর বিবাহ সংঘটনের পর হইতেই প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস। প্রথম প্রেমের আবেগটা কাটিয়া যাওয়ার পর নগেন্দ্র সমস্ত ব্যাপারটার সম্যক্ তাৎপর্য তলাইয়া দেখিতে পারিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পলায়নের জন্য তিনি সূর্যমুখীকে দায়ী করিয়াছিলেন, এখন সূর্যমুখীকে হারানোর জন্য কুন্দনন্দিনীকে দায়ী করিতেছেন—

"ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়। তোমারই জন্য সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।" —একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালের নিকট পত্র লেখার কালে চোখের ভালবাসার ক্ষণস্থায়িত্ব খ্যাপন করিতেছে।

ইহার পরে সূর্যমুখীর কাহিনী ভাগ যতই মর্মন্তুদ হউক কুন্দনন্দিনীর প্রতি চারিদিক হইতে যে উপেক্ষা বর্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে সেই অসহায়া বালিকার দুঃখ বড় মর্মস্পর্শী হইয়াছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলনের পরে কুন্দকে উভয়ে মিলিয়া দেখিতে যাওয়ার মধ্যে

যে উদারতা তাহা কুন্দনন্দিনীকে প্রেমের চোখে অনেকখানি খাটো করিয়া দিয়াছে। এই উপন্যাসের সমস্ত ট্রাজিডিটা ছিল নগেন্দ্র-সূর্যমুখী এবং তাঁহাদের পারিবারিক জীবনকে ঘিরিয়া। কুন্দ তো সে ট্রাজিডির পরিণাম-সাধনে একজন কারণমাত্র, কিন্তু নাটকের শেষ অংশে কুন্দের ট্রাজিডি সর্বাপেক্ষা করুণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুগ্ধা বালিকা সহসা প্রগল্‌ভা হইয়া বলিতেছে—

"কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে,—কাল যদি একবার আমার নিকট এমন করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।" —ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের সমস্যার এই ভাবেই নিরসন হইতে পারিত। এই ঘটনা নগেন্দ্রসূর্যমুখীর মিলনকে যুগপৎ গভীর দুঃখ এবং চরম নিরাবেগের দ্বারা গাঢ় করিয়া থাকিবে।

বলিয়াছি, হীরার কাহিনী উপন্যাসে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া আছে, কিন্তু সে অংশের কারুণ্যকে ঘটনায় যত মর্মান্তিক করা হইয়াছে, রসের দিক দিয়া ততখানি নহে। মনে হয়, ইহাতে বিষবৃক্ষের অপর এক দিক উত্থানের সচেতন প্রয়াস আছে। বঙ্কিমের সমাজ-সংস্কারক মন এই ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উপন্যাসের শেষ কথা কয়টি এইরূপ—

"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮ই বৈশাখ,
১৩৫৬

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু
অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

[**মণীন্দ্রমোহন বসু**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। বৌদ্ধগ্রন্থ 'চর্যাপদ' ইঁহার নিজস্ব বিষয় ছিল। সে সম্বন্ধে ইঁহার একটি গ্রন্থও আছে। চিন্তাশীল লেখক ও অধ্যাপক হিসাবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।]

ইন্দিরাঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ)

মঙ্গল-কথার স্নিগ্ধচ্ছায়ায় শ্যামলিমমধুর প্রাকৃতিক আবেষ্টনে রামচরিত এবং কৃষ্ণ-কথার নব নব মাধুর্য আস্বাদনের পথ ধরিয়া বাঙ্গালীর রসচেতনা বহিয়া আসিতেছিল। রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবর্তের দ্রুতপ্রসার্যমান প্রভাবে ঊনিশের শতকে বাঙ্গালী নবজীবনসঞ্চারের অনুরূপ এক নবীন প্রেরণা অনুভব করিল। পশ্চিমের কাব্যসাহিত্য, দর্শনবিজ্ঞান, ইতিহাস-রাজনীতির নব পরিচয় লাভ করিয়া এবং অত্যল্পকালের মধ্যে এই নবপরিচয়-প্রসূত চিত্তবিভ্রম কাটাইয়া উঠিয়া বাঙ্গালী পশ্চিমের প্রবল জীবনাবেগ আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার শিল্পচেতনা ও নবলব্ধ সমাজ-চেতনাকে রূপ ও রসসৃষ্টির নব নব খাতে বহাইয়া দিল।

বাংলার এই যুগকে জাতীয় জীবন-গঠনের প্রস্তুতি-যুগ বা উদ্যোগ-পর্ব আখ্যা দিলেই বোধ হয় ঠিক হইবে। অকৃত্রিম জীবন-জিজ্ঞাসা, সুগভীর সামাজিক সহানুভূতি এবং উদার বলিষ্ঠ কর্মোৎসাহময় মানবিকতা-বোধ এই যুগের চিন্তা, চেষ্টা ও সৃষ্টিকে সুপরি-চিহ্নিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রমসাধ্য কর্মপ্রচেষ্টার মতো প্রবল ভাবোৎসাহের পরেও অবসাদজনিত একটা তন্দ্রালুতা দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, ন্যূনাধিক এক শতাব্দীকাল ধরিয়া, নূতন-পুরাতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে, এমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন তামস-স্তব্ধতা, একটা সুপ্তি-জাগরণ-মিশ্র ঘুমঘোর বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছিল। এই আবরণ সবলে ছিন্ন করিয়া জাগরণী গান গাহিয়া উঠিয়াছিল ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাঙ্গালী জাতি। ঘুমভাঙানোর সেই গানটি মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করিয়াছিল। একটি বাঙ্গালীর কণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়া তাহা সারা ভারতের সুপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিম। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত অথচ রহস্য-গভীর পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে ঐন্দ্রজালিক কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিলেন। মরা নদীর খাতে জোয়ারের বান ছুটিল, কল্লোল জাগিল। সেই কল্লোল যে নবপ্রবুদ্ধ জাতিরই প্রাণকল্লোল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের একালের পাঠকও কান পাতিলে এবং প্রাণ ঢালিয়া দিলে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন। এইরূপ উপলব্ধির পথেই বঙ্কিম সাহিত্য-সমালোচনার যথার্থ সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বারংবার মনে হইয়াছে।

ইংরেজি-সাহিত্য-বিশারদ একাধিক সমালোচক বঙ্কিমপ্রতিভার দিগ্‌দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' সম্পর্কে যে তথ্য-সূত্রটির উপর জোর দিয়াছেন তাহা এই যে, এই দুইখানি কথাগ্রন্থেই বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি নূতন প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহার

উদ্ভব হইয়াছিল পশ্চিম সাগরের অপরপারে। রূপকল্প ও প্রয়োগবিজ্ঞানের (technique) দিক্ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধমর্ণ, আর উত্তমর্ণ হইলেন 'শুক্লবসনা সুন্দরী'-বিষয়ক ইংরেজি উপন্যাসের রচয়িতা উইল্কি কলিন্স, 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাস-রচয়িতা চার্ল্স ডিকেন্স এবং 'হেনরী এসমন্ড' উপন্যাসের লেখক উইলিয়াম মেকপীস্ থ্যাকারে। বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকের বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বভাব-সুলভ সত্যানুরক্তি ও ঔদার্যবশে 'রজনী'র 'বিজ্ঞাপনে' নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্কি কলিন্স-কৃত "Woman in White" নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।" বঙ্কিম-সাহিত্যের পশ্চিমাস্য সুধী ব্যাখ্যাতাদিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিতে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক সুবৃহৎ সমালোচনা-গ্রন্থে "একটি পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা ও ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র দেখাইয়াছেন" বলিয়া 'ইন্দিরা'-রচয়িতা সাধুবাদ অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে আবার ইহাও বলা হইয়াছে, "এই সামান্য আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্যা আলোচিত হয় নাই," এবং "ইহাদের কাহারও মধ্যে একটা চরিত্রগত গভীরতা নাই", এবংবিধ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হইয়া আমাদিগকে থামিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে এবং "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" স্মরণ করিয়া এই মহাজন-সংগৃহীত পাথেয় অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমতীর্থ-পরিক্রমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

'ইন্দিরা' বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত একটা আখ্যায়িকা, 'রাধারাণী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে লইয়া এই তিনটি আখ্যায়িকাকে ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ছোট গল্প হিসাবে 'ইন্দিরা' এবং অপর দুইখানি সহচর গ্রন্থ একালের ছোট গল্পের মতো সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, এরূপ মতও প্রকাশিত হইয়াছে। এই মতের সমীচীনতা বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা পরিহার করিয়া চলিতে পারি। কারণ আমাদের আলোচ্য এবং একালের পাঠকদের পরিচিত 'ইন্দিরা' একখানি উপন্যাস, 'ইন্দিরা'র পঞ্চম সংস্করণ, নব-সংযোজিত অতিরিক্ত পনেরোটি পরিচ্ছেদ লইয়া প্রথম-প্রকাশিত রূপের প্রায় চতুর্গুণ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁহার অননুকরণীয় বঙ্কিম-ভঙ্গীতে বলিয়াছেন, "ইন্দিরা ছোট ছিল, বড় হইয়াছে।......এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে। তবে ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে।" এ বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি এবং সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে-ছোটকে বঙ্কিমচন্দ্র বড় করিয়াছেন, সে বড় হইয়া সুন্দর হইয়াছে, সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ-লালিতা সযত্ন-সংবর্ধিতা মানস-দুহিতা সৌন্দর্যে অনবদ্যাঙ্গী এবং প্রাণচাঞ্চল্যে হ্লাদময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা সাধ্যমত ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সুন্দর সুঠাম অবয়ব-সংস্থানের মধ্যেই যে সৌন্দর্য নিঃসংশয়রূপে এবং সমগ্রভাবে

অবস্থান করে, ইহা অনেকে মানেন না, আমরাও মানি না। অবয়ব-সংস্থানের বাহিরে অথবা গভীরে, অবয়বাতিরিক্ত সৌন্দর্য, দেহাতিরিক্ত দেহী বা আত্মপুরুষের মতো বসতি করে। কোনও বিশেষ সৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্রের অনুসন্ধান এবং শিল্পীর রসচেতনার উৎস অনুসন্ধান বোধ হয় একই কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর রসচেতনার উৎসমূলে যে আত্ম-পরিজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি বিরাজমান, তাহা সর্বজনমনোহর বাণীবিগ্রহ ধারণ করিয়া বঙ্কিমের অপরাপর রস-রচনার মতো তাঁহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ব 'ইন্দিরা'য়ও প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্পীর আত্মবোধ জাতীয় ভাবধারণা ও জাতীয় রূপ-কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশলাভ করে। সুতরাং সর্বদেশের সর্বকালের সার্থক সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হইয়াই বিশ্বসাহিত্য হইয়া উঠে। পশ্চিমের মনীষী সাহিত্য-ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন, "Thus in our study of literature on the historical side, we shall have to consider two things—the continuous life or the national spirit in it ; and the carrying phases of that continuous life, or the way in which it embodies and expresses this changing spirit of successive ages."

এই সারগর্ভ উক্তি আমাদের ভাষার পরিচ্ছদ পরিলে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে,—"ঐতিহাসিক বিবেক লইয়া সাহিত্যবিচার করিতে গেলে আমাদিগকে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্যের অন্তরালে যে অনবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহ বা বহমান জাতীয় ভাবধারা রহিয়াছে; এবং সেই অখণ্ড জীবন পরিবর্তনশীল রূপাভিব্যক্তির মধ্যে যে-ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ সেই অনবচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহ যুগযুগ-বাহী পরিবর্তনশীল ভাবধারাকে যে-ভাবে গ্রহণ ও স্বীকরণ-পূর্বক রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অজস্র সৃষ্টিসম্ভারের মর্মমূলে যে স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময় রস-চেতনা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার সবিতর্ক আত্মবোধ কিরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, 'ইন্দিরা' উপন্যাসের সাহায্যে আমাদিগকে কতকটা সেই বিষয়েরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। 'ইন্দিরা'র ঘটন-পরিবেশ প্রায় এক শতাব্দী আগেকার বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ ও পরিবারে সংস্থাপিত হইয়াছে। একটি পরিবার নহে, অন্ততঃ তিনটি পরিবারের চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইন্দিরার স্বামীর দারিদ্র্য-মোচনের কাহিনীর সহিত শিখ-যুদ্ধের সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতেই ইহার কাল-পরিবেশ অনুমিত হইতে পারে। সে-কালের বিত্তশালী বড় ঘরের মেয়ে ইন্দিরা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত 'সোনার ভাটা' লইয়া না খেলিলেও ইন্দিরা টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিত। স্বামিসঙ্গ-বিচ্যুতা কন্যা কাঞ্চন কৌলীন্য-স্ফীত পিতার প্রতি অভিমান করিয়া মনের দুঃখে মাকে বলিয়াছিল, "আমি টাকা পাতিয়া শুইব।"

ইন্দিরার শ্বশুর বৌকে বাড়ী আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে ইন্দিরার বড়-মানুষ বাবা লোক ফেরৎ দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "বেহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তারপর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়েকে লইয়া

খাওয়াইবেন কি?" এই রূঢ় হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যানে সেকালের টাকার গরম এবং বৈবাহিক-দিগের অহমিকা-প্রসূত পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবটুকু বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তু-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কেবল এইটুকু বলিয়াই আমরা তৃপ্ত হইতে পারিব না, বাঙালী হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীতে একটি চিরশ্রুত সুরের ঝঙ্কারও আমরা যেন এই প্রত্যাখ্যান-ঘটনার মধ্য দিয়া শুনিতে পাইতেছি। দরিদ্র-ভর্তৃকা দক্ষ-দুহিতা সতীও উদাসীন স্বামি-দেবতা অথবা দেবতা-স্বামীর, পিতৃ-কর্তৃক অপমানে, এমনই বিচলিত হইয়াছিলেন এবং দারুণ দুর্জয় অভিমান জানাইয়াছিলেন। রাজার ঝিয়ারী বৃকভানু-নন্দিনীও প্রিয়তমের বাঁশী শুনিয়া ছুটিয়াছিলেন যে পথে, সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, সে পথ দুঃখকণ্টকাকীর্ণ, তিমিরাবৃত, দুরত্যয়, কর্দম-পিচ্ছিল এবং সর্পসংকুল। সে পথে চলিতে হইলে 'ফণিমুখ-বন্ধন' মন্ত্র শিখিবার জন্য সুন্দরী 'প্রিয়মণ্ডনা'কে 'করকঙ্কণ-পণ' করিতে হয়, 'সর্বপ্রিয়বস্তু অকাতরে ইন্ধন' করিয়া দিতে হয়। রাজ-রাজেশ্বর বঙ্কিম-চন্দ্রের মানস-দুহিতা ধনীর দুলালী ইন্দিরাও বলিয়াছেন, 'সর্বালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে,—লউক্; জীর্ণমলিন দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়াছে,—পরাক্; বাঘ-ভালুকের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে,—যাক্; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে,—তা যাক্—প্রাণ আর চাহি না। এখন গেলেই ভাল, কিন্তু .....আর ত তাঁকে দেখা হইল না!" "আমার পায়ে কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কৈ, সাপে ত কামড়াইল না।"

স্বামি-বিরহিণী স্বামি-সন্দর্শনে চলিয়াছেন। **ইন্দিরা** চলিয়াছেন **উপেন্দ্র**-সদনে! একালের নবীন বাঙালী পাঠক এবং প্রবীণ সমালোচক, উভয়ের নিকটেই 'ইন্দিরা' ও উপেন্দ্র' শব্দের অর্থসংকেত হয়ত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ইন্দিরার ছোট বোন্ কামিনীর প্রশ্নোত্তরে ইন্দিরা পতিগৃহের বর্ণনা দিতে গিয়া বলিল, "সে নন্দন-বন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। ......সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র উঠে।" বাংলার সাম্প্রতিক পাঠক-সমাজ যদি স্বেচ্ছায় কান ও প্রাণ রোধ করিয়া থাকার পক্ষপাতী না হইয়া উঠেন তবে তিনি ইন্দিরার এই আনন্দ-স্বপ্নের অন্তরালে ভাব-সম্মিলনের সুচিরশ্রুত পদের ঝঙ্কার শুনিতে পাইবেন।

"সোই কোকিল অব লাখ ডাক ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

ইন্দিরার পতি-অভিসারের বাধা শুধু বাহিরের বাধা নহে, তাহার সমস্ত দুঃখই শুধু 'পন্থক দুখ' নহে। অন্তরেও তাহার গভীর দুর্যোগ, 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'র কঠোর সমালোচনাপূর্ণ অকৃত্রিম আত্মবিচারণা। "শ্বশুর বাড়ী চলিলাম"—শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কালাদীঘির পাড়ে আসিয়া ইন্দিরা বলিতেছেন, "দীঘির ঘাটে বটতলায় আমার

পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায়, কেবল ঠাকুর-দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পোঁছি—কোথায় বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কিন্তু ছিঃ! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে। আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি ভরা যৌবনে স্বামি-সন্দর্শনে, তারা যাইতেছে খালিপেটে একমুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল! ধিক্ ভরা যৌবনে!" ইহা তো শুধু কথার কথা নহে, মহাজনী কথা বা লোকঠকানো কথা নহে, 'চপল সুখলব'-প্রত্যাশার জন্য কঠোর আত্মধিক্কার।

দস্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভের পর নানা 'দৈববিপাক' অতিক্রম করিয়া সপরিবার কৃষ্ণদাস বসুর সঙ্গ ধরিয়া ইন্দিরা গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয় বাহিয়া চলিয়াছেন। সুন্দরীরা "জল ফেলে, কেহ কলসী পুরে, কেহ আবার ঢালে, আবার পুরে"—দেখিয়া ইন্দিরার একটি প্রাচীন গীত মনে পড়িল।

"একা কাঁখে কুম্ভ করি কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
কলসীতে দিতে ঢেউ আর না দেখিলাম কেউ
পুন কানু জলেতে লুকায়॥"

'পিয়াসা' দূর করিবার জন্য যাঁহারা পশ্চিম-সিন্ধুর অতিরিক্ত লবণাম্বু পান করিয়া স্বাদহারা ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যান নাই, এমন বাঙ্গালী পাঠকের এখানে মনে পড়িয়া যাইবে বসু রামানন্দের বহু-কীর্তিত পূর্বরাগের একটি পদ,

"বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হৈলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥"

'ইন্দিরা'র প্রথম-প্রকাশিত রূপে ইন্দিরার কলিকাতা-যাত্রার বর্ণনা মাত্র দুইটি বাক্যের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে,—"পরদিন নৌকায় উঠিলাম। কলিকাতায় পঁহুছিলাম।" 'ইন্দিরা'র বর্ধিতরূপে, পঞ্চম সংস্করণে, এখানে "বাজিয়ে যাব মল"—শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং সমগ্র পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংযোজনার সার্থকতা, ইন্দিরার 'পথ-আগমন কথা'র এই পল্লবিত বিস্তারের তাৎপর্য বিজ্ঞ সমালোচকের সমালোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই কেন, বুঝিতে পারা যায় না।

সাত আট বছরের দুইটি মেয়ে, দেখিতে বেশ। নাম অমলা আর নির্মলা। তাহারা দুইজনে পালা করিয়া মল বাজাইয়া জল আনিবার ছড়া গাহিতেছিল।

"ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল॥
যত ছেলে খেলা ফেলে
ফিরবে দলে দল।
কত বুড়ী জুজু বুড়ী
ধরবে কত ছল?
মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল,
সই বাজিয়ে যাব মল॥"

'বালিকা-সিঞ্চিত-রসে' ইন্দিরার 'এ জীবন কিছু শীতল হইল।' ইন্দিরা হাঁ করিয়া কেন 'ছাই-মলবাজানোর গান শুনিতেছে, বসুজ মহাশয়ের সহধর্মিণী ভর্ৎসনার সুরে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দিরা উত্তর দিল, "যোল বৎসরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে; সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়।" উত্তর দিয়া ইন্দিরা ভাবিতে লাগিল, "এ প্রভেদ কেন হয়? এক জিনিস দুই রকম লাগে কেন? যে দান দরিদ্রকে দিলে পুণ্য হয়, তাহা বড় মানুষকে দিলে খোসামোদ বলিযা গণ্য হয় কেন? যে সত্য ধর্মের প্রধান, অবস্থাবিশেষে তাহা আত্মশ্লাঘা বা পরনিন্দাপাপ হয় কেন? যে ক্ষমা পরমধর্ম, দুষ্কৃতকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে, তাহা মহাপাপ কেন?......ঠিক করিলাম, অবস্থাভেদে এরূপ হয়।" জীবন-কথা বিবৃত করিতে গিয়া ইন্দিরা এখানে আরও বলিয়া রাখিলেন, "আমি ইহার পর একদিন যে নির্লজ্জ কাজের কথা বলিব, তাহা এই কথা মনে করিয়া করিয়াছিলাম। তাই এ গানটা এখানে লিখিলাম।"

ইন্দিরার এই উক্তির সহিত 'একটা চোরা চাহনি', 'হারাণীর হাসিবন্ধ', 'আমাকে একজামিন দিতে হইল', 'আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা', 'কুলের বাহির', 'খুন করিয়া ফাঁসি

গেলাম', 'ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক', 'ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত'—একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত, এই আটটি পরিচ্ছেদ পড়িবার পরেও কি আমরা বলিতে পারিব "এই সামান্য আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্যা আলোচিত হয় নাই," অথবা "ইহাদের কাহারও মধ্যে একটা চরিত্রগত গভীরতা নাই?" সুধী সমালোচকের এতাদৃশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে আমাদের অসামর্থ্য কি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে?

'The end never justifies the means', নৈতিক জগতের এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়া গিয়াছে। দেশে-দেশে যুগে-যুগে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে উদ্দেশ্য ও উপায়ের সামঞ্জস্যবিধান-সম্পর্কিত এই জটিল প্রশ্নটির সমাধানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ স্বজাতিকে স্বামী বিবেকানন্দ জলদমন্দ্রে বলিয়া গিয়াছেন, 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎকার্য সম্পন্ন হয় না।' বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের অভিনিবেশসম্পন্ন বাঙ্গালী পাঠককে এই জটিল প্রশ্নটি গভীরভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার জীবনের নানাক্ষেত্রে ইহার পরিচয় পাই। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্রও এই সমস্যাটিকে এড়াইয়া চলেন নাই, নিজের মনন ও জীবন দিয়া তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, নিজের মতো করিয়া তাহা সকলকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সে ধর্ম-ব্যাখ্যাতা বঙ্কিম 'প্রচার' পত্রে 'হিন্দুধর্ম'-বিষয়ক প্রবন্ধে দুইটি কল্পিত হিন্দুর অবতারণা করিয়া তাহাদের আদর্শ ও আচরণের তুলনা করিয়াছিলেন। একজন আচারপরায়ণ এবং ব্যবহারিকভাবে নীতিনিষ্ঠ হইয়াও বঙ্কিমের মতে যথার্থরূপে ধর্মভ্রষ্ট। অপরজন ব্যবহারিক নীতি-বিচ্যুত ও আচারভ্রষ্ট হইয়াও তাঁহার মতে যথার্থ ধর্মশীল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সত্যানুরাগী, মিথ্যাকে তিনি পরিহার করিয়া চলেন। কিন্তু লোকহিতের জন্য প্রয়োজনস্থলে ব্যবহারিক নীতিবোধ অতিক্রম করিয়া 'সর্ব কৃষ্ণার্পণমস্তু' অথবা "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ" স্মরণ করিয়া আপাত-প্রতীয়মান মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিপাদ্যটি বুঝাইবার জন্য আমরা বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্‌তর হুগোর অমর সৃষ্টি 'লা মিজারেবল' গ্রন্থের একটি ঘটনার অবতারণা করিব। পুরাতন পাপী জিন ভ্যালজিন অর্ণবপোতের ভয়াবহ কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া ক্ষুধাতাড়িত এবং সুসভ্য দণ্ডবিধি কর্তৃক পশ্চাদধাবিত হইয়া তাহার কিম্ভূতকিমাকার দেহটি লুকাইবার করুণ ও ব্যর্থ প্রয়াসের পর দুর্যোগপূর্ণ তামসী নিশায় ধর্মযাজকের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। মানবপ্রেমিক শরণাগত-বৎসল ধর্মযাজক তাহাকে নির্বিচারে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন এবং অতিথিসৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা সুনির্বাহ করিয়া শ্রান্ত অতিথির সুনিদ্রার প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেরই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাহার রজনীযাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিশিশেষে নিদ্রাভঙ্গে ধর্মযাজকের অগাধ বিশ্বাস এবং অতিথি-বাৎসল্যের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিয়া অতিথি মহাশয় তাঁহার বহুমূল্য দীপাধারটি আত্মসাৎ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রত্যূষে ঘটনাস্থলে আসিয়া বিশপের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না ভগিনী

সদাব্রতচারী ভ্রাতাকে শ্লেষবিদ্রূপে জর্জরিত করিলেন। এদিকে রাজপথের প্রহরীরা, সন্দেহজনক ব্যক্তির হস্তে মূল্যবান্ দীপাধার দেখিয়া এবং 'ইহা বিশপ দান করিয়াছেন', এইরূপ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া অপহারককে বিশপের গৃহাভিমুখে ধরিয়া আনিতেছিল। দূর হইতে প্রহরি-কবলিত অপরাধীর আর্ত বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া ধর্মযাজকের করুণা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি মুহূর্তকালের মধ্যেই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব কাটাইয়া প্রহরী-দিগকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়া অপর একটি মূল্যবান্ দীপাধার লইয়া, "বন্ধু, এটিও তোমাকে দিতে চাই," এই বলিয়া তাহাকে অর্পণ করিতে উদ্যোগী হইলেন! প্রহরিবর্গ মহামান্য বিশপকে আর কোনও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ না করিয়া বন্দীকে মুক্তিদান করিয়া সসম্ভ্রমে স্থানত্যাগ করিল। বন্দীই শুধু মুক্তি পাইল না, তাহার ভিতরকার Offending Adam বা পাপপুরুষও বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তর্হিত হইল। ব্যবহারিক নীতির দিক্ দিয়া ধর্মযাজক হয়ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি বলিতেন, "ধর, মার, বাঁধ, কাট ঐ চোরকে! ও শুধু চোর নয়, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন" তাহা হইলে প্রচলিত অর্থে হয়ত বিশপের সত্যরক্ষা হইত। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত মিথ্যা অথবা গভীরতর সত্য একটি পতিত মানবাত্মার মহামুক্তির কারণ হইয়া উঠিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত ধর্মব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন, "আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে তাহা শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।" উত্তরে চিত্তের প্রসাদ বিকিরণ করিয়া ধর্মগুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, "রবীন্দ্রবাবু 'সত্য' এবং 'মিথ্যা'—এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থে আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য truth, মিথ্যা falsehood. আমি 'সত্য' 'মিথ্যা' শব্দ ব্যবহারকালে ইংরাজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীনচিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে।......দেশী অর্থে সত্য truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু।"

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, ধর্মাধর্ম বিবেক হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে তাহার কোনও অর্থ থাকে না। পাপপুণ্যকে পদস্খলন-পিচ্ছিল, উত্থান-পতন-বন্ধুর, দুঃখ-দুর্যোগসঙ্কুল জীবনপথে হাঁটিয়া চলিযাই বুঝিতে হয়। 'ইন্দিরা'র অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং বাহিরের ঘটনা-সংঘাতের অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে এই গভীর সত্যের কাব্যনীতিসম্মত ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। 'ইন্দিরা'র বাহিরের ঘটনা তাদৃশ জটিল ও বিশাল না হইলেও 'ইন্দিরা'র গভীরতা অপরিসীম।'

অনেক অসূর্যম্পশ্যা সতী-লক্ষ্মী পথে হাঁটিয়াছেন। তাঁহাদের

"একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টক জর জর ভেল।"

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" শ্রীরাধা 'মন্দির বাহির' হইয়া 'শঙ্কিল পঙ্কিল বাট' অতিক্রম করিয়াছেন। পিতৃগৃহে অনিমন্ত্রিতা সতীও কৈলাসগৃহ ত্যাগ করিয়া দুর্গম গিরিকান্তার লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, পতিদেবতার দেবত্ব-প্রতিষ্ঠার আশায় বুক বাঁধিয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি মানস-দুহিতা সূর্যমুখীও ঘর ছাড়িয়া পথ হাঁটিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল, জলধর ঝরঝর 'বরিখন' করিয়াছিল। তিনি ভালো করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, সে প্রশ্ন অতি গভীর, অতি জটিল। এই প্রশ্নের সমাধান প্রত্যেককেই জীবন দিয়া করিতে হয়। চন্ডীদাসের শ্রীরাধিকা এই জটিল প্রশ্নের সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ,

"সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি!
কহে চন্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোমার চরণখানি।"

ধর্মাধর্ম ও পাপপুণ্যের 'তিমির-দুরন্ত' পথে শ্রীরাধার জীবন-সাধনা এইরূপে আলোক-সম্পাত করিয়াছিল,

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা আয়লো সজনি নিসাড়া হইয়া
আঁধার পেরিলে আলা॥"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'ও জীবন-সর্বস্বকে কাছে পাইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার পথে যে দুরত্যয় বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা বাহিরের কোনও বাধা নহে, তাহা এই ধর্মাধর্ম-বিবেক ও পাপপুণ্যের সংস্কারজনিত বাধা। নিজের স্বামীকে আপাত-প্রতীয়মান কুলটাবৃত্তির মধ্য দিয়া পাইবার ফাঁদ পাতিয়া ইন্দিরার অন্তর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, স্বামীকেও ত মানসিক ব্যভিচারে অপরাধী হইতে হইবে, 'পাপকর্মা' না হইলেও তাঁহাকে 'পাপাত্মতা'-সম্ভব গ্লানি স্পর্শ করিবে। এইজন্য ইন্দিরার অন্তরে ঝড়তুফান ছুটিয়াছিল, অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিয়াছিল। সমদুঃখভাগিনী সুভাষিণী তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন, যেমন শ্রীমধুসূদনের সীতার চরণ-মূলে 'সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া'। ইন্দিরা সুভাষিণীর নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বলিলেন, "আমি চিনিয়াছি যে, তিনি আমার স্বামী, এইজন্য আমি

যাহা করিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এজন্য আমার প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে বড় নিন্দা করিতেছি। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী, —তাঁহাকে মন্দ ভাবা আমার অকর্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিব না, মনে মনে সংকল্প করিলাম। যদি কখনও দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।"

ইহার পরে 'খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম' পরিচ্ছেদে পুরুষ পাঠককে সম্বোধন করিয়া ইন্দিরা বলিতেছেন, "আমাদিগের পতিভক্তি আমাদের গুণ; আমাদিগকে যে হাসি চাহনির কদর্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হয়, সে তোমাদের দোষ। তোমরা বলিবে, এ অত্যন্ত অহঙ্কারের কথা। তা বটে—আমরাও মাটির কলসী, ফুলের ঘায়ে ফাটিয়া যাই। আমার এ অহঙ্কারের ফল হাতে হাতে পাইতেছিলাম। যে ঠাকুরের অঙ্গ নাই, অথচ ধনুর্বাণ আছে,—মা-বাপ নাই, অথচ স্ত্রী আছে—ফুলের বাণ, অথচ তাহাতে পর্বতও বিদীর্ণ হয়; সেই দেবতা স্ত্রীজাতির গর্বখর্বকারী। আমি আপনার হাসি চাহনির ফাঁদে পরকে ধরিতে গিয়া পরকেও ধরিলাম, আপনিও ধরা পড়িলাম। আগুন ছড়াইতে গিয়া পরকেও পোড়াইলাম, আপনিও পুড়িলাম। হোলির দিনে, আবীর খেলার মত, পরকে রাঙ্গা করিতে গিয়া, আপনি অনুরাগে রাঙ্গা হইয়া গেলাম। আমি খুন করিতে গিয়া, আপনি ফাঁসি গেলাম। বলিয়াছি, তাঁহার রূপ মনোহর রূপ—তাতে আবার জানিয়াছি, যাঁর এ রূপরাশি তিনি আমারই সামগ্রী,—

"তাঁহারই সোহাগে আমি সোহাগিনী,
রূপসী তাঁহারই রূপে।"

ইন্দিরার অন্তরের ঝড়তুফান কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে স্বামি-স্নেহের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইন্দিরা বলিতেছে, "আমি যদি তাঁহার হাসিতে, তাঁহার চাহনিতে ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষার লক্ষণ দেখিতাম তবে আমিই জয়ী হইতাম। তাহা নহে। সে হাসি, সে চাহনি, সে অধরৌষ্ঠ-বিস্ফুরণে, কেবল স্নেহ—অপরিমিত ভালবাসা। কাজেই আমিই হারিলাম। হারিয়া স্বীকার করিলাম যে, ইহাই পৃথিবীর ষোল আনা সুখ! যে দেবতা ইহার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে, তাহার নিজের দেহ যে ছাই হইয়া গিয়াছে, খুন হইয়াছে।"

ইন্দিরার অভিসার নিঃসঙ্গ অভিসার নহে। চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীর অভিসারই ইহার একমাত্র তুলনাস্থল, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের অভিসার এবং আলঙ্কারিকব্যাখ্যাত অভিসার নহে। সতী-লক্ষ্মী সুভাষিণী ও তাঁহার পরদুঃখকাতর স্বামী র-বাবু ছিলেন ভিতরের ও বাহিরের দুর্যোগে ইন্দিরার পরম সহায়,—সূর্যমুখীর পাশে যেমন ছিলেন কমলমণি-শ্রীশচন্দ্র, 'তুল্যগুণং বধূবরম্'—শ্রীরাধার পাশে ছিলেন যেমন তাঁহার সখীগণ,

যাঁহাদের 'অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া' শ্রীমতী বিগতকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠলোকেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত 'বৃন্দাবনে' "প্রবেশিল জয় জয় দিয়া।"

ইন্দিরার এই সখীব্যূহ শুধু সুভাষিণী ও র-বাবুকে লইয়া রচিত নহে। ইহাতে ধর্মভীরু হারাণী-ঝিও আছে, যাহার হাসির লহর একবার ছুটিলে আর থাকে না, কিন্তু অধর্মের পথে চলিবার প্রলোভন সম্মুখে আসিলে যাহার 'হাসিবন্ধ' হইয়া যায়, প্রভু-পত্নীর হাতের ঝাঁটার সঙ্গে মেঘের কোলে বিজলীর মতো মুখের কোণের মুচ্কি হাসিটুকু পাইলেই যে ধর্মের অভ্রান্ত নির্দেশ মনে করিয়া পাপপুণ্যের সংস্কারকে অতিক্রম করিতে পারে, কৃত-উপকারের জন্য প্রয়োজনাতীত অর্থের উপহার যে হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিয়া শুধু দাতাকে সুখী করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া পুণ্যকার্যের জন্য তুলিয়া রাখিতে পারে।

শ্রীরাধার পাশে যেমন ছিলেন 'বড়াঈ', ইন্দিরার পাশেও প্রায় তেমনই জুটিয়াছিল আশ্রয়দাতার পরিবারস্থ পাচিকা বামুন ঠাকুরাণী। এইরূপ সাহচর্যে ইন্দিরার দুর্যোগময় জীবনাকাশে রৌদ্রবৃষ্টির একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, এই অদ্ভুত সঙ্গিনীটিকে লাভ করিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ইন্দিরা একটু হাসিতে পারিয়াছিল। এই সঙ্গিনীটি হারিয়া গিয়াও তর্ক করে, গালাগালি দিয়া আবার পরক্ষণে সুবিধা বুঝিয়া প্রশংসাও করে। ইন্দিরা আরও পাইয়াছিলেন সুভাষিণীর পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে, সেই 'কালির বোতল', যাঁহার 'গলায় গলায় ভরা কালি', বৃদ্ধ অকলঙ্ক-চরিত্র স্বামীর প্রতি যাঁহার অকারণ সন্দেহ, সমস্ত 'সমত্ত' স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্পর্কে যাঁহার অকৃত্রিম অবিশ্বাস, অথচ বাৎসল্যের কাছে যিনি সম্পূর্ণরূপে হার মানিয়া গিয়াছেন।

ইন্দিরার আশ্রয়দাতৃ-পরিবারের বাহিরেও ইন্দিরা সহচরী পাইয়াছিলেন। **ইন্দিরা-উপেন্দ্রের** মিলনকুঞ্জে মহেশপুরে পিত্রালয়ে যাঁহারা আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাঁহারা বৃন্দাবনের না হইলেও আমাদেরই অন্তঃপুরের বিগত শতাব্দীর পিতৃষ্বসা-পিতামহীর দল, যাঁহারা একসঙ্গে তিনপুরুষ বাসর জাগিতে আসিতেন, আসিয়া গান গাহিয়া সন্দেশ খাইবার চাঁদা তুলিয়া, দরকার হইলে চাঁদা দিয়াও যাইতেন, যাঁহাদের ছবি আঁকিতে গিয়া শিল্পী বঙ্কিম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু এখনকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি"—যাঁহাদের মধ্যে 'একরত্তি মেয়ে' কামিনী থেকে আরম্ভ করিয়া 'কালো জলের কালিন্দী' প্রৌঢ়া যমুনা-ঠাকুরাণী, এবং পক্বকেশা পিয়ারী ঠাকুরাণী, তাঁহাদের কলঙ্ককাহিনী সমেত বিরাজমানা আছেন, বহুরূপিণী অনঙ্গমোহিনী এবং মুক্তহস্তা ব্রজসুন্দরীও বিদ্যমানা রহিয়াছেন।

হাসিকান্নার যথোপযুক্ত বিন্যাসে, লঘু-গুরুর সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাতরক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য দক্ষতা থাকায় 'ইন্দিরা' শুধু 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে কথিত "তীক্ষ্ণ পরিহাস-নিপুণতায় উপভোগ্য, হাস্যালোকপাতে ভাস্বর' হইয়াই উঠে নাই, কেন্দ্রীয় চরিত্রের অতলস্পর্শ মহিমায় এবং ব্যথা-করুণ অচপল গাম্ভীর্যে শিল্পীর সুগভীর আত্ম-পরিজ্ঞান ও রসচেতনার উপযুক্ত বাহন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আর একবার 'ইন্দিরা' নামটির অর্থসঙ্কেতের প্রতি আমাদের বঙ্কিমতীর্থ-সহযাত্রী পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতে চাই। পুরাণ-বর্ণিত ইন্দিরার মতোই বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূতা। অথবা মেঘনাদ-বধের কবি শ্রীমধুসূদনের ভাষায় "রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা-সুন্দরী।"

এখন বোধ হয় আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র 'সামান্য আয়তনে'ও 'গভীর সমস্যা আলোচিত' হইয়াছে এবং ইহাতে 'চরিত্রগত গভীরতা'ও যথেষ্ট রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে 'প্রবাদ' কবিতায় কথিত 'তপন' যেমন বলিয়াছে,

> "আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
> তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"

তেমন বঙ্কিমচন্দ্র এমন একজন জীবন-রস-রসিক শিল্পী যাঁহার জীবনবোধ বা আত্ম-পরিজ্ঞান তাঁহার অপরাপর শিল্পকৃতির মতো স্বল্পাবয়ব 'ইন্দিরা'য় অনবদ্যভাবে সুপরিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গভীর জীবনবোধের উপর বৈষ্ণব প্রবণতার যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা আকস্মিক ঘটনামাত্র হইতেও পারে, ইহাতে বঙ্কিমের সৃষ্টির অতল-স্পর্শ মহিমার লাঘব হইবে না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও প্রখ্যাতনামা ব্যাখ্যাতাই বঙ্কিমের জাতীয় প্রবণতার এই দিক্‌টা লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া বর্তমান অপ্রখ্যাত বঙ্কিম-তীর্থযাত্রী এই অনাবিষ্কৃত অন্তঃসলিল ধারাপথটির সন্ধান দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
দীপান্বিতা অমাবস্যা, ১৩৫৬

শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

সংযোজনী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

'ইন্দিরা'র প্রথম প্রকাশ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে'। ১২৮০ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) পুস্তকাকারে ইন্দিরার প্রথম প্রকাশ, তখন ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ৮, মূল্য ।০ চারি আনা। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'ইন্দিরা'র সংক্ষিপ্ত তথ্যমূলক ভূমিকায় সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত 'উপকথা' গ্রন্থে 'ইন্দিরা' যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহাই 'ইন্দিরা'র দ্বিতীয় সংস্করণ, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'উপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'ইন্দিরা'র তৃতীয় সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট 'ইন্দিরা' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দিরা'র বর্ধিত পঞ্চম বা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎ-কালের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৭ (প্রথম-প্রকাশিত রূপের প্রায় চারি গুণ), অধ্যায়-সংখ্যা ২২, মূল্য ১৷৷০।

"১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে জে, ডি, অ্যান্ডারসন অনূদিত Indira and other Stories প্রকাশিত হয়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহীশূর হইতে কানাড়ী ভাষায় 'ইন্দিরা'র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ করেন—বি, বেঙ্কটাচার্য।" 'ইন্দিরা'র ভূমিকা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংস্করণ।

ইন্দিরার প্রথম-প্রকাশিত রূপ ও পঞ্চম সংস্করণের ভাষারীতি-পরিবর্তনের একটি নিদর্শন ঃ—

"যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। বংশপত্রাবচ্ছেদে "বালারুণকিরণ ভূমে পতিত হইয়াছে।" 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ইন্দিরা' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

"যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণিমুক্তায় সাজাইয়াছে।" পঞ্চম সংস্করণের 'ইন্দিরা' (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

সুভাষিণী, তাঁহার স্বামী র-বাবু, তাঁহাদের ছোট ছেলে-মেয়ে, পাচিকা, বামুন ঠাকুরাণী পঞ্চম সংস্করণের নূতন সৃষ্টি। বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত 'ইন্দিরা'র ছায়া-মূর্তি হারাণী-ঝিও পঞ্চম সংস্করণে কায়াপরিগ্রহ করিয়াছে। পঞ্চম সংস্করণের অপরাপর অনেক পরিচ্ছেদের মতো 'সেকালে যেমন ছিল'-শীর্ষক একবিংশতিতম পরিচ্ছেদটি নূতন সংযোজনা এবং এই পরিচ্ছেদ-বর্ণিত রমণী-ব্যূহ, অর্থাৎ যমুনা ঠাকুরাণী, পিয়ারী ঠান্‌দি, শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী, ব্রজসুন্দরী দাসীও অভিনব সৃষ্টি।

শ্রীমধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'-র দুইটি অংশঃ—

'ইন্দিরা'র পঞ্চম সংস্করণ, 'আশার প্রদীপ' (দশম পরিচ্ছেদ)ঃ—

"এই পর্যন্ত বলিয়া দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। সুভাষিণী বলিল, "তোমার যদি বলিতে কষ্ট হয়, তবে নাই বলিলে। আমি না জানিয়াই শুনিতে চাহিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সমস্তই বলিব। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে বলিতে কোন কষ্ট নাই।"

মেঘনাদ-বধ। চতুর্থ সর্গ (সীতা ও সরমা)

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারেঃ—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি সখী! পূর্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।

"হায়, সখি, আর কি লো, পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি আশার সরসে
রাজীব, নয়ন-মণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?'
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে।
কতক্ষণে চক্ষু-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিল সতী সীতার চরণে;—
"স্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।"

৪।৭।৫৬ **শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী**

[জনার্দন চক্রবর্তী—অধ্যাপক, লেখক বিশেষ করিয়া বাগ্মী হিসাবে জনার্দনবাবু অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার মত ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক এবং জনপ্রিয় বক্তা খুব কমই আছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা গভীরভাবে চিন্তা করেন জনার্দনবাবু তাঁহাদেরই একজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগ নানা দিক দিয়া তাঁহার কাছে উপকৃত। ইঁহার মতামত সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন।]

কমলাকান্তের দপ্তর ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ)

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র একযোগে কলম ধরিয়া কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করিয়াছেন। কিম্বা বলা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্রের অখণ্ড সত্তাই এখানে দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়াছে বিচিত্র এই রচনাটি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে; ইহা আকৃতিতে খণ্ডিত, প্রকৃতিতে অখণ্ড। ইহার কারণ অনেকে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন পত্রের মাসিক দাবী মেটানো একটি প্রধান কারণ। কিন্তু আরও কারণ, আমার বিচারে গূঢ়তর কারণ, আছে বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৩-৭৫ সালের মধ্যে বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর অংশ প্রকাশিত হয়।

১৮৬৫ সালে তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়—এবং তারপরে আট বৎসরের মধ্যে আটখানি উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়, গড়ে বৎসরে একখানি, ইহার উপরে লোকরহস্য ও বিজ্ঞানরহস্য আছে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের অতিপ্রসূ ক্লান্ত লেখনী বিরাম চাহিতেছিল। কিন্তু সাহিত্যিকের, বিশেষ মাসিক পত্রিকার দায়িত্ব যিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাঁহার, ছুটি কোথায়? বঙ্কিম চন্দ্রের ক্লান্তির চিহ্ন যুগলাঙ্গুরীয় এবং রাধারাণী কাহিনীদ্বয়ে। এ দুটি আকারে ছোট, ছোট গল্প নয়, কিন্তু হইলে-হইতে-পারিত ছোট গল্প। প্রথম সংস্করণের ইন্দিরাও ছোট। পূর্ণায়ত উপন্যাস রচনায় অভ্যস্ত ও সিদ্ধকাম লেখকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই ক্ষুদ্রকায় কাহিনীসৃষ্টি এক প্রকার ক্লান্তির চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে। ক্ষুদ্র কাহিনী রচনা যে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ ক্ষুদ্রকায় ইন্দিরা ও রাজসিংহকে পরবর্তীকালে পূর্ণায়ত দিব্যরূপ দানে।

তার পরে আছে লোকরহস্য। ইহার মধ্যে রহস্য বা humour অংশটিকে লক্ষ্য করিতে বলি। লোকরহস্যের বৈশিষ্ট্য এই যে একটি সন্দর্ভের সঙ্গে অপরটির কার্যকারণগত যোগ না থাকায় অন্যনিরপেক্ষ ভাবে এক এক মাসে প্রকাশ করা চলে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্লটে কাহিনীতে দৃঢ়পিনদ্ধ হওয়ায় তাহার কাঠামোর মধ্যে এমন একটা সুসংহত ভাব আছে যাহা বাংলা সাহিত্যে একান্ত বিরল। শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় বুদ্ধির পরিশ্রমজাত অবসাদও স্বাভাবিক।

এবারে উপরিউক্ত বক্তব্য হইতে কমলাকান্ত রচনার মানসিক আবহাওয়া পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

অতিপ্রসূ লেখনীর ছুটির তাগিদ, কিন্তু মাসিকের দায়িত্ব আছে বলিয়া সে ছুটি দুর্লভ। কাজেই এমন এক শ্রেণীর রচনায় হাত দিতে হইল যাহাতে গল্প আছে, অথচ পূর্ণায়ত উপন্যাসের প্লটে কাহিনীতে দৃঢ়সংবদ্ধ কাঠামো রচনার গুরুতর মানসিক শ্রম নাই; আবার লোকরহস্যের রহস্যটুকু থাকা চাই, কারণ লোকের ভালো লাগিয়াছে, অথচ প্রতিটি সন্দর্ভ

স্বতন্ত্র হইলে চলিবে না, লোকের সেটি রুচিকর নয়—একটা কিছু গ্রন্থি আবশ্যক; সজীব, অভিনব নরনারী রচনায় সিদ্ধহস্ত লেখকের পক্ষে সে রকম একটি চরিত্র সৃষ্টি আদৌ কঠিন নয়, বরঞ্চ কাম্য। আমার বিশ্বাস এইসব উপাদান সংগ্রহ করিয়া জোড়া দিলে কমলাকান্তের দপ্তর রচনার কাছাকাছি পেঁছানো যায়। কাছাকাছি কিন্তু ঠিক দপ্তরখানায় নয়, কারণ এই সব উপাদানের সমাবেশ হইতে বুঝিবার উপায় নাই, ঠিক্ কোন্ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি হইবে—অথচ সবই নির্ভর করিতেছে চরিত্রটির উপরে। কারণ কমলাকান্তের দপ্তর মানে কমলাকান্তের চরিত্র; এমন নিঃসঙ্গ একব্যক্তি উপন্যাস সাহিত্যরাজ্যে বিরল; শুধু তাই নয় উপন্যাসখানিই যেন নির্জন; সেই নির্জন দ্বীপে রবিন্‌সন ক্রুসোও বুঝি এমন নিঃসঙ্গ নয়; আফিঙের কুয়াশায় ঘেরা, অদ্ভুত কল্পনার মহাসমুদ্রে অধিষ্ঠিত এই দ্বীপটি কমলাকান্তের দপ্তর; কমলাকান্ত তাঁহার রবিন্‌সন ক্রুসো; ক্রুসোর ছাগল ও টিয়া পাখী, কমলাকান্তের প্রসন্ন গোয়ালিনী ও মঙ্গলা গাভী; ক্রুসো মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, কমলাকান্ত মানুষকে দেখিয়া, মানুষের ব্যবহার দেখিয়া ভীত হইয়াছে; ক্রুসোর এক জায়গায় জিৎ, সেই পদ চিহ্নের কর্তা শেষ পর্যন্ত তাহার বন্ধু হইয়াছে, আর কমলাকান্তের পত্রাংশ পড়িলে সন্দেহ হয় যে, মানুষের প্রতি অসাধারণ প্রীতি থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্ত মানব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আবার কমলাকান্তের জিৎ আর এক জায়গায়; রবিনসন ক্রুসোর হাস্যরসজ্ঞান ছিল না, কমলাকান্তে তাহা প্রভূত পরিমাণে বর্তমান; যাহার হাস্যরসজ্ঞান আছে সে একক থাকিয়াও নিঃসঙ্গ নয়, সে আপনাকে আপনি ভোগ করিতে পারে; কিম্বা humorist এক প্রকার যোগী; তাহারা সজনে নির্জন, নির্জনে সঙ্গীমান; ডন কুইকসট্, ফলস্টাফ, পিকবিক, কমলাকান্ত সকলেই সগোত্র; আর তাহাদের একটি সামান্য লক্ষণ এই যে তাহারা সকলেই দার্শনিক, কেহ জ্ঞাতসারে, কেহ অজ্ঞাতসারে, প্রভেদ মাত্র এই।

২

আমাদের প্রয়োজনের জন্য সমগ্র 'কমলাকান্ত'কে তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইব।

দপ্তর অংশে ১৪টি প্রবন্ধ, তন্মধ্যে 'চন্দ্রালোকে' ও 'স্ত্রীলোকের রূপ'-ও আছে। এই অংশটি আগেই বলিয়াছি ১৮৭৩-৭৫ সালে রচিত।

পত্রাংশ ২য় সংস্করণে সংযুক্ত, সময় ১৮৮৫ সাল।

জোবানবন্দির প্রকাশ ১৮৮২ সাল। বুড়া বয়সের কথা মূলতঃ কমলাকান্তের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সমরসের রচনা হওয়ায় পত্রাংশে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলী সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'কাকাতুয়া' নিবন্ধটি সন্দেহাত্মক হওয়ায় এই আলোচনার মধ্যে ধরা হইল না।

'কমলাকান্তের' দপ্তর, পত্র ও জোবানবন্দির যে কালনির্ণয় উল্লিখিত হইল তাহা স্মরণ রাখিলে, এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমমানসের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা যথাস্থানে, আপাতত অন্য প্রসঙ্গ।

৩

কমলাকান্তের দপ্তর এক-চরিত্র উপন্যাস, বোধকরি বাংলা সাহিত্যের একমাত্র এক-চরিত্র উপন্যাস। এই জন্যই বলিয়াছি কমলাকান্ত চরিত্রটিই কমলাকান্তের দপ্তর।

কমলাকান্ত কবি, পাগল ও নেশাখোর। এই তিনটিই তাহার চরিত্রের মৌলিক লক্ষণ। সে যে মানবপ্রেমিক বা স্বদেশপ্রেমিক বা দার্শনিক এগুলি অপেক্ষাকৃত গৌণ, কেননা, এ সমস্তই মূল লক্ষণজাত হইতে বাধা নাই।

পাগল ও নেশাখোরকে উপন্যাসের নায়করূপে গ্রহণ করিবার সুবিধা এই যে লেখক অনেকটা দায়িত্বহীন হইয়া অগ্রসর হইতে পারেন। কবি সম্বন্ধেও একথা কতক প্রযোজ্য, কিন্তু পাগল ও নেশাখোর স্বভাবতই দায়িত্বের লাগাম-ছেঁড়া ব্যক্তিত্ব। শুধু নেশাখোর হইলে দায়িত্বহীন হইতে পারে, কিন্তু পাঠকের প্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য তাহাকে পাগল করিতে হয়, কারণ পাগলের প্রতি (মৎলবী পাগল ছাড়া) মানুষের কেন যেন একটা ভালবাসার আকর্ষণ আছে; পাগলামি এবং নেশাকরত্বই যথেষ্ট নয়—এ দুয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তাহাকে কবি বলিতে পারিলে, তাহার মুখে গভীর ও মনোরম কথা বসাইবার সুযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে।

মাসিকে একটা উপন্যাস ফাঁদিলে প্রতিমাসে তাহা নিয়মিত বাহির হওয়া চাই। এ জাতীয় রচনায় সেরূপ বাধ্যতা নাই; পাগলের কাণ্ডই আলাদা, কিম্বা নেশাখোরের মৌতাত না ছুটিলে লিখিবে কি প্রকারে? বঙ্গদর্শনেও দপ্তর নিশ্চয়ই প্রতিমাসে নিয়মিত বাহির হয় নাই।

আরও একটা মস্ত সুবিধা এই যে ত্রিভুবনের যে কোন বিষয়কে এই জাতীয় রচনার সামগ্রী করা যাইতে পারে, শুধু তাই নয়, সেই সব সামগ্রীকে যতই অপ্রত্যাশিত রূপ দেওয়া যাক না কেন, লোকের বিস্মিত হইবার কারণ থাকে না। হইয়াছেও তাই—'বিড়াল' বা 'ঢেঁকি' বা 'বড়বাজার' যে বস্তু-নিষ্ঠ রচনা নয়, সামগ্রীর নাম দেখিয়া কে বুঝিবে? কিম্বা 'পতঙ্গ' প্রবন্ধে কীটতত্ত্ব কোথায়? 'মনুষ্যফলে' ফল আছে কি? 'দপ্তরে' কল্পনা অবাধ পক্ষে বিহার করিয়াছে, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে কল্পনার যে ঊর্ধ্বগতি, যে গূঢ়গতি, এখানে তাহার অভাব; স্বয়ং গ্রন্থকারের মতো তাঁহার কল্পনাও এখানে 'অন্ লীভ'; দু'জনেই এখানে স্কুলপলাতক বালকের মতো নির্জন ঘাসের বনে রঙীন পতঙ্গ ধরিতে ছুটাছুটি করিতেছে; পতঙ্গ ধরা উপলক্ষ্য, ছুটাছুটি করিয়া ছুটি উপভোগ করাই লক্ষ্য—এই তো বুঝি।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। এই মাত্র যাহা বলিয়াছি তাহার অর্থ এই যে 'দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহের অন্তর্গত নয়। কিন্তু কথিত আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি 'দপ্তর'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়াছিলেন। এ সব বিষয়ে লেখকের মত সব সময়ে গ্রাহ্য নয়, কেন না, তার মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি এত বেশি থাকে যে তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায়

নাই যে কমলাকান্ত-চরিত্র বঙ্কিমসৃষ্ট নরনারীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বজনবিদিত। শুধু তাই নয়, এমন সর্বজন পরিচিত, সর্বজনপ্রিয় এবং বহুজনের অনুকৃত অথচ অননুকরণীয় চরিত্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যে আর আছে কি না সন্দেহ। যে ব্যক্তি দপ্তর পড়ে নাই বা তাহার নামটাও শোনে নাই, সে-ও কমলাকান্তের নাম জানে, তাহার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে কিছু কিঞ্চিৎ খবর রাখে।✓

আরও একটি কথা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের, ব্যক্তিগত রুচি ও জীবনতত্ত্বের অংশ যদি স্বসৃষ্ট কোন নরনারীকে দিয়া থাকেন, তবে সে ঐ পাগলাটা, নেশাখোরটা, ঐ কবি কমলাকান্তটাকে দিয়াছেন। রাজা, বাদশা, বীরপুরুষ, আদর্শ পুরুষ কত রকম লোকই না বঙ্কিম সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু লেখকের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বহন করিবার দুরূহ সৌভাগ্য পড়িয়াছে ছন্নছাড়া চালচুলাহীন ঐ পাগলটার উপরে।

স্বাদেশিকতা, পরাধীনতার গ্লানিবোধ, সংসারে ন্যায়বিচারের অভাবে উষ্মা প্রভৃতি সেকালের অধিকাংশ বাঙালী লেখকের রচনাতেই পাওয়া যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও পাওয়া যায়, অপরের চেয়ে সুষ্ঠুতর, গভীরতর আকারে পাওয়া যায় এই মাত্র। এবিষয়ে তাঁহার বৈশিষ্ট্য সামান্যই। কিন্তু দুটি বিষয় আছে (আরও থাকিতে পারে, অপরে খুঁজিয়া বাহির করুক, সব কাজ আমি একা করিব কেন?) যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বিশিষ্ট। কালের গতিতে জগতে, জীবনে ও সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে, যৌবনের আনন্দ স্মৃতির হাতছানিতে পরিণত হয়, বয়সের তুষারে শ্যামল ক্ষেত্র চাপা পড়িয়া যায়—এ সব তাঁহাকে বড় পীড়া দিত। কমলাকান্তকেও এসব বড় পীড়া দিত, দ্রষ্টব্য—'একা, কে গায় ওই', আর 'বুড়া বয়সের কথা'।

আর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি। এগুণ এত অধিক পরিমাণে কেবল উচ্চ প্রতিভা বিশিষ্ট কবিতেই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রে তাহা প্রভূত পরিমাণে ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার প্রেমিকের দৃষ্টির পরিচয় তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই বর্তমান; মহৎ কবি ছাড়া আর কে 'কপালকুণ্ডলা' লিখিতে পারিত? কবিকে সারাজীবন গদ্য লিখিয়া যাইতে হইয়াছে, যে-পুষ্পক রথ স্বভাবত বিমানচারী তাহাকে তিনি মাটির পথে হাঁকাইয়াছেন। অথচ কোথাও হুঁচোট খায় নাই—ইহাই বিস্ময়ের।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুণটি যে কবি কমলাকান্ত পাইয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে, 'আমার মন', 'বসন্তের কোকিল', ও 'একটি গীত' নামে নিবন্ধগুলিতে।

পরাধীন জাতির সাহিত্য একদিক-ভারী নৌকার মতো, আর সে অবস্থাটা যে কিছুতেই সুখকর নয়, তাহা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরাধীন জাতি কিছুতেই নিজের বাস্তব অবস্থা ভুলিতে পারে না, তাই সততস্মৃত ঐ বাস্তব অবস্থা তাহার জীবননৌকার এক পাশ চাপিয়া বসিয়া তাহাকে কাত করিয়া ফেলে। স্থান কাল বিবেচনায় হয় তো ইহা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষেও তাহা স্বাভাবিক নয়। বৃটিশ আমলের প্রত্যেক বাঙালী লেখক এবং প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক অল্পবিস্তর পরিমাণে এই

ত্রুটিসম্পন্ন। অল্প শক্তিমান লেখকের হাতে পড়িলে এই ত্রুটির পরিণামে সৃষ্টি হয় 'মেবার-পতন', প্রতিভাধরের হাতে পড়িলে সৃষ্টি হইতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তর।' মূল প্রেরণা এক, তারতম্য প্রতিভাতে। আবার যে রচনাতে স্বাদেশিকতার চিহ্নমাত্রও নাই, পাঠকে সেখানেও কল্পনায় উহা আমদানি করিয়া আত্মপ্রতারণার আনন্দ লাভ করে।*

স্বাদেশিকতার এই বিড়ম্বনা বৃটিশ আমলের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি—এবং এই ত্রুটির জন্যই (আরও ত্রুটি আছে) বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। বৃটিশশাসন গত হইবার পরে নৌকার অন্য দিকে অন্য প্রকার ভার চাপাইতেছে। ফলে নৌকাখানায় সমতা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু সে বোধ করি একেবারে অতলে পৌঁছিয়া।

'দপ্তরের' অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' 'একটি গীত' ও 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বে' স্বাদেশিকতা ও রাজনীতি আছে কিন্তু 'মেবার-পতন' বা 'সিরাজদ্দৌলা' বা 'ভারত সঙ্গীত' হইতে তাহা ভিন্ন। প্রথমত লেখকদের শক্তিতে ভেদ, দ্বিতীয়ত, 'মেবার-পতন' প্রভৃতির মূলে পরাধীনতার গ্লানিবোধ ছাড়া আর কোন বোধ নাই। উহা নঙর্থক মনোভাব আর নঙর্থক মনোভাবে মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। 'আমার দুর্গোৎসব' কেবল নঙর্থক নয়—উহাতে ভবিষ্যৎ দর্শনের আনন্দ বর্তমান; 'একটি গীতে' দেশ শেষ পর্যন্ত ভূখণ্ডমাত্র নয়, তাহাকে চিন্ময় সত্তা দিয়া দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে ইশারায় প্রেমিক প্রেমিকার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে; আর সেই সূত্রে পদাবলীর অংশ ব্যবহার করিয়া সূক্ষ্মপরোক্ষে প্রেমিক ও প্রেমিকাকে রাধাকৃষ্ণের ব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে। এ অতিশয় সূক্ষ্ম কলাকৌশল, কেবল স্বাদেশিকতার তালঠোকা মাত্র নয়।

'বাঙালির মনুষ্যত্ব' নিবন্ধে এ সব কলাকৌশল, ব্যঞ্জনা ইঙ্গিত না থাকায় তাহা নিম্নতর স্তরের রচনা, এবং সেই জন্যই বোধকরি অনেক বেশি জনপ্রিয়।

নিরবচ্ছিন্ন স্বাদেশিকতার ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ জীবনকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া স্বাধীনতালাভের যে প্রতিকূল হইয়া উঠিতে পারে তাহা তখন আমরা বুঝি নাই। এখনো বিশ্বাস করি না। রোগীর ঘরের বন্ধ জানালা রোগমুক্তির প্রধান অন্তরায়।

যথার্থ হাস্যরস বা humour-এর মধ্যে একটি গভীরতা আছে, এই গভীরতার পরিমাণের উপরেই হাস্যরসের তারতম্য নির্ভর করে। আর প্রকৃত শ্লেষ বা wit-এর মধ্যে আছে বুদ্ধিজাত দীপ্তি ও দাহ। কৈলাস শিখরের ললাটস্থ তুষারস্তূপে রৌদ্র প্রতিফলিত হইলে যে দীপ্তি, দাহ ও প্রখর উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায়—সেদিকে তাকানো যায় না, শ্লেষ বা wit—সেই দীপ্তি, দাহ ও তীব্রতা। আর কৈলাস শিখরের পদপ্রান্তে যে সুগভীর মানস হ্রদ বর্তমান, তাহাতেও রৌদ্র পড়িয়া প্রতিফলিত হয়, কিন্তু

* স্বদেশী যুগের কোন কোন বিপ্লবীর মুখে শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া' গানটিকে বিপ্লবাত্মক গান মনে করিয়া তাঁহারা খুব উত্তেজনা বোধ করিতেন।

তাহা চোখকে পীড়িত না করিয়া স্নিগ্ধ করিয়া তোলে—হাস্যরস বা humour *সেই স্নেহকর,* মোহকর মধুর ভাস্বরতা। দুটিই দীপ্তিমান্; একটি জলে কোমল, অপরটি তুষারে কঠিন; একটি মোহকর, অপরটি দাহকর; একটি আকর্ষণ করে, অপরটি প্রত্যাখ্যান করে; একটি ললাটবহ্নি আর অপরটি অশ্রুর বাড়বানল। কৈলাস শিখরের ললাটজ দীপ্তির মতোই wit বা শ্লেষের জন্ম লেখকের ললাট বা বুদ্ধিতে। আর মানসের হৃদয়জাত দীপ্তির মতোই humour বা হাস্যরসের জন্ম লেখকের হৃদয়ের সমবেদনায়; হয় তো মূলত দুই-ই এক, যেমন মূলত দুই-ই এক তুষার ও জল; কিন্তু অবস্থাভেদে দুই স্বতন্ত্র। wit বা শ্লেষ ধূর্জটি, রুদ্র; humour বা হাস্যরস পার্বতী, কল্যাণী; তাহারা দু'য়ে এক অর্ধনারীশ্বর, একই গৃহী।

হাস্যরস হাসিতে হাসিতে কাঁদায়, শ্লেষ হাসিতে হাসিতে ভাবায়। হাস্যরসের গতি হৃদয় হইতে হৃদয়ে, শ্লেষের গতি মস্তিষ্ক হইতে মস্কিষ্কে; হাস্যরসিক পাঠকের সমবেদনার সমতলে স্থাপিত, হাস্যরসিক পাঠকদের একজন; শৈলিষিক পাঠক হইতে স্বতন্ত্র; হাস্য-রসিক পাঠককে বলে, তোমার আমার একই দোষ, আমাদের অবস্থা এক; শৈলিষিক পাঠককে বলে, তোমার এই দোষ, আমি কত উচ্চে; হাস্যরসিক বন্ধু আর শৈলিষিক শিক্ষক।

সৌভাগ্যবশত প্রাচীন ও অর্বাচীন বাংলা সাহিত্যে humour ও wit-এর দৃষ্টান্ত অবিরল, তন্মধ্যে humour-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কমলাকান্ত; সে একাই এক শ, কেননা সে নিজের উদার সমবেদনার মধ্যে সমস্ত পাঠক সমাজকে বহন করিতেছে; মনীষা ও বহুদর্শনে পাঠকসমাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সে সম্রাট অশোকের মতো একেবারে মাটির উপরে বসিয়া পড়িয়া পাঠকসমাজের সঙ্গে সমানত্ব স্থাপন করিয়াছে; কোনো পাঠক এ কথা কি ভাবিতে পারিয়াছে যে, কমলাকান্ত তাহার আপন জন নয়; এখানেই কমলাকান্তের অসামান্যতা, এবং ওই জন্যই বাঙালীর জীবনক্ষেত্রে তাহার এমন সাফল্য।

আর একটি কথা। কমলাকান্তের দপ্তরের সঙ্গে কয়েক বৎসর পরে লিখিত 'কমলাকান্তের পত্রে'র কিছু প্রভেদ আছে, ভাষার প্রভেদ নয়, ভাষা এক; প্রভেদ সুরের, সুর আলাদা। 'বুড়া বয়সের কথা' এবং 'কমলাকান্তের বিদায়' নিবন্ধদ্বয়ে এমন একটা নৈরাশ্য ও তিক্ততার সুর ধ্বনিত যাহা দপ্তরে বিরল। দপ্তরের 'একা' আর পত্রের 'বুড়া বয়সের কথা'র বিষয় এক, ভাষা এক, কিন্তু সুর আলাদা; শেষোক্ত নিবন্ধের নৈরাশ্য ও তিক্ততা আগের নিবন্ধটিতে নাই। কেন এমন হইল? মাঝখানের কয়েক বৎসর এমন কি ঘটিয়াছিল? ইহা কি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল না তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পরিণাম? নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, বলিবার জন্য লেখকের জীবনতথ্যের যথাযথ সংকলন ও অধ্যয়ন আবশ্যক—সে স্থান ইহা নয়। তবে একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে সুনিশ্চয়। যোগ্যতর ব্যক্তি এ রহস্যের সন্ধান করিবেন আশাতে এখানে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[**প্রমথনাথ বিশী**—বা প্র. না. বি—কী নন্? জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, ইনি একাই এক শ'! এই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক বিশেষণের অর্থ সুপরিস্ফুট। ব্যঙ্গবিদ্রূপে অপরিসীম দক্ষতার জন্য ইঁহাকে অনেকে বাংলার শ' বা বার্ণার্ড শ' বলিয়া থাকেন। আবার সাহিত্যের সমস্ত দিকেই ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা জনসাধারণের স্বীকৃতি আদায় করিয়াছে। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ পুস্তক অনর্গল লিখিয়াছেন এবং এখনও লিখিতেছেন। অথচ তাহার প্রত্যেকটিতেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন—এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কাজ করিতেছেন। বহুদিন সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিয়াছেন—এখনও সম্পর্ক লোপ পায় নাই। মধুসূদন, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইঁহার রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—ছাত্রদের কাছেও ইনি খুব প্রিয়।।]

যুগলাঙ্গুরীয় ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ)

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্য রচনার দীক্ষা ইংরাজি কথা-সাহিত্য হইতে, এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। এ দেশে যে কথা-কাহিনী রচনার ধারা প্রচলিত ছিল, বঙ্কিম সে ধারার অনুসরণ করেন নাই। তাহা করিলে আমরা ছোট বড় অনেকগুলি যুগলাঙ্গুরীয় পাইতাম, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি পাইতাম না। ইংরাজি হইতে তিনি রস-সৃষ্টির আদর্শ, বহু উপকরণ—এমন কি কিছু কিছু উপাদানও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এদেশে প্রচলিত উপকথকতার বাচনভঙ্গী একেবারে বর্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যুগলাঙ্গুরীয় সেই দেশীয় বাচনভঙ্গীর ধারার সহিত তাঁহার রচিত রোমান্সগুলির যোগ-সূত্র। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন রচনা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের থাকে তবে তাহা এই যুগলাঙ্গুরীয়।

যুগলাঙ্গুরীয়ের কাহিনীটি অনেকটা বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথার কাহিনীর মতই। গল্পের উপাদান, উপকরণ ও আবেষ্টনী কেবল প্রাচীন যুগের নয়, গল্প বলিবার ঢঙটিও প্রাচীন যুগের উপযোগী। ইহাকে কোন সংস্কৃত উপাখ্যান বা কাহিনীর অনুবাদ বলিয়াও মনে হইতে পারে।

যে যুগে জ্যোতিষ গণনাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গুরু ধনী গৃহস্থদের ও গার্হস্থ্য জীবনকে অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিত, সেই যুগের সহিত বর্তমান যুগের লৌকিক জীবনের কোন যোগ নাই। বঙ্কিম সীতারাম পর্যন্ত সেই যুগের ধারাকে অনেকটা টানিয়া আনিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গেও যুগলাঙ্গুরীয়ের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র পাওয়া যায়। গল্পের ঘটনাস্থান বাণিজ্যসমৃদ্ধ বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-কাহিনীর মত এই গল্পে বণিক জাতির সভ্যতা ও প্রাধান্যের কথা আছে এবং গল্পের নায়ক পুরন্দর শ্রীমন্তের মত সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করিতেছে।

যুগলাঙ্গুরীয়ের কথাবস্তু ও বাচনভঙ্গী প্রাচীন রীতির হইলেও বাঙ্গালা দেশে ইহা হইতেই ছোট গল্পের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। গল্পটির আকার ছোট বলিয়া একথা বলিতেছি না। আমাদের পুরাতন গল্প-কাহিনীতে যে সব আজগুবি কল্পনার লীলা থাকিত, যে সব অতি-প্রাকৃত ব্যাপারের সমাবেশ থাকিত, ইহাতে সে সমস্ত নাই। ইহার কথাবস্তু অবাস্তব, নীতিপ্রচারমূলক বা ধর্মমূলক নয়। যথেষ্ট না হইলেও ইহাতে Humanism আছে, প্লটের বৈচিত্র্য ও জটিলতা আছে, প্লটটি নেহাৎ Conventional নয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুই নাই, বরং বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়াস আছে। তাহা ছাড়া দৈববিধান এড়াইবার জন্য অঙ্গুরীর ব্যাপারে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার

সমাধানে যে অপ্রত্যাশিত চমক-সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়, তাহাতে ইহাকে এদেশের ছোট-গল্পের সুপ্রভাতের আগের শুকতারা বলা চলে।

শ্রীকালিদাস রায়

১২ই, শ্রাবণ, সন ১৩৫৬,
টালিগঞ্জ।

[**কালিদাস রায় কবিশেখর**—ইনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শুধু নয়, রবি যখন মধ্য গগনে তখনই অল্প যে কয়জন কবি বাংলাদেশে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন কবিশেখর তাঁহাদেরই একজন। ছাত্রাবস্থাতেই ইঁহার বিখ্যাত কবিতা 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' লিখিত হয়—এবং বাংলাদেশে এক অভূত-পূর্ব আলোড়ন উপস্থিত করে। ইনি নিজে ইস্কুলের শিক্ষক হইয়াও অসামান্য পাণ্ডিত্য বলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ ও বি. এ পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রশ্ন-কর্তার কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার রচিত ইস্কুল-পাঠ্য বইগুলিও একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করে। সম্প্রতি সমালোচক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও ইঁহার অশ্রান্ত লেখনী নানা দিক দিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া চলিয়াছে। 'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত 'কবিজীবনের অভিজ্ঞতা' এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিচালন সমিতির সহিত যুক্ত আছেন।]

চন্দ্রশেখর ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ)

চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চম উপন্যাস। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী', ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'কপালকুণ্ডলা', ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'মৃণালিনী', ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা', ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'লোকরহস্য' এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'বিজ্ঞান-রহস্য' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'লোকহরস্য' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধসমষ্টি। 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা মাত্র, সেইজন্য এই দুইখানি পুস্তককে উপন্যাসের মধ্যে গণনা করা হয় না।

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমের মধ্যজীবনের সৃষ্টি। এই উপন্যাস-রচনাকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৫।৩৬ বৎসর। ১৮৬৫ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বঙ্কিমের যে পাঁচখানি উপন্যাস রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'বিষবৃক্ষ'-এর সহিত এবং পরবর্তীকালে রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সহিত 'চন্দ্রশেখর'-এর আদর্শগত একটি মিল রহিয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক ৺শশাঙ্কমোহন সেন এই তিনখানি গ্রন্থকে "পরিবার-তন্ত্রের ত্রিগাথা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পবিত্র দাম্পত্য প্রেমেরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। অথবা, শুধু এই তিনখানি উপন্যাসই বা বলি কেন,—কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ, রজনী, রাজসিংহ প্রভৃতি সকল উপন্যাসেই তিনি যেখানে অবকাশ পাইয়াছেন, সেখানেই দাম্পত্য প্রেমের সহিত রূপজ মোহের সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া পরিণামে দাম্পত্য প্রেমেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না,—তিনি ছিলেন স্রষ্টা ও সংস্কারকর্তা। ধর্ম, সমাজ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি নূতন ভাব ও আদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের অল্প কিছুদিন পরেই দেশবাসী রাষ্ট্রীয় চেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থায় দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্বাদেশিকতার আদর্শই আজ আমাদের মন ও বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেশের পুনর্গঠন করিতে হইলে,—দেশকে সর্ববিধ উপায়ে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধর্ম ও সমাজেরও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তি ও পরিবার লইয়াই সমাজ। ব্যক্তিজীবনে সংযম, সুস্থতা ও পবিত্রতা না থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। মনে হয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে আমাদের সম্মুখে পারিবারিক ও সামাজিক সমুন্নত আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রনাথের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যত স্বাভাবিকই হউক না কেন, এই আকর্ষণকে বঙ্কিম কিছুতেই নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের

সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাই শেষ পর্যন্ত নিরপরাধা ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুন্দনন্দিনীকে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর অপমৃত্যু সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারে,—কিন্তু আদর্শবাদী বঙ্কিমের পক্ষে ইহা এড়াইয়া যাইবারও কোন উপায় ছিল না। ঠিক এই একই কারণে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর জীবনের ভয়াবহ পরিণাম সংঘটন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। এই কথাটি মনে রাখিলে রোহিণীর শোচনীয় পরিণামের জন্য বঙ্কিমকে দায়ী করিবার অবকাশ থাকে না।

বিষবৃক্ষে বঙ্কিম দাম্পত্য প্রেমের ব্যভিচারকে কঠিন, নির্মম হস্তে দমন করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস চন্দ্রশেখরে তাঁহার মতবাদ এবিষয়ে উদারতর ও অধিকতর সহনশীল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অদৃষ্টদোষে কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর পরিপূর্ণ দাম্পত্য সুখের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে,—কিন্তু ইহার জন্য সে জ্ঞানতঃ দায়ী ছিল না। কুন্দ একান্ত সরল ও অসহায় বলিয়াই পাঠকের হৃদয় তাহার শোচনীয় পরিণামে ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্র কুন্দের চরিত্রের মত সরল ও নিষ্পাপ নহে। বাল্য বয়সে প্রতাপের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পরে চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ হইল। ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া,—তখনকার হিসাবে একটু বেশি বয়সেই,—তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পত্নীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার অভাব ছিল না। কিন্তু, শাস্ত্রালোচনায় তন্ময় চন্দ্রশেখরের শান্ত, সংযত ভালবাসায় শৈবলিনীর মন তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তাই যৌবনে অকস্মাৎ প্রতাপকে দেখিয়া প্রতাপের প্রতি তাহার পূর্ব প্রণয় এতই দুর্দম হইয়া উঠিল যে, তাহাকে পাইবার আশায় সে লরেন্স ফষ্টরের মত লম্পটের সাহায্য লইয়া মহাদেবের ন্যায় স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। শৈবলিনী প্রতাপ কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছে,—"তুমি কি জান না যে, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" বঙ্কিম শৈবলিনীকে "পাপীয়সী" বলিয়াছেন। কিন্তু এই পাপীয়সীকেও তিনি অদৃষ্টলাঞ্ছিতা সরলা কুন্দের মত নির্দয়ভাবে বিসর্জন দেন নাই। পরন্তু তাহাকে তিনি সসম্মানে স্বামীর গৃহে পুনঃ সংস্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য তৎপূর্বে অনুতপ্তা শৈবলিনীকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মনের সকল কালিমা নিঃশেষে ধৌত করিতে হইয়াছে।

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রূপজ লালসার সহিত সংগ্রামে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমকে জয়ী করিয়াছেন বটে, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে এমন কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যেগুলিকে আমরা ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় এই সকল স্থলেই উপন্যাসের শিল্পগত দুর্বলতা ঘটিয়াছে। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, সংযতমনা বীর প্রতাপের পক্ষে করায়ত্ত শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যান করার

মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই;—বরং এই ঘটনায় তাঁহার চরিত্র অতি-মানবীয় মহত্ত্বে ভাস্বর হইয়াই উঠিয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী-চরিত্রের পরিণতিকে আমরা এরূপ স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে শৈবলিনী প্রতাপের প্রতি অনুরাগে অন্ধ হইয়া কুলত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই; যে নবাব মীর কাসেমের দরবারে উপস্থিত হইয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে; যে অপরিসীম সাহস, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে আমিয়টের নৌকা হইতে বন্দী প্রতাপকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে,—সেই শৈবলিনী প্রতাপের অনমনীয় সংকল্পের নিকট পরাভূত হইয়া প্রেমাস্পদের জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাকে ভুলিবার কঠিন শপথ ঝোঁকের মাথায় গ্রহণ করিলেও করিতে পারে,—ইহার মধ্যে হয় ত ততটা অস্বাভাবিকতা নাই,—কিন্তু হঠাৎ নির্জন গিরিগুহায় তাহার সপ্তাহব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন এবং দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অবলম্বনের ব্যাপারকে তাহার প্রণয়োদ্বেল চরিত্রের সহিত সহজে সুসমঞ্জস করিয়া লইতে পারা যায় না। বস্তুতঃ, এই উপন্যাসের "প্রায়শ্চিত্ত" নামক চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং শৈবলিনী-চরিত্রের উন্মত্ততার পরিণতি-ব্যাপারকে কেমন যেন ভৌতিক ও খাপছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শৈবলিনী চরিত্রের রূপান্তর সংঘটনের সহিত শরৎচন্দ্রের "স্বামী" উপন্যাসের নায়িকা সৌদামিনী চরিত্রের আকস্মিক অথচ মনস্তত্ত্বসম্মত পরিবর্তনের তুলনা করা যাইতে পারে। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের মূল কাহিনীর ছাপ "স্বামী" উপন্যাসে সুস্পষ্ট। শৈবলিনী ও সৌদামিনী উভয়েই বিবাহের পূর্ব হইতেই অন্যানুরাগিণী এবং বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি স্নেহহীনা। উভয়ের স্বামীই স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু সংসারে অনাসক্ত ও প্রৌঢ়। স্বামীর প্রতি অভিমানবশে সৌদামিনী নরেন্দ্রের প্ররোচনায় স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গেল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। অবশেষে নরেন্দ্রের নির্লজ্জ ব্যবহারে তাহার বর্বর পাশব প্রকৃতি এক মুহূর্তে সৌদামিনীর চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল এবং তাহার প্রতি মন অপরিসীম ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া গেল। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে জন্মিল তাহার মনে ধৈর্যশীল, নিরীহ ও স্নেহপরায়ণ স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। "স্বামী" উপন্যাসের এই ঘটনাটিকে শৈবলিনীর সুদীর্ঘ ব্রতনিয়ম পালনের চেয়ে কত বেশী স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়! বঙ্কিমচন্দ্রও ইচ্ছা করিলে এইভাবে শৈবলিনীচরিত্রের মনস্তত্ত্বমূলক পরিবর্তন সংঘটন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রতাপের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ হারাইতে হইত।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে একটি বৃহত্তর কাহিনীর অঙ্গরূপে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীর ধারা দেখিতে পাই। প্রথমটি হইতেছে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের গার্হস্থ্য জীবনের কাল্পনিক কাহিনী; আর দ্বিতীয়টি, মীবকাসেম-দলনী-গুরগন্-আমিয়ট্ প্রভৃতির অর্ধ-ঐতিহাসিক, অর্ধ-কাল্পনিক কাহিনী। এই উপায়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কাহিনীটিকে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই শিল্প-কৌশল তিনি পূর্ববর্তী উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী এবং কপালকুণ্ডলাতেও অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই

যে, ঐতিহাসিক সুপরিচিত চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ায় কাল্পনিক চরিত্রগুলি অধিকতর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; এবং ঐতিহাসিক ঘটনার গতিবেগ উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিচিত্র, বাস্তব ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে চরিত্র-বৈচিত্র্য। ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্যই হইল জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি। ইহার উপরেই প্রধানতঃ উপন্যাসের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। কিন্তু সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পাদন আরও কঠিন ব্যাপার। বঙ্কিম-সাহিত্যে আমরা যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের সহিত পরিচিত হই, তাহারা প্রত্যেকেই একে অপর হইতে স্বতন্ত্র। সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে একমাত্র আনন্দমঠের শান্তি-চরিত্রের সহিত দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল চরিত্রের ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তথাপি শান্তি ও প্রফুল্ল ঠিক এক প্রকারের চরিত্র নহে। শান্তি যেসকল দৈহিক ও মানসিক গুণে ভূষিত হইয়াছিল, তাহা সবই দৈবক্রমে লব্ধ শিক্ষার ফলে। প্রফুল্ল চরিত্রে সেই সকল গুণই ভবানী পাঠকের সুপরিকল্পিত শিক্ষার ফলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি নারীচরিত্র ব্যতীত সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে অপর যে-কোন দুইটি চরিত্রকে সম প্রকৃতির বলিয়া মনে হইবে না। পদ্মাবতী, হীরা, শৈবলিনী, রোহিণী প্রভৃতি যে সকল চরিত্র প্রবৃত্তির বশে চালিত হইয়া পরিণামে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র বিচিত্র ও স্বতন্ত্র।

চরিত্রের মধ্যে এই বৈচিত্র্যকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে পরস্পর-বিরোধী দুইটি চরিত্র পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী ও দলনী বেগম এইরূপ বিরোধী চরিত্র। শৈবলিনী পাপিষ্ঠা;—প্রবৃত্তি দমনে সে অক্ষম। দেবতার ন্যায় একনিষ্ঠ স্বামীর অকৃত্রিম প্রণয় তুচ্ছ করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে প্রতাপকে পাইবার প্রত্যাশায়। গৃহত্যাগের পর সুন্দরী তাহাকে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু নানা ছল-ছুতা করিয়া সে সুযোগ সে গ্রহণ করিল না। এমন কি, পরে প্রতাপের মুঙ্গেরের বাড়ীতে চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরেও সে প্রতাপকে পাইবার আশা ত্যাগ করে নাই। আর দলনী? সুদূর ইরাণ হইতে ভাগ্যান্বেষণে সে ভ্রাতার সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। দৈবক্রমে সে মীর কাসেমের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল এবং রূপগুণে নবাবের মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা বেগম হইতে পারিয়াছিল। বহু-পত্নীক নবাবের অন্যতমা প্রেয়সী হইলেও তাহার প্রেমে কোন খাদ ছিল না। নবাবের বিপদ আশঙ্কা করিয়াই সে ইংরেজের সহিত নবাবের যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা গুরগন খাঁ তাহাকে নিজের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া নবাব-দরবারে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করিতে চাহিয়াছিল। যতকাল ইহাতে নবাবের কোন অনিষ্টাশঙ্কা ছিল না, ততকাল দলনী ইহাতে প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু ভ্রাতার স্বার্থের সহিত স্বামীর স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে, সে ভ্রাতার,—এমন কি, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও স্বামীকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়াই সে গুরগনের চক্রান্তে বিপদে পড়িয়াছে; এক

বিপদ হইতে গভীরতর বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তথাপি তাহার স্বামিপ্রেম বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কুলসমকে সে বলিয়াছে,—"আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।" রমানন্দ স্বামী তাহাকে মুঙ্গেরে নবাবের নিকটে ফিরিয়া গেলে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে জানাইলে, সে উত্তর করিয়াছিল,—"অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।" অবশেষে তকী খাঁর কুচক্রে যখন নবাবের নিকট হইতে তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা আসিল, তখন সে নির্বিকারভাবে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল। শৈবলিনী স্বেচ্ছায় স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল এবং প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাইয়াও তাহা গ্রহণ করে নাই। অন্যদিকে দলনী স্বামীর মঙ্গলেই পুরত্যাগ করিয়াছিল, এবং ষড়যন্ত্রের ফলে যখন তাহার পক্ষে পুরপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, তখন অদৃষ্টের ক্রীড়নক হইয়া সে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়াছে, কিন্তু স্বামীর প্রতি তাহার গভীর ভালবাসা একটুও ম্লান হয় নাই। শৈবলিনী পাপিষ্ঠা, দলনী দেবী। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা অতি স্থূল লালসা,—মীর কাসেমের প্রতি দলনীর ভালবাসা স্বার্থলেশশূন্য পবিত্র প্রেম।

চন্দ্রশেখর চরিত্রে বিশেষ কোন জটিলতা নাই। সাংসারিক ভোগসুখে বিগতস্পৃহ, সংযমী চন্দ্রশেখর কতকটা দায়ে পড়িয়াই দারপরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ঘটনাচক্রে শৈবলিনীকে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেই উপযাজক হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হইল না। আজীবন ব্রহ্মচর্য ও শাস্ত্রানুশীলনে অভ্যস্ত চন্দ্রশেখর তুচ্ছ বিষয়সুখে মন বসাইতে পারিলেন না। শৈবলিনীকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই;—বিলম্বে তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন;—কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। শৈবলিনীর অধঃপতনের গৌণ কারণ চন্দ্রশেখরের সাংসারিক সুখে নিস্পৃহতা। তথাপি শৈবলিনীকে তিনি যে কত গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং শৈবলিনীর অভাব তাঁহার মনে যে কি শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পরে সযত্নে সংগৃহীত গ্রন্থরাশি ভস্মসাৎ করিয়া তাঁহার সংসারত্যাগের ব্যাপারে। উপন্যাসের ঘটনার পরিণতিসাধনে চন্দ্রশেখরের দান সামান্যই। তবে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবাহ মূল কাহিনীর স্রোতে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা ছাড়া, দলনী ও কুলসমকে তিনিই আশ্রয়দানের জন্য প্রতাপের গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই গলস্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ শৈবলিনী ভ্রমে দলনীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার স্রোতও বেগবান ও আবর্তসঙ্কুল হইয়া উঠে।

এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হইতেছে প্রতাপের চরিত্র। বঙ্কিমের অন্যান্য নায়ক-চরিত্রও পাপ ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রতাপের ন্যায় সংগ্রাম বুঝি কেহই করে নাই। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলাল সংগ্রাম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে চিত্তবৃত্তির নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল রজনী উপন্যাসের অমরনাথের সহিত প্রতাপের সংযম-সাধনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অমরনাথের চেয়েও প্রতাপের ত্যাগ ও সংযম বৃহত্তর। অমরনাথ যখন স্পষ্টভাবে

জানিলেন যে, রজনী তাঁহার প্রতি আদৌ অনুরক্তা নহে, কেবল তখনই তিনি তাহাকে পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে প্রতাপ আজীবন শৈবলিনীর প্রতি গভীরতম প্রেম অন্তরে পোষণ করিয়াও স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের জন্য সমুপস্থিত শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের যূপকাষ্ঠে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থকে তিনি অসংকোচে বলি দিয়াছেন। এই ত্যাগ ও সংযমের অলৌকিক জ্যোতিতে প্রতাপ-চরিত্র দেবজনোচিত মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু প্রতাপের ত্যাগ এইখানেই শেষ হয় নাই। রমানন্দ স্বামীর যোগবলে শৈবলিনী সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীর গৃহে স্থান পাইয়াছে। সে প্রতাপকে ডাকিয়া বলিল যে, নিজের সকল অপরাধের কথা স্বামীকে খুলিয়া বলিতে চায়। প্রতাপ তাহাকে "সুখী হও" বলিয়া আশীর্বাদ করিলে সে বলিল—"তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না।" শৈবলিনীর কল্যানের জন্য তাই প্রতাপ নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রতাপের নিকটে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রমানন্দ স্বামী সত্য কথাই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ড জয়ও প্রতাপের এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুলনায় তুচ্ছ। এই ইন্দ্রিয়জয়ের মূলে যে কি দুশ্চর তপস্যা রহিয়াছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার জন্যই যেন রমানন্দ স্বামী প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে ?" এই কথায় "সুপ্ত সিংহ" যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল। বলিল,—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি? পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি,—আমার ভালবাসার নাম—জীবন-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

প্রতাপের হৃদয়ে ছিল চিরদিন শৈবলিনীর প্রতি গভীরতম নিষ্কাম ভালবাসা, আর শৈবলিনীর ছিল প্রতাপের প্রতি কামনাময় ভালবাসা। তাই, সামাজিক কারণে উভয়ের মিলন অসম্ভব জানিয়া যৌবনের প্রারম্ভে যখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া ডুবিয়া মরিতে গেল, তখন প্রতাপ অনায়াসেই ডুবিতে পারিল,—শৈবলিনী পারিল না,—প্রাণের ভয়ে ফিরিয়া আসিল। যে নিষ্কাম ভালবাসা কেবল ভালবাসিয়াই সুখী; যে ভালবাসা কোন প্রতিদান চাহে না; যে ভালবাসা লালসার তীব্র বহ্নিজ্বালায় সমাজের সুখশান্তিময় গৃহগুলিকে ভস্মীভূত করে না; এবং যে স্বর্গীয় ভালবাসার বলে প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রণয়াস্পদের কল্যাণের জন্য আত্মাহুতিদানেও কুণ্ঠিত হয় না,—চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের আদর্শই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ একনিষ্ঠ নিষ্কাম প্রেম যদি দাম্পত্য প্রেম নাও হয়, তথাপি তাহার গৌরবের হানি হয় না।

প্রতাপের আত্মবিসর্জন এবং মানসিক ব্যাধিমুক্তা শৈবলিনীর সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা,—চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মূল ঘটনার ইহাই পরিণতি। এই উপন্যাসে স্থানে স্থানে অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে মূল কাহিনীর স্বাভাবিক স্রোত রুদ্ধ হইয়া

পড়ে নাই। অন্ধকারময় নির্জন পর্বতগুহায় শৈবলিনীর বিভীষিকাদর্শন, তাহার অনুতাপ ও আত্মানুসন্ধান ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি না হইলেও পাঠকের মনে ইহা একটি সত্রাস বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু শৈবলিনীর দৈহিক পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য তাহাকে এবং লরেন্স্ ফষ্টরকে মোহাবিষ্ট করিয়া যে কয়েকটি স্থলে রমানন্দ স্বামী নিজে ও চন্দ্রশেখরের দ্বারা নানারূপ স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছেন,—সেই কয়েকটি স্থলেই উপন্যাসের শিল্পসৃষ্টি সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে। সেই কয়েকটি পরিচ্ছেদ পড়িতে বসিলেই মনে হয়, বঙ্কিম এই আখ্যায়িকাটিকে "স্বামীহীনা" করিলেই বোধ হয় ভাল করিতেন। এক রমানন্দ স্বামী ব্যতীত এই উপন্যাসের ছোট বড় সকল চরিত্রই যথাযোগ্য বর্ণনাসমাবেশে বেশ স্বাভাবিকভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবল ঘূর্ণী-বাত্যা মূল কাহিনীটির মধ্যে বৈচিত্র্য ও গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্য কোথাও মূল ঘটনার স্রোত কিংবা চরিত্রসমূহের স্বাভাবিক পরিণতি বিপর্যস্ত হইয়া যায় নাই। উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রসমূহের পরিণতির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির সার্থকতা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ।
কলিকাতা।
১৩৫৪ সাল। ২৯ মাঘ।

শ্রীকালীপদ সেন।

[**কালিপদ সেন**—প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ছাত্রাবস্থাতেই ইঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকট হইয়া ওঠে। অধ্যাপনার কার্যে ইনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছেন।]

রজনী ঃ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ)

১৮৭৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার দ্বাদশ বর্ষ পরে 'রজনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'রজনী' বঙ্কিমচন্দ্রের নবম উপন্যাস। ইহার পূর্বে ১৮৬৫ হইতে ১৮৭৫ এই দশ বৎসরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), এবং রাধারাণী (১৮৭৫) এই আটখানি ছোটবড় উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। এ ছাড়া লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) এবং বিবিধ সমালোচন (১৮৭৬) চারখানি প্রবন্ধপুস্তকও মুদ্রিত হইয়াছিল। 'রজনী'কে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর সৃষ্টিরূপেই বিচার করিতে হইবে।

'রজনী'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেনঃ—

"প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত Last Days of Pompii নামে উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি কাণা ফুলওয়ালী আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে-সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।"

'রজনী'র অন্ধত্বের মধ্য দিয়া লেখক 'যে-সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন' করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহা কেবলমাত্র দৃষ্টিহীনা রজনীর মধ্য দিয়াই যে সার্থক হইয়াছে তাহা নয়, প্রখর দৃষ্টিসম্পন্না লবঙ্গলতার মধ্য দিয়াও সে-উদ্দেশ্য কম সার্থক হয় নাই। বলা বাহুল্য, অমরনাথের চরিত্রও স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে সফলতার উচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়াছে।

'রজনী' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের সমপংক্তির নয়। ইহার রচনাপদ্ধতি অন্যরূপ। এই রচনাপ্রণালী তিনি ইতিপূর্বে তাঁহার 'ইন্দিরা' উপন্যাসে অনুসরণ করিয়াছেন। বঙ্কিম-চন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসের এই রচনারীতি সম্পর্কে নিজে লিখিয়াছেন—"উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক-নায়িকা-বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত "Woman in White" নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সে কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এই উপন্যাসে যে-সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।"

লেখক যে-দায়িত্ব নায়ক-নায়িকাদের উক্তির উপর সর্বতোভাবে তুলিয়া দিয়া নিজেকে

দায়িত্বমুক্ত বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, বস্তুতঃ সে দায়িত্ব লেখকের কাটিতে পারে না এবং কাটে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিকতার স্পর্শে রঞ্জিত। 'রজনী'তে এই অলৌকিকতার সুযোগ লেখক যথেষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উহা যথাযথ ক্ষেত্রে কুশলতার সহিত পরিবেশিত হওয়ায় বইখানির অপ্রাকৃত অংশগুলিও অধ্যয়নের গতিরোধ করে না।

রজনীকে একখানি সর্বাঙ্গীণ-সম্পূর্ণ উপন্যাসরূপে গ্রহণ করা যায় না। ইহার মধ্যে বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া মাত্র তিনটি চরিত্রের বিকাশকে আমরা পাই। রজনী, শচীন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও লবঙ্গলতা এই চারিটি চরিত্রের ভাষণে আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে। ইঁহারা কেবলমাত্র আপন আপন অন্তঃস্থল উন্মুক্তই করেন নাই, একে অন্যের চরিত্র রূপায়ণ ও বিশ্লেষণে সাহায্য করিয়াছেন। এই চারিটি চরিত্রের মধ্যে শচীন্দ্র অপ্রধান। অপর তিনটি চরিত্রকে পূর্ণবিকশিত ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্যই শচীন্দ্রের সৃষ্টি। তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর লেখক কোনও দিক্ হইতে তীব্র আলোকপাত করেন নাই।

অমরনাথ লেখকের উচ্চ ও মহৎ আদর্শের প্রতিমূর্তি। প্রথম যৌবনের উন্মাদ আবেগজনিত দুর্বলতার ত্রুটিটুকু না থাকিলে এ চরিত্রটি রক্তমাংস গঠিত মাটির মানুষরূপে জীবন্ত হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। অতীত দুর্বলতার ঐটুকু স্পর্শ দিয়া নিপুণ শিল্পী তাঁর কল্পনার মহান আদর্শকে ধরণীর ধূলায় মানুষ করিয়া গড়িতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐটুকুর সংমিশ্রণ অমরনাথের চরিত্রে বাস্তবতা আনয়ন করিয়াছে।

'রজনী'র চরিত্র লেখক কর্তৃক পুস্তকের মধ্যেই বিশ্লেষিত হইয়াছে। রজনীর নিজের এবং অপর তিনজনের ভাষণের মধ্য দিয়া এই অন্ধ যুবতীর অন্তরে ও বাহিরে চিন্তায় ও কর্মে যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে। লেখকের দিক হইতে বিশেষ আলোকপাত করা হয় নাই কেবল একটিমাত্র চরিত্রে।--সে হইল লবঙ্গলতা।

লবঙ্গলতা চরিত্রটি অতি স্বল্প-বিশ্লেষিত। মাত্র কয়েকটি গভীর অর্থদ্যোতক কথার ক্ষীণ আলোকরেখা ছাড়া তাহার মানসলোক লেখক একরূপ আবৃতই রাখিয়াছেন। 'রজনী'র মধ্যে এই চরিত্রটিতেই মানবহৃদয়ের নিগূঢ় লীলার সঙ্কেত বর্তমান। সতর্ক লেখক দুই একটি মাত্র রেখার স্পর্শে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ইহা নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ, তাহাকে বিশ্লেষণের ছুরির মুখে ফেলেন নাই এবং বাহিরের সূর্যালোকে অনাবৃত করেন নাই। পাঠকদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, হৃদয়ানুভূতি এবং কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন।

এই পদ্ধতি গ্রহণে প্রতিভাবান্ স্রষ্টা বিশেষ চরিত্রটিকেই শুধু মর্যাদামণ্ডিত করেন না, পাঠকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও রসবোধের উপর নির্ভর করিয়া পাঠককেও সম্মানিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীসুলভ বিশেষত্বের চিহ্ন মুদ্রিত আছে।

প্রধান চরিত্র কয়টি বিকশিত এবং সুসম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে রজনীর মধ্যে যে কয়টি পার্শ্বচরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে ইহারা নিজ মুখে কথা কহে নাই এবং যতটুকু নিতান্ত না আসিলে নয় তাহার অধিক কোনওখানে আসে নাই। পার্শ্ব চরিত্রগুলিও সুদক্ষ শিল্পীর মাত্র এক একটি করিয়া তুলির আঁচড়েই সুস্পষ্ট সুন্দর হইয়াছে।

'রজনী' বঙ্কিমসাহিত্য-কাননের শেফালীতরু মাত্র। বিরাট বনস্পতি নয়। কথা-সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অতুলনীয় মহীরুহশ্রেণী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' পুষ্পিত লতাবিতান দুটি, অবকাশ যাপনের অবসরবেদী বলা চলে।

২।২, হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ : কলিকাতা
২৭শে শ্রাবণ : ১৩৫৬

রাধারাণী দেবী

[**রাধারাণী দেবী**—কবি হিসাবে রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবী করেন। ইনি ও ইহার স্বামী নরেন্দ্র দেব—দুজনেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে এ দৃষ্টান্ত এই প্রথম। বাহিরেও খুব বেশি নাই—এইজন্য ব্রাউনিং দম্পতির সঙ্গে ইঁহাদের তুলনা করা হয়। শুধু কবিই নন্—রাধারাণী দেবীর সমালোচক হিসাবেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইঁহার প্রবন্ধগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। ইনি অপরাজিতা দেবী এই ছদ্ম-নামে কতকগুলি প্রণয়মূলক হাল্‌কারসের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন—সেগুলি অভূতপূর্ব খ্যাতি ও সমাদর লাভ করে।]

পরিচিতি

বঙ্কিম পরের অনুকরণ যদিবা কোথাও কোথাও করিয়া থাকেন—নিজের অনুকরণ তিনি কোথাও করেন নাই। তিনি এক প্রকৃতির বা আদর্শের চরিত্র দুইবার অঙ্কন করিতেন না, এক প্রকার ঘটনার সমাবেশ বার বার করিতেন না, এক প্রকার সমস্যার দুইবার অবতারণা করিতেন না, প্রত্যেক উপন্যাসে নূতন নূতন ভঙ্গী, পদ্ধতি ও আদর্শ প্রবর্তন করিতে চাহিতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিপরীতধর্মা।

এই রজনী গ্রন্থে তিনি আখ্যায়িকা বিবৃতির নূতন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়কনায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনাপ্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইলকি কলিন্‌সের 'ওম্যান ইন হোয়াইট' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।"

এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে নূতন নয় বটে, কিন্তু এদেশে ইহার প্রবর্তক বঙ্কিম। বঙ্কিম বলিয়াছেন, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়—এই প্রথার গুণ এই। ইহা একটি গুণ বটে, কিন্তু ইহার চেয়ে ঢের বড় গুণের কথা তিনি বলেন নাই। তাহা তাঁহার অবলম্বিত পদ্ধতিতে ফুটিয়াছে। বঙ্কিম যে শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহাদের পদ্ধতি বস্তুতান্ত্রিক—যাহা সত্যই ঘটিয়াছে, যাহা তিনি স্বকর্ণে ও লোকমুখে শুনিয়াছেন—যাহা তিনি ইতিহাসে পাইয়াছেন, কথকের আসনে বসিয়া লেখক যেন তাহারই বিবৃতি করিয়া যাইতেছেন—পাত্রপাত্রী নায়কনায়িকার মনের ক্রিয়ার খবর তাঁহার জানিবার কথা নয়, তাহাদের বাক্য ও আচরণে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে পাঠককে তাহা হইতেই তাহাদের মনের খবর অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অবিমিশ্র গল্পের বোধ হয় ইহাই প্রকৃত পদ্ধতি।

বঙ্কিম এই পদ্ধতিই কাঁটায় কাঁটায় যে সর্বত্র অনুসরণ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার রচনার পদ্ধতি প্রধানতঃ ভাবতান্ত্রিক নয়. কিন্তু বঙ্কিম শুধু ঔপন্যাসিক নহেন, কবিও—তাই তাঁহার রচনায় ভাবতান্ত্রিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ ভাবতান্ত্রিকতা বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির সহিত সুসমঞ্জস হইবে না মনে করিয়া তিনি মনের খবর প্রকাশের জন্য নানা কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোথাও পরিস্ফুট স্বগতোক্তি, কোথাও স্বপ্ন, কোথাও পত্র, কোথাও সুমতিকুমতির দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথাও বিশেষকে সামান্য-তত্ত্বে পরিণত করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু তবু তিনি ভাবতান্ত্রিকতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এমন সব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এমন সংস্থিতির

মধ্যে ও এমন খাতে•তাহাদের জীবনধারাকে লইয়া গিয়াছেন যে স্বভাবতই তাহাদের মনের সংবাদ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রজনীতে বঙ্কিম যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা স্বচ্ছন্দে অকুণ্ঠিত ভাবে বলিবার সুযোগ হইয়াছে। যাহা বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে অসমঞ্জস তাহা এই প্রণালীর পক্ষে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। কে কি অনুভব করিতেছে, ভাবিতেছে, মনের মধ্যে তাহার কি আলোড়ন ও দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে, সে নিজমুখে বলিলে যতটা স্বাভাবিক হয়, সর্বজ্ঞ অন্তর্দর্শীর আসনে বসিয়া কথক বলিলে তাহা তত স্বাভাবিক হয় না। রজনী পুস্তকে এই পদ্ধতির সাহায্য পাইয়া বঙ্কিম স্বচ্ছন্দে অকুণ্ঠিত ভাবে মনের সংবাদ পাঠককে জানাইতে পারিয়াছেন।

বঙ্কিম আর একটি কথা ভূমিকায় বলিয়াছেন। 'যে যাহার কথা বলিয়া যাইতেছে তাহাব মধ্যে কোন অপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক ব্যাপারের যদি উল্লেখ থাকে তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তাহারাই দায়ী, এ জন্য লেখক দায়ী নহেন। বিশ্বাস করিতে হয় করিবে, না হয় করিও না।' বলা বাহুল্য, এই কথার দ্বারা বঙ্কিম দায়িত্ব এড়াইতে পারেন নাই।

যাহাকে অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের তাহাতে একেবারে বিশ্বাস ছিল না বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ তাঁহার একটা দ্বিধাবোধ ছিল। ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার ও কালচারের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল, এদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শন পড়িয়া যুক্তিমূলক প্রত্যক্ষবাদের তিনি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে দুইএর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে তিনি ভারতীয় সংস্কারকে ভ্রান্তিমুক্ত ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ Rationalise করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন— "শুনিয়াছি বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায় তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন বলা যাইবে না? ইহার কারণ এই হইতে পারে ইহার প্রকৃত সংকেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।. কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সংকেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলে দেখি।

"তোমাদের একটি ভ্রম আছে তোমরা মনে কর যে যাহা ইংরাজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরাজেরা জানেনা, তাহা অসত্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত! তুমি কিছু জান, আমি কিছু জানি, অন্যে কিছু জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, —আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরাজে জানে—কিছু আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরাজেরা যাহা জানে ঋষিরা তাহা জানিতেন না, ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরাজেরা এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি।"

এই উক্তি বঙ্কিমেরই—সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া অভিব্যক্ত। ইহাতে বঙ্কিম দুই সভ্যতার সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধুপুরুষদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধারই অঙ্গ। অতএব বঙ্কিমের দায়িত্ব আছেই।

'লাষ্ট ডেজ অব পম্পি' নামক উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্র অনুসরণে বঙ্কিম রজনীচরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন—উপন্যাসের অন্যান্য অংশে বঙ্কিমের মৌলিকতার অভাব নাই। বঙ্কিম বলিয়াছেন—"যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর যাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীচরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।" বঙ্কিম নিজে বলিয়াছেন—এই পুস্তক উদ্দেশ্যমূলক। যে সকল তত্ত্ব তথ্য উপন্যাসের উপকরণ স্বরূপ হইত—সেগুলিকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করার একটা রীতি সেকালে ছিল। বঙ্কিম যাহাই বলুন—তাঁহার শিল্পকৌশলের গুণে এ গ্রন্থে কোন উদ্দেশ্যই প্রবল রূপে শীর্ষ তুলিয়া উঠে নাই—আর্ট-সৃষ্টির অঙ্গীভূতই হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিম একটা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিলেও তাহা আর্ট হইয়া উঠিতে বাধা পায় নাই।

বঙ্কিমের অভিনব নারীচরিত্র ও নারীজীবনরচনার আগ্রহের ফলেই রজনী সাগরপার হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। আর মানসিক তত্ত্বের কথা? এখানেও তাঁহার অভিনবতা সৃষ্টির আগ্রহই মূল। অন্যান্য উপন্যাসে তিনি রূপানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি অনুভব করিয়াছেন—রূপই একমাত্র অনুরাগের সঞ্চারক নয়, চক্ষু ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের শক্তিও অল্প নয়। স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় অনুরাগ সঞ্চারের অল্প সহায়তা করে না। দর্শনেন্দ্রিয় এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহাকে বাদ দিলে তাহার সমস্ত শক্তিটা বাকি ইন্দ্রিয়গুলিকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করে। তাহারই ফলে অন্ধ দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূরণ করিয়া লয়। বঙ্কিম এই গ্রন্থে স্পর্শানুরাগেরই অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন—শ্রবণেন্দ্রিয় তাহাকে সহায়তা করিয়াছে। অন্ধ সুন্দরীর প্রয়োজন এই জন্যই হইয়াছে। এজন্য বঙ্কিমকে অন্ধের দেহ ও মন দুইএর ক্রিয়া ও আচরণকে অভিনিবেশের সহিত অনুশীলন করিতে হইয়াছিল।

রজনীকে ফুলওয়ালী করিতে হইয়াছে। তাহার স্পর্শশক্তি অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু ইহাতে মাধুর্য সঞ্চারিত না হইলে ত ইহার দ্বারা প্রণয় সঞ্চার হয় না। তাই অন্ধ রজনী ফুলওয়ালী,—দুধওয়ালী বা চুড়িওয়ালী নয়। অনবরত ফুলের কোমল স্পর্শ তাহার স্পর্শশক্তিতে মাধুর্যসঞ্চার রাখিয়াছিল—ফুলের সৌগন্ধ্যও তাহাকে অল্প সাহায্য করে নাই। রূপের সঙ্গে যেমন কণ্ঠস্বর—স্পর্শের সঙ্গে তেমনি ঘ্রাণ। অন্ধের শ্রবণশক্তিও প্রখর—যে সঙ্গীত মধুর, অন্ধের কর্ণে তাহা মধুরতর। তাহার কাছে কোমল সস্নেহ স্পর্শ কিরূপ? 'নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ।'

বঙ্কিম বলিয়াছেন, রূপের মত স্পর্শও প্রণয়ের উদ্দীপক। শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি লাগানো হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণী হৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে?

সত্যই কি রূপ, শব্দ বা স্পর্শই প্রেমের জনয়িতা? বঙ্কিম ইহার উত্তর দিয়াছেন—রজনীর মুখ দিয়া। অন্ধ রজনীই একমাত্র উত্তর দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারিণী। প্রেম বাহির হইতে আসে না—প্রেম কমলের মত হৃদয় বৃন্তেই ফুটে।—রূপ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি বাহির হইতে তরুণারুণ-করের কাজ করে মাত্র। অন্ধ হোক, বধির হোক, মূক হোক, কুরূপ হোক, কুৎসিত হোক—সকলের হৃদয়েই প্রণয় সঞ্চারিত হইবেই। প্রেম সম্পূর্ণ সাবজেক্টিভ ব্যাপার। রজনী তাই বলিতেছে—

"অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখনও যাইতে পারে না—সেখানেও রত্নপ্রভাবিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জাগে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না।

"রূপ রূপবানে নাই, দর্শকের মনে। নইলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? একজনে সকলেই আরক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।"

এইগুলিকেই বঙ্কিম মানসিক তত্ত্ব বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য এইগুলির প্রতিপাদনই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়—এইগুলি তাঁহার পরিকল্পিত অন্ধ নায়িকার অন্তরে স্বভাবতই প্রতিভাসিত হইবার কথা।

রজনীর প্রাণের বেদনা রজনী নিজেই বলিয়া গিয়াছে—এই বেদনা এমনই ভঙ্গিতে বঙ্কিম প্রকাশ করিয়াছেন যে উহা লিরিকের মত চমৎকার হইয়াছে। আত্মকথার ভঙ্গিতে প্রকাশিত না হইলে ইহা লিরিক্যাল মাধুর্য লাভ করিত না।

রজনী তাহার আত্মকথা পরিহাস-রসিকতার ভঙ্গীতেও ব্যক্ত করিয়াছে—বেদনা প্রকাশের সচরাচর ভঙ্গী ইহা নয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—রজনী যদি জ্ঞান হওয়ার পর চক্ষু হারাইত তাহা হইলে চক্ষুর মর্যাদা বুঝিত এবং দৃষ্টি না থাকায় গভীর বেদনা অনুভব করিত। কিন্তু সে জন্মান্ধ তাই সে নিজের অন্ধতা লইয়া পরিহাস করিতে পারিয়াছে; একথা সত্য নয়। বেদনা গভীর হইলেই এই ব্যঙ্গপরিহাসের ভঙ্গি আপনা হইতেই আসে। এ পরিহাস নিজের অদৃষ্ট লইয়া, এ পরিহাস বিধাতার উদ্দেশে—এ পরিহাস মানবসমাজের উদ্দেশে—হৃদয়ের দারুণ বিদ্রোহ—দারুণ অভিমানই এই ব্যঙ্গপরিহাসের রূপ ধরে। এই ভঙ্গীর প্রবর্তন বঙ্কিমের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, গভীর সহানুভূতি ও অসাধারণ মনীষার ফল।

রজনীর বেদনা এত গভীর কেন? সে দেখিতে পায় না, কিন্তু লোকমুখে শুনে; —অপূর্ব এ বিশ্ব, এ বিশ্ব যে না দেখিল তাহার মত হতভাগ্য আর নাই। চক্ষু না থাকায় সে অসহায়, পরনির্ভর, কৃপার পাত্র। লোকের করুণা তাহার মনে বেদনার সঞ্চার করে। দরিদ্র বলিয়া সে আরও অসহায়, তাহার রূপযৌবন তাহার অসহায়তাকেই বাড়াইয়াছে। অন্ধ বলিয়া সে অনেকের কাছে অনাদৃত। সব চেয়ে বড় দুঃখ, দৃষ্টিহীনা বলিয়া প্রকৃতি তাহাকে ক্ষমা করে নাই। তাহার প্রাণেও ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার প্রবৃত্তি

উন্মেষিত হইতেছে। সে অন্ধ, তাহার অনুরাগের সার্থকতালাভ কি করিয়া হইতে পারে? সে অনুভব করে—

"বোবার কবিত্ব কেবল যন্ত্রণার জন্য, বধিরের সংগীতানুরাগ যদি হয় তবে কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি সে শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য।"

অন্ধ বলিয়া রজনীর অন্তরে প্রণয় সঞ্চার হইবে না ইহা ত স্বাভাবিক নয়। অন্ধ বলিয়া তাহার আত্মপ্রত্যয়, তেজস্বিতা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, ত্যাগশক্তি, হৃদয়ের বল এবং নারীত্বের মর্যাদাবোধ থাকিবে না এমন ত কথা নয়। রজনীর এই সমস্তই ছিল। এই সমস্ত গুণেই সে অমরনাথকে বশীভূত করিয়াছিল। অমরনাথ রজনীর বিষয়ও চায় নাই, রূপও চায় নাই। অমরনাথ বলিয়াছে, 'রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন, লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান।'

এমন একটা নম্র দীনতা রজনীর চরিত্রের অংগীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও তাহার যায় নাই। যে লবঙ্গলতা একদিন 'ঝাঁটা মারিয়া' রজনীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিয়াছিল সেই লবঙ্গলতার চরণ ধরিয়া রজনী তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। যখন সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, তখনও সে জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিয়া থাকিত। লবঙ্গলতার সঙ্গে সে লজ্জায় কথা বলিতে পারিত না। এই স্বভাবগত বিনয়াবনতির সহিত নিঃস্পৃহতা তাহার চরিত্রে একটা অপূর্ব শ্রী দান করিয়াছিল। দারিদ্র্যাবস্থায় যে তেজটুকু সে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পোষণ করিত, লক্ষ্মী যখন সে মর্যাদা রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন সে সে-তেজটুকুও বর্জন করিল! তাহার চরিত্রের মহনীয়তাটুকু অমরনাথ ছাড়া কেহ বুঝে নাই। বোধ হয় শচীন্দ্রও মনে মনে বুঝিয়াছিল।

অন্ধ বলিয়া তাহার প্রণয়জীবনে দ্বন্দ্বসমস্যার আবির্ভাব হইবে না কেন? একদিকে অমরনাথ তাহার জীবনদাতা, নারীমর্যাদার ত্রাণকর্তা, লাঞ্ছিত অনাদৃত নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থা হইতে উদ্ধারকর্তা, অন্যদিকে তাহার প্রেমাস্পদ শচীন্দ্র তাহার পাণিপ্রার্থী। অসহায় অন্ধ রজনীর পক্ষে ইহা দারুণ সমস্যা।

বঙ্কিমের মানসকন্যা রজনী নিজগুণে ও অসহায় অন্ধতার জন্য তাঁহার করুণা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্কিমের এই করুণাই রজনীকে বিপদ সংকটের মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া লইয়াছে, এই করুণাই তাহাকে বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়াছে। এই করুণাই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির রূপ ধরিয়া শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি প্রণয় সঞ্চার ঘটাইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত রজনীর মৌনমূক নারীহৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমের মর্যাদাকে রক্ষা করিয়াছে। এই করুণাই অমরনাথের অসাধারণ ঔদার্যের ও ত্যাগগৌরবের রূপ ধরিয়া রজনীর জীবনের দ্বন্দ্ব-সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়—বঙ্কিম যে আপনার শিল্পিজনোচিত বাস্তবনিষ্ঠতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াও তাহাকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন তাহাও তাঁহার করুণারই ফল।

যে কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টির জন্য বঙ্কিম শরৎচন্দ্রের এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও পথিপ্রদর্শক—লবঙ্গলতা তাহাদের মধ্যে একটি। এই চরিত্র অংকনে বঙ্কিম অদ্ভুত মনীষা, উদারতা ও শিল্পিজনোচিত হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালীর বহু সম্বন্ধজটিলায়িত বিচিত্র-বন্ধন পারিবারিক জীবনে যে অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধমাধুর্য বাঙ্গালার আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যে একটি সম্পদ দান করিয়াছে তাহার পূর্বাভাস পাই এই চরিত্রে। লবঙ্গলতা সত্যই ভালবাসিত অমরনাথকে। তেজস্বিনী লবঙ্গলতা অমরনাথকেই চাহিয়াছিল কিন্তু তাহা সগৌরবে। অমরনাথ চোরের মত তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রেমিকের অনুচিত কার্য করিয়াছিল—তাহার দন্ড সে না দিয়া পারে নাই। সে প্রণয়ীকে চাহিয়াছিল—সমাজশাসিত সহজ সরল পথে—সে বক্রপথে চোরকে চায় নাই।

অমরনাথকে লবঙ্গলতা দন্ড দিল, কিন্তু তাহাকে ভুলিল না। তাহার সম্বন্ধে পিতা যাহা ব্যবস্থা করিলেন তাহা অমরনাথকে ভুলাইতে পারে নাই, কিন্তু লবঙ্গলতা নিজে ভুলিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিল—এবং ভুলিলও। লবঙ্গলতা আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া আপনার বৃদ্ধ স্বামীকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইল। প্রচন্ড চেষ্টা করিয়া সে আপনাকে স্বামীর মধ্যে ডুবাইয়া দিল—সাপত্ন্য দুঃখকে নিজগুণে বরণ করিয়া লইল। কেবল তাহাই নয়, সন্তানহীনা লবঙ্গলতা নিজের সম-বয়স্ক সপত্নীপুত্রের মা হইয়া উঠিল। অনবরত মাতৃত্বের অভিনয় করিয়া সত্যসত্যই সে জননীর পদবীতে আরোহণ করিল। এপথ অত্যন্ত দুরারোহ, কিন্তু এমনই তাহার মনের তেজ ও কল্পনার বল যে—শচীন্দ্র তাহার কাছে দ্বাদশবর্ষীয় বালক হইয়া পড়িল, নিজের বয়সও সে ১৫ বৎসর বাড়াইয়া লইল। ইহা এক প্রকারের সাধনা—নারীত্বের তপস্যা। তাহার বধূজীবন ব্যর্থ হইয়াছিল—কিন্তু গৃহিণী জীবন সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। ইহাও নারীত্বের এক প্রকারের সার্থকতা। বর্তমান যুগের সমালোচক বলিবেন—ইহা দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানো। বঙ্কিম তাহা মনে করেন নাই।

লবঙ্গলতার অসাধারণ মানসিক বল অমরনাথকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। অমরনাথ বলিতেছে—"লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহৈশ্বর্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে, তবু সেই সুখময় হাসি। যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে তাহারই গৃহে রহিতেছে—তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি। অথচ আমি জানি লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই। সে নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞা-দায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল—রজনী, তুই এখন আর কোথাও যা। লবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।"

আদর্শ প্রচার করিতে গিয়া কি বঙ্কিম লবঙ্গলতা চরিত্রকে অস্বাভাবিক করিয়াছেন? কখনই না। লবঙ্গলতা এমন নিরাপদ নিশ্চিন্ত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে যে, সে অনায়াসে অমরনাথের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে সুস্থ চিত্তে আলাপ করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে ভালবাসার জোর ছিল বলিয়া লবঙ্গ অমরনাথের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে, তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে। তাহাকে চরম ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পায়ে ধরিয়া

কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে। শেষে অমরনাথের সঙ্গে তাহার কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়—বঙ্কিম লবঙ্গকে একটা নির্জীব আদর্শ করিয়াই সৃষ্টি করেন নাই। লবঙ্গ বলিতেছে—"এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—" এই বলিয়া লবঙ্গ বাক্য শেষ করিতে পারিল না। লবঙ্গ মুখে বলিল—"লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি সে স্নেহও কখন হইবে না"—কিন্তু লবঙ্গ কাঁদিতে লাগিল।

মনে হইতে পারে অমরনাথকেও বঙ্কিম একটি নির্জীব অস্বাভাবিক আদর্শরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ভাল করিয়া রজনী অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে তাহা নয়। অমরনাথ গোড়া হইতেই উদাসী প্রকৃতির লোক। সে লবঙ্গকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার সহিত তাহার বিবাহ হইল না তাহাতে সে ভগ্নহৃদয় হইল। তারপর সে সাময়িক উত্তেজনায় একটা বড় লজ্জাকর অপরাধ করিয়া ফেলিল। তাহার জন্য সে প্রণয়িনীর হাতেই দণ্ডিত হইল। লজ্জায় সে সমাজে মুখ দেখাইল না, সে হইল ভবঘুরে।

লবঙ্গকে সে ভালবাসিত কিন্তু সে দণ্ডের প্রতিশোধ লইতেও ছাড়িল না। যে সম্পত্তি লবঙ্গ ভোগ করিয়া দর্পিতা—সেই সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণীকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল। ফলে, সেই লবঙ্গলতাকে অমরনাথের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে হইল। অমরনাথ রজনীর রূপে মুগ্ধ হয় নাই, বৈভবের জন্য তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই—সে মুগ্ধ হইয়াছিল রজনীর চরিত্রে। রূপে বা বিভবে মুগ্ধ হয় নাই বলিয়াই সে রজনীকে ছাড়িয়া দিল। লবঙ্গকে সম্পত্তিচ্যুত করিতেও অমরনাথের ইচ্ছা নয়, লবঙ্গকে পায়ে ধরাইয়াই অমরনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। রজনী যখন লবঙ্গকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে চাহিল, তখন অমরনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সেই সঙ্গে রজনীর চরিত্রের চরমোৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। বিষয়সম্পত্তি ভোগের কোন বাসনাই তাহার মনে ছিল না। লবঙ্গ যাহাকে ভালবাসিত তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছে। প্রেমের এই 'অহেরিব গতির' বক্র-রীতি বঙ্কিম এই দুইজনের চরিত্রে দেখাইয়াছেন। অমরনাথ বিভবও চায় না, যাহা চায় তাহা দুর্লভ। সে লবঙ্গের মনের স্মৃতিলোকে একটু ঠাঁই চাহিয়াছিল। সে শুনিল তাহারও কোন আশা নাই।

হতাশ প্রেম চরিত্রকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করে, মনে হয় পুরুষ যেন মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে—কাপুরুষ ভীরু যেন বীর হইয়া উঠিয়াছে। যে অমরনাথ একদিন হীন কাপুরুষের কাজ করিয়াছিল সে একজন ত্যাগবীর হইয়া উঠিল। তাহার নৈতিক বল এমনি বাড়িয়া গেল যে লবঙ্গ যখন শাসাইল তাহার গোপন কথা রজনীকে বলিয়া দিবে, তখন অমরনাথ বলিল—সে কথা আমি নিজেই বলিব। অমরনাথ রজনীকে নিজের অপরাধের কথা নিজেই বলিল।

রজনীর শ্রদ্ধা তাহাতেও বিচলিত হইল না, কিন্তু সে সেই সঙ্গে শুনিল অন্ধ রজনীও শচীন্দ্রকে আগে হইতেই আত্মদান করিয়াছে। একবার রূপমুগ্ধ প্রেম নৈরাশ্যে অবসিত হইয়াছে, এবার গুণমুগ্ধ প্রেমও সেই দশাই পাইল। অমরনাথ ইচ্ছা করিলে এক্ষেত্রে রজনীকে বিবাহ করিতে পারিত। রজনীর পক্ষ হইতে কোন বাধা ছিল না। রজনীর

পাতিব্রত্য কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইবে সে আশঙ্কাও ছিল না। তবু যে হৃদয় অপরকে নিবেদিত, তাহা লইয়া অমরনাথ সংসারী হইতে চাহিল না। সে তখন নিজের সম্পত্তিও রজনীকে দিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেল অভিমানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া—তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া। প্রেমের পরিণতি নৈরাশ্যজনক হইলে মানুষ প্রাণও বিসর্জন করে। অমরনাথ প্রাণ রাখিয়া সম্পত্তির মায়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। ঔদাসীন্য তাহার চরিত্রগতই ছিল, মজ্জাগত উদাসভাব তাহাকে পথে বাহির করিল।

শচীন্দ্র সহৃদয় দয়ালু শিক্ষিত যুবক। রজনীর প্রতি তাহার করুণা ছিল যথেষ্ট। শচীন্দ্র রজনী সম্বন্ধে বলিয়াছে—

"রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত. মুখকান্তি গম্ভীর, গতি অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির, এবং অন্ধতাবশতঃ সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক, হাস্যদুঃখময় সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন কারুকার্যপটু শিল্পকরের যত্নলিখিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।

"সৌন্দর্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে—বোধ হয় সে মূর্তি সহজে ভুলিবেও না; কেন না সে স্থির গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে পঞ্চবাণ বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।"

ইহাতে বুঝা যায়--পঞ্চবাণের ব্যাপার লইয়াই যে ব্যস্ত নয় এমন প্রকৃতির লোকের বা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-পরিতোষের জন্য যে নারীরূপ খুঁজে না, এমন লোকের পক্ষে রজনীর প্রতি অনুরাগ জন্মানো অসম্ভব ব্যাপার নয়। শচীন্দ্রকে সে প্রকৃতির লোক মনে করা যাইতে পারে। শচীন্দ্রের মন রজনীর প্রতি বিরূপ ছিল না, তাহার চরিত্রমাধুর্যও তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে যে ইতর লোকের কন্যা, ইহাই ভদ্রপরিবারে তাহার বিবাহ হওয়ার একটা বাধা—সে মনে করিত। শচীন্দ্র তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। "যাহাকে নিজে বিবাহ করিতে না পারি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।" ইহা শচীন্দ্রের উক্তি।

তারপর দেখা গেল রজনী ইতর লোকের কন্যা নয়, যে বিষয় তাহারা ভোগ করে তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রজনী। যাহাকে এতদিন উপেক্ষা করিয়া কৃপা করিয়া দয়ার দানে পালন করিয়া আসিয়াছে তাহারই অর্থে মিত্রপরিবার এতদিন বড়মানুষি করিয়া আসিয়াছে। ইহার উপর লবঙ্গলতার পীড়াপীড়ি। এই বিষয় ছাড়িয়া দিলে অর্থাৎ রজনীকে বিবাহ না করিলে সমস্ত পরিবার নিঃস্ব নিঃস্বম্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ সমস্যার মধ্য দিয়া শচীন্দ্রের মনকে যাত্রা করিতে হইয়াছে। স্বভাবতই শচীন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে বিবাহের বাসনা জাগিতে পারে, ক্রমে ক্রমে রজনীর রূপগুণের চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে অনুরাগও জন্মিতে পারে।

সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগের ব্যাপারটার আবির্ভাব না হইলেও চলিত বোধ হয়। শচীন্দ্রের পক্ষে রজনীকে বিবাহ করিতে রাজী হওয়াই যথেষ্ট, তাহাকে প্রেমে পাগল না করিলেও গ্রন্থের মূল ব্যাপারে কোন ক্ষতিই হইত না। বঙ্কিম নিজে বিশ্বাস করিলেও বিশ্বাস্যতা প্রমাণের জন্য তাঁহাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারটাকে বর্জন করিলেও গ্রন্থের কোন ক্ষতি হইত না। টাকার জন্য লোকে কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করে—বিষয় সম্পত্তির জন্য কানা খোঁড়াকেও বিবাহ করে, এক্ষেত্রে শচীন্দ্রকে খুব বেশী আত্মত্যাগ করিতে হয় নাই। যে সম্পত্তি নিজের মনে করিয়া সে এবং তাহার পরিজনগণ ভোগ করিয়া আসিয়াছে, যে সম্পত্তি চলিয়া গেলে সকলে পথের ভিখারী হইবে, সে সম্পত্তি রক্ষার জন্য, মাতা পিতার মুখ চাহিয়া পরিজনগণের পীড়াপীড়িতে এবং যে রজনীকে রূপেগুণে তাহার অনিন্দনীয়া বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাকে বিবাহ করিতে শচীন্দ্র যদি রাজী হয় তবে তাহাতে অস্বাভাবিকতা কি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ শচীন্দ্র পূর্ব হইতে অন্য কাহাকেও ভালবাসে নাই। বিবাহের পর সংসারে যেমন পতিপত্নীর গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহাই হইতে পারিত। রজনী চক্ষু ফিরিয়া না পাইলেই বা কি ক্ষতি ছিল? শচীন্দ্র সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হীরালালের চরিত্র এক শ্রেণীর সুরাসক্ত অপদার্থ বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতিনিধি। শচীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গর্ভধারিণীকে বঙ্কিম অন্তরালেই রাখিয়াছেন, তাহাদের আবির্ভাব ঘটাইলেই অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইত। সেই জটিলতা এড়াইবার জন্য তাহাদিগকে আখ্যায়িকার মধ্যে টানিয়া আনেন নাই।

রজনীতে পাত্রপাত্রীর জবানিতে কয়েকটি তত্ত্ববিচার আছে ইহা বঙ্কিমের নিজস্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—

১। দুঃখ কি? মনের অবস্থা সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ দুঃখ পরের হাত না নিজের হাত? পর কেবল বহির্জগতের কর্তা, অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন? জড়জগৎই জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টি সামগ্রী আছে? আমার অন্তরে কি তাহা নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে তোমার বাহ্যজগতে দেখাইতে সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, বাহ্যজগতে তেমন কোথায়?'

ইণ্টেলেক্‌চুয়াল সাব্‌জেক্‌টিভিটির ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

২। যশঃ? এ পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নয়। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ, শেক্ষপীয়রকে ভলটেয়ার ভাঁড় বলিয়াছেন। যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়েরই বিচারক নয়, কেন না সাধারণ লোক মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ?

[ইহা বঙ্কিমের নিজেরই প্রাণের কথা। বঙ্কিমের মানসিক আভিজাত্য ইহাতে সূচিত হয়।]

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে মানিলে সুখী হই? রাজদরবারের মান যে কেবল দাসত্বের চিহ্ন এই বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি (ইহাও বঙ্কিমের প্রাণের কথা)। মান চাহি কেবল আপনার কাছে। [অর্থাৎ আত্মসম্মানবোধই প্রকৃত মানপিপাসার নিবৃত্তি করিতে পারে।]

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখনও বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে না। বিদ্যা? ইহার অভাবে কেহ কখনও আপনাকে অসুখী মনে করে নাই।

ধর্ম? লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই ধর্মের অভাবই দুঃখ।

এইরূপ তত্ত্ববিশ্লেষণ রজনীতে কিছু কিছু আছে। সন্ন্যাসীর সহিত শচীন্দ্রের আলোচনা আত্মা, মন ও শরীরের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বিচার আছে। বঙ্কিম প্রসঙ্গক্রমে শেকস্‌পীয়র, টাসিটাস, প্লুটার্ক, থুসিদিদিস, কোমত, মিল, হাকসলি, ডারউইন, বেকন, বুকনেয়ার ও সোপেনহায়ার ইত্যাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পাণ্ডিত্য প্রকাশ বঙ্কিমের উদ্দেশ্য নয়, পরিকল্পিত চরিত্রের সহিত যতটুকু সামঞ্জস্য ঘটে, তাহার বেশি পাণ্ডিত্য বা তত্ত্বকথা এ পুস্তকে নাই। পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, বরং পাণ্ডিত্যপ্রকাশের লোভসংযমনের জন্য বঙ্কিম বড় আর্টিষ্ট। রজনীর ২।১টি চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি অনেক আহৃত বিদ্যা চালাইতে পারিতেন। আজকালকার বিলাতি উপন্যাসে তাহাই করে। কিন্তু বঙ্কিম কখনও ভুলিতেন না, তিনি উপন্যাস রচনা করিতে বসিয়াছেন, উপন্যাসের দোহাই দিয়া পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিতে বসেন নাই। তাঁহার এই লোভসংবরণই চরিত্রগত সংযমের যেমন লক্ষণ, শিল্পীর মনোবৃত্তিরও তেমনি লক্ষণ। অমরনাথের চরিত্রবিশ্লেষণ করিলে যেটুকু বোধাত্মক ভাবতান্ত্রিকতা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সেইটুকুই পাই, তাহার বেশি নয়।

শ্রীকালিদাস রায়

কৃষ্ণকান্তের উইল : (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালায় লিখিত সপ্তম উপন্যাস ও ইহাতে তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যের এক পর্যায় শেষ হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার বাঙ্গালায় রচিত প্রথম উপন্যাস—উহাতে প্রথম সৃষ্টির অনিবার্য দৌর্বল্য সপ্রকাশ। ইহাকে কেবল বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম বলিলেই সব কথা বলা হয় না। ইহাকে বাঙ্গালায় প্রথম সুসংবন্ধ, ঘটনাবহুল, বহুচরিত্রপূর্ণ উপন্যাস বলিতে হয়। ইহার ভাষাও পূর্ববর্তীদিগের ভাষার ধারা ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের ('টেকচাঁদ ঠাকুরের') কথায় বঙ্কিম-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন, লৌকিক ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন "সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কারপ্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। তাহা উপন্যাস হইলেও কাব্য। তাহার ভাষা কাব্যের উপযোগী; কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইতেছে।

তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'। ইহার ভাষা সরল এবং আরও সবল। যে ভাষা তাহার পরে আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে সঙ্কুচিত, রোষে বিক্ষুব্ধ, ঘৃণায় বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, স্নেহে বিগলিত, ভালবাসায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, 'মৃণালিনীতে' তাহার বিকাশারম্ভ।

ইহার পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ আরম্ভ করেন—তাঁহার সম্পাদনায় তাহাতে ধারাবাহিকরূপে পর পর কয়খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'বঙ্গদর্শনের' চতুর্থ ভাগ (১২৮২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পরেই বঙ্কিম-চন্দ্র তাহার সম্পাদনভার ত্যাগ করেন। সেই খণ্ডে অগ্রহায়ণ মাসে 'রজনী' সমাপ্ত ও পৌষ মাসে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ আরম্ভ হয়। পৌষ সংখ্যায় প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদ, মাঘ সংখ্যায় পরবর্তী তিন পরিচ্ছেদ এবং ফাল্গুন সংখ্যায় নবম পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হয়। এক বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রকাশিত হইলে তাহাতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ শেষ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) 'প্রচারে' বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' লিখিয়াছিলেন :—

"যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য

নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত ('সীতারামের' কতকাংশ 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়) উপন্যাসের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন—কোথায়ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তাঁহার এই উপদেশের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে কয়টির উল্লেখ করিতেছিঃ—

(১) তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা প্রথমে রোহিণীকে দেখিতে পাই—"সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।" কিন্তু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহার "হাতে বালা", সপ্তম পরিচ্ছেদেও তাহাই।

(২) চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—কৃষ্ণকান্ত দেরাজে উইল রাখিয়াছিলেন। সেই দেরাজ হইতেই রোহিণী তাহা চুরি করিয়াছিল এবং পরে তাহাতেই আবার আসল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পূর্বে গোবিন্দলাল তাঁহার নির্দেশে দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, রোহিণী মনে করিয়াছিল "কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন।" সিন্দুকে উইল কখন রক্ষিত হয় নাই।

(৩) রোহিণী যে জাল উইল অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা কোথায় ছিল?

(৪) প্রথম পরিচ্ছেদে আছে—"কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম হরলাল; কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল; কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা. আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।" আর—কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতা "রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল।" গোবিন্দলালের যে কোন ভগিনী ছিলেন, এমন উল্লেখ কোথাও নাই। উল্লেখের কোন প্রয়োজনও হয়ত প্রথমে ছিল না। কিন্তু কয় স্থানে তাঁহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিবার বিষয়; যথা, যখন গোবিন্দলালের নাম রোহিণীর নামের সহিত রটনায় গুঞ্জরিত হইয়াছিল, যখন গোবিন্দলাল জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিল অথচ ভ্রমরকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনা হইল না; তাঁহার অনুপস্থিতি সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়—জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধকালে। বাড়ীর কন্যার সে সময়ে অনুপস্থিতি স্বাভাবিক বলা যায় না। গোবিন্দলালের মাতা যখন কাশীবাসে গমন করিবেন, স্থির করিলেন, তখন ভ্রমর তাড়াতাড়ি পিত্রালয় হইতে "আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, 'মা আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসারধর্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।' শাশুড়ী বলিলেন, 'তোমার বড় ননদ রহিল। সে-ই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" এই ননদ যে কৃষ্ণকান্তের

একমাত্র কন্যা শৈলবতী তাহাই মনে হয়। শৈলবতীকে কৃষ্ণকান্ত যখন এক আনা সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গিয়াছিলেন, তখন হয়ত তিনি পিত্রালয়েই থাকিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাহার ভাগিনেয় শচীকান্ত পাইয়াছিল—তাহাতে মনে হয়, রামকান্তের কন্যাও ছিলেন। কাশীবাসে যাইবার সময় গোবিন্দলালের মাতা যে "বড় ননদের" কথা বলিয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার কার্যের কোন পরিচয় আমরা পাই না।

আরও একজনের কার্যের অনুল্লেখ উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষ্ণকান্তের পত্নী। কৃষ্ণকান্ত বড় জমিদার ছিলেন—সহোদর রামকান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামেই জমিদারী ক্রয়ে আপত্তি করেন নাই—এমন কি পুত্র গোবিন্দলালের জন্মাবধি সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধে বিভাগ-বাসনা মনে পোষণ করিয়াও মুখে সে কথা বলিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকান্তের সংসারে বহুলোক—তাহার পরিচয় দাসীর সংখ্যাধিক্যেই সপ্রকাশ। সে সময়—একান্নবর্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের পত্নীর—"বড় গৃহিণীর" স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান থাকিবার কথা। আর এক কারণে সে স্থানের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছিল, মনে করা যায়। "গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন"—এ-কথা লেখক সুস্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন। সেই জন্য সংসারে কৃষ্ণকান্তের পত্নীর প্রভাব ও প্রতাপ আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই না। এমন কি গোবিন্দলালের মাতা কাশীযাত্রা কালে "বড় ননদের" উল্লেখ করিলেও তাঁহার যাত্রার সময়—"দিদির" কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বর্তমানে ভ্রমর একান্নবর্তী পরিবারে গৃহিণীর কাজ করিতে পারা, সে সময়ে, সম্ভব ছিল না।

এই অনুল্লেখের কারণ হয়ত এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসখানিকে যথাসম্ভব বাহুল্য-বর্জিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে—ইংরেজীতে যাহাকে "ক্রাইশিস" বলে অর্থাৎ যে সকল সঙ্কটপূর্ণ স্থানে ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাইবে, তাহার উপর গল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—তাহার বাহুল্য। সেই জন্য যাঁহাদিগের সহিত বর্ণিত ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সুস্পষ্ট নহে, তাঁহাদিগের জন্য স্থানদান করা হয় নাই।

"বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে" ('সাধনা'—তৃতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—"স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে নিজের মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, 'কৃন্তকান্তের উইল' তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।" অবশ্য ইহা উপন্যাসসমূহের কথা।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে পর্যায়ের শেষ, তাহাকে সৌন্দর্যসৃষ্টির পর্যায় বলা যায়। ইহার পরে তিনি 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' রচনা করেন এবং 'রাজসিংহ' পরিবর্ধিত করিয়া নূতন উপন্যাস রচনা করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' সম্বন্ধে মনীষী অরবিন্দ ঘোষ লিখিয়াছেন—'ধর্মতত্ত্বে' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ ও নানাভাবে ব্যক্ত কর্মযোগের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেই কর্মযোগের সর্বপ্রধান পরিণতি—দেশের ও দশের সেবা। 'আনন্দমঠে' সেই কর্মযোগের আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে তাহার সাধনার প্রদ্ধতি প্রদর্শিত

হইয়াছে। তিনি নির্ভীক শক্তির বা বলের প্রয়োজন বুঝাইয়া দেখাইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে নৈতিক বলের প্রয়োজন। 'সীতারামে'-ও দেশাত্মবোধের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি ইতিহাসের অনুরক্ত ছিলেন—সেইজন্য তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাস চতুষ্টয়েও ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব পাওয়া যায়। 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই তিনখানি তাঁহার পূর্ণ গার্হস্থ্য উপন্যাস—সেগুলিতে সমসাময়িক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আছে এবং সেগুলিতে মানুষের—নরনারীর—চরিত্রে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশই রচনার উদ্দিষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('দি ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট ম্যাগাজিন্'—মে, ১৮৯৪ খৃঃ) যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী সৌন্দর্যপ্রিয়—কিন্তু সে সৌন্দর্য কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নহে। তিনি তাঁহার উক্তির প্রমাণে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিত। কিন্তু কে তাঁহাকে পাইয়াছিল? যে অধিক সুন্দরী সে-ই তাঁহাকে পাইয়াছিল। কিন্তু এ সৌন্দর্য শারীরিক সৌন্দর্য নহে; সূর্যমুখীর শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতে নহে—মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্যে। তেমনই ভ্রমর ও রোহিণী উভয়েই গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমরই তাহাকে পাইয়াছিল, কারণ ভ্রমরের দেহের বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও তাহার নৈতিক সৌন্দর্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা অর্থাৎ স্বামীর প্রতি ভালবাসা রোহিণীর মত চরিত্রের নারীর পক্ষে সম্ভব নহে; তাহার শারীরিক সৌন্দর্য থাকিলেও তাহার চরিত্র অতি হীন। শাস্ত্রী মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সৌন্দর্যের আদর্শেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমের আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই প্রেম মানব-চরিত্রের সকল বৃত্তির বিকাশ-সমন্বয়।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের পরে পরিবর্তনে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থখানি ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়—পরে কেবল ক্ষুদ্র "পরিশিষ্ট" ছিল। কিন্তু "পরিশিষ্টের" কোন সার্থকতা ছিল না। কারণ, তাহার পূর্বেই উপন্যাস শেষ হইয়াছিল :—

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

"পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়—প্রথম খণ্ড ঘটনাবহুল, একত্রিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত; দ্বিতীয় পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—কোন কোন পরিচ্ছেদে এক এক বৎসরের ঘটনা বিবৃত—ঘটনা না বলিয়া মনোভাব

বলিলেই সঙ্গত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের নয়টি পরিচ্ছেদ ঘটনাবহুল। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে পাদটীকায় ছিল :—

"* * অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' * * * কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরের মৃত্যুর পরে বারুণীর সলিলে নামিয়া আত্মহত্যা করিত, তবে তাহার সে কার্য কখনই তাহার সমগ্র জীবনের কার্যের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন হইত না। কেন হইত না, তাহা গোবিন্দলালের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিব। সে গৃহত্যাগ করিল। তখন সে প্রকৃতিস্থ। তাহার পর—ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সে আবার হরিদ্রাগ্রামে দেখা দিল। তখন সে সন্ন্যাসী; কিন্তু সে বলে—সন্ন্যাসেই শান্তি লাভ করা যায় না। সে হিন্দু-সমাজের সংস্কারানুসারে দ্বাদশ বৎসর পরে জন্মভূমি দেখিতে আসিয়াছিল। সে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি পুনর্গ্রহণ জন্য ভাগিনেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল, বলিল,—

"বিষয়-সম্পত্তি অপেক্ষা যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। * * * ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনি আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

ভারতবর্ষের সাহিত্যের বিদেশী ঐতিহাসিক (ফ্রেজার) 'বিষবৃক্ষের' পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"Here the true workings of the novelist's mind are apparent ; a deeper vein is touched. The love of the erring husband for his wife, and the rival love by which he is infatuated, typifies a struggle between the Divine love and the ever-recurring phantasmal attraction of the soul to the objects of sense, from which freedom can only be reached by centring the mind on ideal perfections."

গোবিন্দলালের ভ্রমর-প্রেমের সহিত তাহার মোহমুগ্ধ মনের রোহিণী-প্রেমের দ্বন্দ্ব দিব্য প্রেমের সহিত মানুষের মনের পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণের দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব হিন্দুর বহু পুস্তকে রূপকরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই দেশেই গৌতমবুদ্ধ ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দেখিয়া নির্বাণের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষ-মার্গের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। সাধনার নানা পথ এ দেশে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' নিপুণ-শিল্পীর অসামান্য সৃষ্টি বলিয়াই ইহা বৃহৎ গ্রন্থ না হইলেও ইহাতে ঘটনার যেমন বাহুল্য—বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টিতে ইহা তেমনই বিস্ময়কর। চিত্রগুলির

মধ্যে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী—এই তিন জনের চিত্র যথাযথ বর্ণে অঙ্কিত; আর কতকগুলি রেখাচিত্র—কিন্তু রেখায় চিত্রগুলির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হইয়াছে।

এই পুস্তকে সমসাময়িক ঘটনার ও সমাজে তখন যে সকল আলোচনা স্ফূর্ত হইতেছিল, সে সকলের প্রভাবও লক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজ পূর্বে কখন অচলায়তন ছিল না—তাহা যে কালোপযোগী পরিবর্তন সাগ্রহেই প্রবর্তিত করিত তাহার প্রমাণ—সংহিতাকারদিগের কার্যে সপ্রকাশ; মনুসংহিতা যে সময়ের সমাজের প্রয়োজনে তাহার উপযোগী ব্যবস্থাসংগ্রহ, পরাশরের স্মৃতি তাহা নহে। সমাজের প্রয়োজনে কালোপযোগী পরিবর্তন পরিগৃহীত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাবে ধর্মচক্র আবর্তিত করেন—তিনি এ দেশে নূতন ধর্মমত প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; শঙ্করাচার্য আবার সেই মতের খণ্ডন করিয়া শৈবধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত করেন। সে সকল অতি স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছিল। বহু জাতি হিন্দুসংস্কৃতির ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শেও আপনাদিগের সংস্কার ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে বিদেশীর বিজয় বাত্যায় বিপন্ন হিন্দুকে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। তখনই যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞ মেন বলিয়াছেন—সঙ্গত ব্যবস্থা অসঙ্গত ব্যবস্থার উদ্ভব করে—"Usage which is reasonable, generates usage which is unreasonable." হিন্দু সমাজেও তাহাই হইয়াছিল—সমাজ পরিবর্তন মাত্রকেই পাপ বলিয়া মত প্রকাশ করিতে থাকে। সেইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন হিন্দু বিধবার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়া—বিদেশী শাসকদিগের আইনের দ্বারা তাহা স্বীকার্য করিবার প্রয়াস করেন, তখন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিক্ষোভ-পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' পাওয়া যায়—সে পরিচয়ে আলোচনা ছিল; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' হরলালের—পিতাকে লিখিত—পত্রে তাহার পরিচয় আছে। আর গ্রাম্যবালা রোহিণী যে বলিয়াছিল—বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত "তা ত এখন লোক বলিতেছে"—তাহাতে বুঝায়, সে বিষয়ের আলোচনা তখন অন্তঃপুরেও উপনীত হইয়াছিল। .যে সকল উপায়ে তখন সংবাদ ও মত প্রচার পাইত, গ্রাম্য-গীত, ছড়া প্রভৃতি সে সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য-গীত শ্রুত হইত—

"বেঁচে থাক, বিদ্যাসাগর, চিরজীবী হয়ে" ইত্যাদি।

ধূর্ত, দুষ্ট হরলাল স্বকার্য সাধনপ্রয়াসে রোহিণীর মনে যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা উর্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়া যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফল দেখিয়া "কৃষ্ণকান্তের উইলে" পাত্রবিশেষে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মতের কোন আভাস পাওয়া যায় কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সময় সময় যেমন একটি ঘটনায় তেমনই একটি কথাতেও অনেক কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' যে সময়ের ঘটনা লইয়া রচিত, তখনও অনেক পুরাতন আচারের মত পুরাতন প্রথা বর্তমান। কৃষ্ণকান্তের গৃহে বহু দাসীর অবস্থিতি সে সকলের অন্যতম। তখন ধনীর গৃহে বহু অনাথা স্থান পাইত; সেই আশ্রিতারা যে ব্যবহার পাইত, তাহা তাহাদিগের সহিত ভ্রমরের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়। "চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না; তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তা'তে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী, ননদ ছিল; তারপর ভ্রমর আবার নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিল না।" দাসীদিগকে ঝি বলাই রীতি ছিল। ঝি—কন্যা। সেই জন্য ননন্দাকে ঠাকুরঝি অর্থাৎ শ্বশুরের কন্যা বলা হইত—এখনও হয়। গ্রামের বধূরা ঘোম্‌টা দিত—তাহা "বহুড়ী" সাজ; আর গ্রামের কন্যারা তাহা দিত না—তাহা "ঝিয়াড়ী" সাজ। আমাদিগের সময়ে দেখিয়াছি—পূর্বোক্ত প্রথার অবশেষ ছিল। আমাদিগের কোন সতীর্থ মফঃস্বলের বড় জমিদারের পরিবারের লোক ছিলেন, তাঁহার পিতা ও পিতামহ "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন। কথায় কথায় যখন আমরা জানিতে পারি, তাঁহার পিতামহী স্বতন্ত্র গৃহে বাস করেন। কারণ, তাঁহার দাসীর সংখ্যা প্রায় দুই শত। তাহা লইয়া আমরা অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা বুঝিতে পারিব না বা বিশ্বাস করিব না বলিয়াই তিনি উহাদিগকে দাসী বলিয়াছেন; তাহারা অনেকে দুঃস্থা স্বজাতি—আত্মীয়া বা কুটুম্বিনী। তাহারা আশ্রয় পাইয়াছে। পূর্বে ইহা সম্ভব হইত। কারণ, তখন বাঙ্গালী গৃহস্থ অভাবের তাড়না জানিত না। ইংরেজের শাসনকালের প্রথম ভাগেও বাঙ্গালী গৃহস্থের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে' পাই। "(জমাজমিতে) যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি-সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়, যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০।৭০ টাকার বিক্রী হয়। * * * কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ।" ইহাও একরূপ সাম্যবাদ। ধন-সাম্যবাদ তাহার প্রথম প্রচারক কার্ল মার্কস্‌দ্বারা প্রচারিত হইয়া বর্তমানে যে রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহা তাহার তুলনায় তুচ্ছ হইলেও বহু পূর্বে হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় যে সাম্যবাদ ছিল, ইহা তাহারই অবশেষ ও রূপান্তর। এ দেশে পূর্বকালে যে সমাজের ও সময়ের উপযোগী সাম্যবাদ ছিল, তাহা বিজ্ঞবর কার্ল মার্কস বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সাম্যবাদের পরিবর্তন না হওয়ায় তাহা উপযোগিতা পায় নাই। তবে পুরাতন সাম্যবাদের শেষ ছিল—ধনী প্রথমেই লোকের হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিতেন, পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পথি-নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ—প্রভৃতি; তাহার পরে বার মাসে তের পার্বণে গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা ও আনন্দ উপভোগ করা। বহুজন পালনও সেই কারণে প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্যই ভ্রমর "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" বলিয়া ডাকিলে—"ক্ষীরোদা,—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটা-সোটা, গাটা-গোটা—মল পায়ে, গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা।" এই সকল দাসী পরিবারের "আপনার

জন" হইয়া উঠিত এবং গৃহস্থের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইত। এই প্রথা এখন লোপ পাইয়াছে—তাহার প্রধান কারণ, একান্নবর্তী পরিবারের উচ্ছেদ, দ্বিতীয় কারণ অর্থনীতিক।

কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—শত্রুপক্ষ যে রটাইয়াছিল, ব্যয় পাঁচ সাত বা দশ হাজার তাহাও সত্য নহে; মিত্রপক্ষ যে বলিয়াছিল, লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল—উভয়েই অসত্য, প্রকৃত ব্যয় ৩২ হাজার ৩ শত ৫৬ টাকা ও কয় আনা। তখনকার ৩২ হাজার আজিকার দিনে অনেক অধিক, সন্দেহ নাই। পূর্বে ধনীদিগের পরিবারে শ্রাদ্ধই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হইত। তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, মৃতের পারলৌকিক সুখ-শান্তি বিধানের ধারণা। ইহকালের আদর্শে মানুষ পরকালের কল্পনা করে। মিশরে বহুকাল পূর্বে রচিত সমাধি-মন্দিরে ঐশ্বর্যের যে পরিচয় আজ লোককে স্তম্ভিত করিতেছে, তাহা মৃতের পরলোকে কাজে লাগিবে, এইরূপ বিশ্বাসেই সে সকল সমাধিতে—শবের সঙ্গে প্রদত্ত হইত। এই বাঙ্গালায় পাঞ্জাব হইতে আগত ব্যবসায়ী—বর্ধমানের জমিদার পরিবারের "সমাধি" গঙ্গার তীরে কালনায় অবস্থিত; এক এক জনের এক একটি সমাধি—প্রত্যেকের উদ্দেশে ভোগের সব ব্যবস্থা। আবার বিবাহে যে "বাঁধা রোশনী" অর্থাৎ আলোক-সজ্জা, বাদ্য, শোভাযাত্রা—নগরে সম্ভব, গ্রামে তাহা সম্ভব ছিল না—এখনও নাই; কিন্তু গ্রামে শ্রাদ্ধের ঘটা হইত। আবার শ্রাদ্ধের একটি বড় অঙ্গ ছিল—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত "বিদায়"। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই "বিদায়" পাইতেন; সেজন্য বিশেষ পত্রের প্রয়োজন হইত না—উপস্থিত হইলেই হইত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "মদের দোকান বন্ধ হইল; সব মাতাল টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে"। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তখন বিশেষ সম্মান ছিল। গল্প আছে, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পত্নী দারিদ্র্যহেতু, অলঙ্কারের অভাবে, প্রকোষ্ঠে লাল সূতা সাধব্যের চিহ্ন ("আয়তি") রূপে ব্যবহার করিতেন। নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে যাইয়া তাহা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীকে হাসিতে দেখিয়া পণ্ডিত-গৃহিণী বলিয়াছিলেন—"জানিও, যেদিন এই সূত্র ছিন্ন হইবে, সেইদিন তোমার স্বামীর নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে।" নবদ্বীপ তখন "ভারতীয় রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ।" সমারোহ সহকারে যে সকল শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইত, সে সকলে কাশী, প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্র হইতেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন—যে "বিদায়" পাইতেন, তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বিদ্যালোচনাই করিতেন না—অকাতরে ছাত্রদিগকে বাস ও আহার্য পর্যন্ত দিয়া—বিদ্যাদান করিতেন। ইহা হিন্দুর বিদ্যার আদরের পরিচায়ক। তদ্ভিন্ন দরিদ্রদিগকে আহার্য ও অর্থ প্রদান প্রভৃতি ছিল। আর আপনার গর্ব-প্রকাশও যে ছিল না, তাহা বলা যায় না। কলিকাতা শোভাবাজারের দেব পরিবারের বংশপতি নবকৃষ্ণ ইংরেজের শাসন প্রবর্তন কালে "অল্পদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা মাতৃ-শ্রাদ্ধে খরচ করিয়াছিলেন"—লোকে বলিত। ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' তৎকালে প্রচলিত জনরব অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছিল। কথিত

আছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানী করিয়া আড়াই কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "কবি"-গানে শোনা যাইত :—

"মহিষের সিং, হরিণের সিং, তা'রে কি বলি, সিং?
সিং-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং।"

তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে তৈলের পুষ্করিণী করিয়া তাহাতে তৈল রাখা হইয়াছিল—জনরব আছে। ইহা—যাহা আজ আর নাই—তাহারই চিত্র—স্মারক—"দিন কতক মাছির ভন্-ভনানিতে, তৈজসের ঝন্‌ঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না।" সে গ্রামও আর নাই, সে ব্যবস্থাও আর নাই, সে মনোভাবও আর নাই। এ যেন সেই—

"দেখে এলাম শ্যাম
তোমার বৃন্দাবনধাম—
কেবল আছে নাম।"

যে কারণে আজ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহাই পূর্বে ইংলণ্ডে তাহার অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। গোল্ডস্মিথ তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতায় গ্রামের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ বাঙ্গালায়ও আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি—

"No more thy glassy brook reflects the day,
But, choked with sedges, works its weedy way:

* * * *

Sunk are thy bowers in shapeless ruin all,
And the long grass o'ertops the mouldering wall."

এখন আর বারুণী পুষ্করিণী খনিত হয় না। এখন সেকালের বারুণী পুষ্করিণী সংস্কারের অভাবে জলজ গুল্মে আবৃত সলিল—সংকীর্ণ পরিসর। তাহার কাল-চক্ষু জলে রবিকর পতিত হইয়া আর বিস্ময়কর সৌন্দর্য উৎপন্ন করে না। দেখিলে স্কটের সেই বর্ণনা মনে পড়ে না—

"One burnish'd sheet of living gold
Lock Katrine lay beneath him roll'd"

এখন অনেক তাল পুকুরেই ঘটি ডুবে না। আর যদি কোথাও কোন ধনী তেমন পুষ্করিণী খনন করান, তবে তাহাতে গ্রামের লোকের জল লইবার অধিকার থাকে না। তাহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'লোক শিক্ষা' প্রবন্ধে ('বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ) বুঝাইয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগের সমাজে কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রবর্তন করিয়াই

ক্ষান্ত হয় নাই—সমাজকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছিল। "শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চ'ষে, আমার ফাউলকারী সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ তাহা নদের ফটিক চাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন না। * * * তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা ও রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি ঊনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না।"

এই সহানুভূতি ছিল বলিয়াই যে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে থানায় পাঠাইবার কথায় বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারী কি! আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ্।" তাঁহাকে দরিদ্র ব্রহ্মানন্দ ঘোষের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতে সাহস করিয়াছিল—বলিতে পারিয়াছিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বইত' না।" সমগ্র গ্রাম তখন যেন এক পরিবার আর যাঁহারা ধনে মানে বড় তাঁহারা পরিবারের কর্তা—পরিচালক। সে ব্যবস্থা আর নাই। এখন গ্রামের যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা ধনী, যাঁহারা সম্ভ্রান্ত—তাঁহারা গ্রামত্যাগী। গ্রাম এখন যাহাদিগের গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে যাইবার উপায় নাই, তাহাদিগের—তাই গ্রামের সমাজ সংকীর্ণতার পংকে কলুষিত—ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-মিথ্যা-হীনতার লীলাক্ষেত্র।

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র গোলে পড়িয়াছিলেন; লিখিয়াছিলেন—

"আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যান-প্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা-ফলের পাতর বসান।"

এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—যে দেশে জলের দর্শনেও স্নিগ্ধতানুভব হয়, সে দেশে জলে স্থলের শোভা বর্ধিত করে। 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার শোভা বর্ণনা করিয়াছেন—

"চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী সাটী। তাহার উপর, মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষ-শ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়। মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে।"

বারুণীর বর্ণনায়ও একালের ছাপ আছে। 'পরিশিষ্টে' আছে শচীকান্ত গোবিন্দ-লালের সম্পত্তি পাইয়া যখন আবার বারুণীর চারিপার্শ্বে উদ্যান রচনা করিল—

"আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুতিল। কিন্তু আর রঙ্গিন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলো।"

সাইপ্রেস প্রতীচীতে সেকালে শবের জন্য ও সমাধি সজ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইত—উহা শোকের বা বিষাদের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত। আর উইলো—বিষাদের, প্রেমিকের দ্বারা পরিত্যক্তের প্রতীক। কবি ক্যাম্পবেল লিখিয়াছেন—

"I must wear the willow garland
For him that's dead or false to me."

গোবিন্দলালের সময়ে তথায় বহু বিদেশী ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ ছিল—"চারিপার্শ্বে বেদিকার উপরে উজ্জ্বল-বর্ণরঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভার্বিনা, ইউকর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধী দেশী ফুলের সারি গন্ধে নাসা আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল, পীত, রক্ত, শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী।"

শ্বেত প্রস্তরে ক্ষোদিত নারীমূর্তিও বিদেশ হইতে আমদানী বলিয়া মনে হয়।

যে সকল চরিত্র চিত্র-রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের চিত্র সর্বপ্রধান। তিনি "সেকালের" একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ কর্তা ও প্রভাবশালী আদর্শ ধনী ও জমিদার! সেই জন্যই যখন পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন—

"কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু-সংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে; কেহ বলিল, একটা দিকপাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।"

তিনি যে খাঁটি লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার উইলেই সপ্রকাশ। বিপুল সম্পত্তি তাঁহার নামেই ছিল। যখন নাবালক পুত্রমাত্র রাখিয়া তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইল তখন—

"যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।"

তিনি ধর্মভীরু—পুত্র হরলাল তাঁহাকে সে বিষয়ে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না, হরলাল পিতার প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইল, সমাজে অপ্রচলিত—রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে ধর্মবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত—বিধবা বিবাহ করিবে—খাঁটি লোক কৃষ্ণকান্ত তাহাকে ত্যাগ করিলেন—ধর্ম ত্যাগ করিলেন না।

এদিকে তিনি পাকা বিষয়ী লোক। অহিফেনের নেশায়ও তাই "বিক্রয় কোবালা", "ফোরক্লোজ" প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। বিষয়-কর্ম তিনি নখ-দর্পণে রাখিতেন। তিনি স্বয়ং সদর কাছারিতে কাজ দেখিতেন ও করিতেন। তাহার বর্ণনা—

"গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া সোনার আল্‌বোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া, মর্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমা-ওয়াশীল, থেকো, করচা, বাকিজায়, শেহা রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মহুরী, তহশীলদার, আমিন, পাইক, প্রজা।"

তিনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারী কি? আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ।" যে সকল লোকের কথায় বলা হইত, প্রতাপে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়"—তিনি সেই সম্প্রদায়ের কর্তা।

কিন্তু কৃষ্ণকান্তের হৃদয়ে কোমলে ও কঠোরে সম্মিলন হইয়াছিল। তিনি পুত্র হরলালের অসংগত কথা শুনেন নাই—তাহার বিধবা বিবাহ করার ভয় দেখানয় বিচলিত হন নাই; অপর পুত্রের বিনীত নিবেদন তাঁহাকে সংকল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাঁহার দৌর্বল্য ছিল। সে তাঁহার মৃত ভ্রাতার একমাত্র পুত্র—ভ্রাতার স্মৃতি। সেই জন্য "গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র।" উদ্যানবাটিকায় গোবিন্দলাল যে বহু অর্থ ব্যয় করিত, তাহাও তিনি জানিতেন—একান্নবর্তী পরিবারে অর্থ একই তহবিলে থাকে। কিন্তু তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিষয়ী কৃষ্ণকান্ত কাছারিতে রোহিণীর উপস্থিতিতে গোবিন্দলালের ভাব দেখিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন—

"হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগির চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেছে।"—তিনি ভাবিয়াছিলেন, "এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে।"—"দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

গোবিন্দলাল মহালে যাইবার প্রস্তাব করিলে কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দলাল মহাল হইতে ফিরিতেছে সংবাদ পাইয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে যাইবার জন্য মাতাকে আপনার পীড়ার সংবাদ দিয়া পিত্রালয়ে যাইবার কথা লিখিলে—বৈবাহিকের পত্র পাইয়া শিষ্টাচার রক্ষার্থ কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল "চারি দিনের কড়ারে" অর্থাৎ গোবিন্দলালের আগমনের পূর্বেই তাহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিয়া, গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া যখন তাহার মাতার নিকট বলিল, ভ্রমরকে আনয়ন জন্য লোক পাঠান হইবে না, তখন যে কৃষ্ণকান্ত সেই মতেই কায করিয়াছিলেন, সে-ও গোবিন্দলালের প্রতি স্নেহের আতিশয্যে। নহিলে তিনি গৃহকর্তা, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের মত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া বধূকে আনিতে পাঠাইতে পারিতেন এবং ভ্রমর তখন আসিলে হয়ত ঘটনার গতি অন্যরূপ হইত।

রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের নাম সম্মিলিত হইয়া যে জনরবের উদ্ভব করিয়াছিল,

তাহার গুঞ্জন কৃষ্ণকান্তের কর্ণগোচর হইয়াছিল। "কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দ-লালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট।" সে তাঁহার পুত্রাধিক—অত্যন্ত স্নেহের। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—হয়ত গোবিন্দলালের জন্য দুঃখ ও চিন্তা তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। তিনি "গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন" মনে করিলেন। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল, তিনি মনে করিলেন—"বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগর-সঙ্গম বুঝি সম্মুখে।" যে দিন তাহা বুঝিয়া তিনি রোগ-শয্যাপার্শ্বে গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিবেন—সেজন্য আর সকলকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন, সে দিন আর বলা হইল না। গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সে স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বৈদ্যকে আনিতে গেল। বৈদ্য আসিলে তিনি ঔষধ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।" এ যেন—স্থির নির্দেশ—

> Sun-set and evening star,
>   And one clear call for me ;
> And may there be no morning of the bar,
>   When I put out to sea.
>
> *   *   *   *
>
> I hope to see my Pilot face to face
> When I have crost the bar."

কিন্তু তখনও তিনি গোবিন্দলালের হিতচিন্তা করিতেছিলেন। তিনি "মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়া নহে"—গোবিন্দলালের হিতের জন্যই উইল পরিবর্তিত করিলেন—বলিলেন, "গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্তমানে গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে লেখ।" যে ভার তাঁহার মনে থাকিয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, তিনি তাহা দূর করিয়া শান্তিতে মরিতে চাহিয়াছিলেন—"সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসী তলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন করিলেন।" যেন—

> "Nothing in his life
> Became his like the leaving it ; he died
> As one that had been studied in his death
> To throw away the dearest thing he owed
> As 'twere a careless trifle."

যিনি জীবনে কখন অধর্ম করেন নাই, মৃত্যুতে তাঁহার ভয় কি? রামপ্রসাদ 'কালীকে' বলিয়াছিলেন—"প্রাণ যাবার বেলা এই করো, মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।" তিনি মা'র দুরন্ত ছেলে—কিন্তু "আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে সত্যই একজন দিক্‌পালের কায শেষ হইয়াছিল।

হরলাল পিতার কুপুত্র। সে "বড় দুর্দান্ত; পিতার অবাধ্য ও দুর্মুখ।" কেবল তাহাই নহে, সে নীচাশয়, পরস্বলোভী এবং আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকল প্রকার হীন কায করিতে প্রস্তুত। কেবল কৃষ্ণকান্তের দৃঢ়তা ও সাধুতা তাহাকে ইচ্ছানুরূপ কাযে বিরত রাখিত। সে গোবিন্দলালকে সম্পত্তিতে তাহার প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত করিতে আগ্রহশীল। সে বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়া দিয়াছিল এবং পিতার উইলও পুড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল—অসমর্থ হইয়া সে ভয় দেখাইয়া কার্য সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থকাম হয়, তখন প্রথমে ব্রহ্মানন্দকে ও পরে রোহিণীকে যথাক্রমে অর্থলোভ ও অন্য লোভ দেখাইয়া উইল পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ ভয়ে লোভ সম্বরণ করিয়াছিল—রোহিণী তাহা পারে নাই। তবে রোহিণীর সহিত সে ছলনায় পারিয়া উঠে নাই। কৃষ্ণকান্তের দৃঢ়তার নিকট যেমন রোহিণীর বুদ্ধির নিকট তেমনই তাহাকে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। সে রোহিণীকে বিবাহ করিবে, আশা দিয়া তাহার দ্বারা উইল চুরি করাইয়াছিল; কিন্তু বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় রোহিণী তাহা তাহাকে দেয় নাই। উইল না পাইয়া সে বলিয়াছিল—"আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।" রোহিণী উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিল—"তোমার মন নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।" তবুও হরলাল "টিপি টিপি হাসিয়া গেল"। যে স্বার্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করে, তাহার মান কোথায়?

চাণক্য বলিয়াছেন—

> "একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
> তং দহ্যতে বনং সর্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥"
> "একটি কুবৃক্ষ, বহ্নি কোটরে যাহার
> দহিয়া সমগ্র বন করে ছারখার।
> তেমনি একটি পুত্র হ'লে কুলাঙ্গার
> নিজ দোষে করে নিজ কুলের সংহার।"

হরলাল রায়-পরিবারে কুলাঙ্গার। তাহার জন্য বংশের সর্বনাশ হইয়াছিল। সে-ই গোবিন্দলালের পতনের পরোক্ষ কারণ। সে গোবিন্দলালকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে

চাহিয়াছিল—পারে নাই; কিন্তু সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা মূল্যবান তাহাতে বঞ্চিত করিবার কারণ হইয়াছিল। সুনামের তুলনায় অর্থ তুচ্ছ। শেক্সপীয়রের সেই কথা—

"Good name, in man and woman......
Is the immediate jewel of their souls,
Who steals my purse, steals trash;
'tis something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been
slave to thousands;
But he that filches from me my good name,
Robs me of that which not enriches him,
But makes me poor indeed."

"রোহিণী গোবিন্দলালকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই," কিন্তু এক দিন সহসা সে গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার কারণ—হরলাল। সে রোহিণীর মনে পাপ বাসনার উদ্ভবসহায় হইয়াছিল। আরব্য উপন্যাসের ধীবর বদ্ধমুখ কুম্ভ পাইয়া যখন তাহার আবরণ সরাইয়া দিয়াছিল, তখনই তাহার মধ্য হইতে বন্দী দৈত্য বাহির হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে আবরণ উন্মোচিত না হইলে দৈত্য অনন্তকাল তাহাতে বন্দিদশায় থাকিত। বাল-বিধবা রোহিণী যদিও পরিপূর্ণ যৌবনে "বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষের" অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি মনে করা অসঙ্গত নহে যে, হরলাল তাহাকে প্রবঞ্চনার দ্বারা বশীভূত করিয়া—আপনার কার্যসিদ্ধির চেষ্টা না করিলে বোধ হয় রোহিণীর মনে সুপ্ত বাসনা জাগিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না—বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত থাকিলে সে-ও দগ্ধ হইত না, অন্য কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারিত না; অন্ততঃ গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সর্বনাশ করিত না। সেই জন্যই বলিতে হয়—হরলাল রায়কুলে কুলাঙ্গার।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ "নিরীহ ভালমানুষ!"—"কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠামহাশয় বলিতেন এবং তৎ-কর্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিত হইতেন।" উদ্ভিদসমাজে যাহাকে "পরগাছা" বলে, ব্রহ্মানন্দ তাহাই। সে পরের অনুগ্রহে পুষ্ট। সে "ভালমানুষ"—কোনরূপে নিশ্চিন্ত থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলেই সুখী। সেই জন্যই অন্য কোন সহায় না থাকায় তাহার যে ভ্রাতৃ-কন্যা তাহার বাটীতে থাকিত, সে তাহার সংসারে জল আনিত, বাসন মাজিত, রন্ধন করিত—তাহার "বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ" থাকিলেও ব্রহ্মানন্দ সে সকল সংশোধনের চেষ্টা করা কর্তব্য মনে করে নাই। সে "ভাল মানুষ"—যে কৃষ্ণকান্তের অনুগ্রহে সে প্রতিপালিত তাঁহার ভয়েও বটে, আর চিরাগত সংস্কারানুযায়ী ধর্মভয়েও বটে, সে হরলালের অর্থদানের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াও শেষ পর্যন্ত প্রলোভন দলিত করিতে

পারিয়াছিল—ফলাহারের প্রলোভনে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দশা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরাঙ্গপুষ্টের দোষ হইতেও সে মুক্তিলাভ করে নাই; সেই জন্যই সে প্রসাদপুর হইতে প্রেরিত রোহিণীর পাপার্জিত অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই। তখন কৃষ্ণকান্ত নাই—তাঁহার অনুগ্রহের ধারাও শুকাইয়া গিয়াছে—তাঁহার অপ্রীতি-ভাজন হইবার ভয় আর নাই—ধর্ম-ভয় একা তাহাকে আবশ্যক বল দিতে পারে নাই।

রোহিণী কি অবস্থায় নিশীথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে ধরা পড়িয়াছিল, তাহা জানিয়াও এবং তাহার পরে গ্রামে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর নাম সংযুক্ত হইয়া যে রটনা ঘটাইয়াছিল তাহা জানিয়াও ব্রহ্মানন্দ রোহিণীকে দোষী বলে নাই; আর বোধ হয়, তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া গোবিন্দলালকে পত্র লিখিয়াছিল—ভ্রমর "রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব।" বাস উঠাইবার মত মনোভাব যদি ব্রহ্মানন্দের থাকিত তবে সে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে ধরা পড়িবার পরেই তাহা করিত। সে যদি তখন তাহা করিত, তবে ভালই হইত। কিন্তু সে যে তাহা করে নাই, তাহাতেই তাহার পরাঙ্গপুষ্ট জীবের ধাতুগত ভাব সপ্রকাশ। গোবিন্দলালকে সে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহা—রোহিণীর প্রেরণায় লিখিত না হইলেও—যে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, এমন মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ভ্রমরের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা বলা বাহুল্য। "রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই।" সেই জন্যই সন্দেহ হয়, সে-ই ছলে বা কৌশলে বা কপট অশ্রুজলে ব্রহ্মানন্দকে ঐরূপ পত্র লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দকে যদি "নিরীহ ভাল মানুষ" মনে করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়--সে রোহিণীর চাতুরী বুঝিতে পারে নাই, তাহার প্ররোচনায় পত্র লিখিয়াছিল। রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে প্রসাদপুরে গমন করিলেও ব্রহ্মানন্দ হরিদ্রাগ্রামের বাস উঠায় নাই। রোহিণীর তারকেশ্বরে গমন বলিয়া গৃহত্যাগও ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে পারে নাই—তাহাও নহে।

ব্রহ্মানন্দকে যদি "নিরীহ ভালমানুষ" মনে করিতে হয়—তবে তাহার কারণ, যাহাকে গ্রামের লোক "পাটোয়ারী বুদ্ধি" বলে, তাহার অভাব তাহার ছিল। সে বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাই—মাধবীনাথে ও নিশাকরে।

উভয়েই বিষয়ী, উভয়েই সাহসী, উভয়েই কার্য-সিদ্ধিতে নিপুণ, কিন্তু উভয়ে সামান্য প্রভেদ ছিল। মাধবীনাথ বিষয়ী ও চতুর হইলেও কন্যার প্রতি স্নেহ তাঁহার দৌর্বল্য ছিল। সেই দৌর্বল্যের জন্যই —গোবিন্দলাল মহাল হইতে গৃহে ফিরিতেছেন জানিতে পারিয়া অভিমানিনী কন্যা যখন লিখিল—"আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও।" তখন ভ্রমরের মাতার অশ্রুতে ও গালিতে বিচলিত হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—পত্রের "ভিতর কিছু জুয়াচুরি

আছে।" তিনি স্নেহাধিক্য হেতু—পত্রের শেষাংশ—"এখানে পীড়ার কথা বলিও না"—পাঠ করিয়াও সেরূপ সন্দেহ করিলেন না; ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। তাঁহার বিমল বুদ্ধি যদি স্নেহে রঞ্জিত না হইত, তবে তিনি সহসা কন্যার "বড় পীড়ার" সংবাদ পাইয়া অবস্থা দেখিবার জন্য অন্ততঃ স্বয়ং হরিদ্রাগ্রামে যাইতেন। তথায় যাইলেই তিনি প্রকৃত অবস্থা জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন—আবশ্যক প্রতীকারপর হইতেন। তাহা হইলে ঘটনার স্রোতও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত। গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পরে যখন দুশ্চিন্তায় ও বেদনার ভারে ভ্রমর রোগ-শয্যায় শয়ন করিল—"অপরাজিতা ফুল শুকিয়া উঠিল" তখন কন্যার নিকটে আসিয়া "মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন"—"যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্বাটীতে আসিলেন"—"বহির্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন।" ক্রমে সেই মর্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। "ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল।" বিষয়ী লোকের এমনই হইয়া থাকে। প্রতিহিংসা অনেক সময় কার্যের উৎস হয়। যে স্নেহের বা ভালবাসার বা শ্রদ্ধার পাত্র তাহার লাঞ্ছনায় লাঞ্ছনাকারীর উপর প্রতিশোধ লইবার বাসনা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অহিংসা ভাল, নির্বৈর বড় কথা, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে নহে—কেহ গণ্ডে একবার চপেটাঘাত করিলে তাহাকে দশ বার চপেটাঘাত করা গৃহস্থের ধর্ম।" প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প তখন মাধবীনাথকে দুঃখ ত্যাগ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত করিল—তিনি প্রথমেই ছলে, বলে, বা কৌশলে গোবিন্দলালের সন্ধান লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া—সে কার্যে সফলকাম হইলেন এবং তাহার পরে বন্ধু নিশাকরের সাহায্যে প্রাপ্ত-সংবাদের যাথার্থ্য নির্ধারণ করিলেন। কিন্তু তিনি কি করিতেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল এবং রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ হইল। যখন গোবিন্দলাল ধরা পড়িল, তখন কিন্তু মাধবীনাথকে কন্যার প্রতি স্নেহবশে প্রতিহিংসাবৃত্তি দমিত করিতে হইল। হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারবশে ভ্রমর বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া গোবিন্দলালকে—পাপিষ্ঠ গোবিন্দলালকে বাঁচাইতে ব্যাকুল হইল, এবং সজল নয়নে পিতাকে বলিল, "দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।" "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী—স্নেহময়ী।" ভ্রমরের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তাহার কথা ব্যর্থ হইবে না—সে, স্বামী যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তখন শেষে বলিয়াছিল—"বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। * * * * দেবতা সাক্ষী, যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * * যদি এ কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। * *" বিশ্বাস এইরূপ প্রবল হয়।

মাধবীনাথ কন্যার জন্য গোবিন্দলালের মামলায় অব্যাহতি লাভের উপায়—যেরূপই কেন হউক না—করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই ভ্রমরের মৃত্যুর পরে—"মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না।" তাঁহার

প্রতিহিংসা পূর্ণ হইয়াছিল। পরিবর্তিত সংস্করণে আছে—ভ্রমরের মৃত্যুর পরে অপ্রকৃতিস্থ গোবিন্দলালের অবস্থা দেখিয়া "মাধবীনাথেরও দয়া হইল।"—

"The quality of mercy is not strain'd."

নিশাকর "নিষ্কর্মা"—গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন—সর্বদা পর্যটনে গমন করেন। এই শ্রেণীর লোক হয় অত্যন্ত স্বার্থপর, নহে ত উদার-প্রকৃতি হয়। নিশাকর উদার-প্রকৃতি —বন্ধুবৎসল এবং কতকটা "খাতির নাদারাত"—ইংরেজীতে যাহাকে adventure বলে তাহাই প্রিয়। বন্ধুর কন্যার দুঃখে বিগলিত হইয়া তিনি তাঁহার সহিত প্রসাদপুরে গমন করেন এবং তথায় গোবিন্দলালের অপ্রীতি অর্জনের ভয় থাকিলেও তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করেন। কথা সবই মিথ্যা—কেবল অবস্থা বুঝিবার জন্য তাহার অবতারণা। তাহার পরে তিনি যাহা করেন, তাহা আরও দুঃসাহসের পরিচায়ক। পাপিষ্ঠা রোহিণী তখন গোবিন্দলালের সঙ্গে ঐ বিজন স্থানে বাস করিয়া সুখে অতৃপ্তি ভোগ করিতেছিল। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সে যে প্রস্তাব করিল তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন, "এই মাঠের মাঝখানে ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই।" তথাপি তিনি নিভৃত স্থানে রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন—সে কেবল তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়া গোবিন্দলালের চৈতন্যোৎপাদনের অভিপ্রায়ে। সে সুযোগ না পাইলে তিনি কি করিতেন, বলা যায় না; কারণ, "তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, [illegible], কব্জা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।" রোহিণী ভৃত্যকে দিয়া যাহা বলিয়া পাঠাইল, তাহাতে তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তিনি অবস্থানুসারে কাজ করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি চিত্রাতীরে বাঁধাঘাটে বসিয়া ভাবিলেন—"আমি কি নৃশংস! এক অবলা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারিনা, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে।"

দোলাচল-চিত্তের এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া মানুষটির প্রকৃতি স্বপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে। পাপের দণ্ড দিবার জন্য পাপপথ অবলম্বন করা সঙ্গত কিনা, নিশাকর তাহাই ভাবিতেছিলেন।

কিন্তু তখন আর ভাবিয়া লাভ ছিল না। রোহিণী আসিয়া উপস্থিত হইল, আর তাঁহার নির্দেশানুসারে ভৃত্য গোবিন্দলালকে সংবাদ দিলে গোবিন্দলাল তাহার অনুসরণ

করিয়া আসিল। নিশাকর পলকের মধ্যে সরিয়া যাইলেন। প্রভাতে রাত্রির ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি—বন্ধু মাধবীনাথের সহিত—"বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।" তাঁহার কার্যের ফল কি হইতে পারে, তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। যেরূপেই হউক বন্ধু-কন্যার জীবন-রক্ষা করিবেন—কৃতসংকল্প হইয়াও যে নিশাকর কার্যকালে মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের চাঞ্চল্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই—তাহার কারণ, ধর্ম হিন্দুর ধাতুগত। গ্রান উইডেল লিখিয়াছেন :—

"The whole structure of Indian life is permeated by a deep religious character, which, without being called forth by exterior pressure, is the result of their condition."

এই ভাব আমরা গোবিন্দলালেও দেখিতে পাই। এমন কি পাপ পথের পথিক রোহিণীও ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আর যে সকল চরিত্র রেখাচিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে, সে সকলের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ক্ষীরি ও হরমণি ঠাকুরাণী হইতে সোণা ও রূপা পর্যন্ত—দানেশ খাঁ হইতে "রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ক-কলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ"—মাসিক ১৫ টাকা বেতনের পোষ্টবাবু ও ৭ টাকা বেতনের পিয়ন হইতে পুত্রবধূর সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া অসন্তুষ্ট গোবিন্দলালের জননী সকলেই সজীব ও সকলের চিত্রই যথাযথ।

পুস্তকে তিনজন জননীর পরিচয় আছে—গোবিন্দলালের জননী, ভ্রমরের জননী ও ভ্রমর। গোবিন্দলালের মাতা "পাকা গৃহিণী নহেন।" গোবিন্দলালের প্রতি অসাধারণ স্নেহশীল কৃষ্ণকান্ত যে ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণকল্পেই ভ্রমরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার ছিল না—বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রকৃতির অভাব অধিক ছিল। সেই জন্যই তিনি পদপ্রান্তে পতিতা ভ্রমরের কথায় কর্ণপাত করেন নাই—পুত্রবধূর প্রতি অপ্রসন্নতায় পুত্রের অনিষ্টের বিষয় কল্পনা করিতে পারেন নাই।

ভ্রমরের মাতার বুদ্ধি তাঁহার কন্যার প্রতি স্নেহে ভাসিয়া গিয়াছিল। কন্যা পীড়িতা সংবাদ পাইয়াই তিনি "উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে একলক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন"; তাঁহার ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া বিষয়ী মাধবীনাথও প্রকৃত অবস্থা বিবেচনার অবসর পাইলেন না। ভ্রমর যদি তখন পিত্রালয়ে না যাইত, তবে হয়ত ঘটনার অবস্থা অন্যরূপ হইত।

ভ্রমরের মাতৃত্ব বিকশিত হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বভাবজ। তাই গোবিন্দলালের গমনের পরে সে সূতিকাগারে মৃত সাত দিনের ছেলের জন্য ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতেছিল—"আমার ননীর পুতুলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? * * * একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না?"

যামিনী ভ্রমরের ভগিনী—ভগিনীর দুঃখে দুঃখিত। কিন্তু সে ভ্রমরের অবস্থা বুঝিতে অক্ষম। বোধ হয়, তাহার কারণ :—

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

যামিনীর জীবনে যে কখন ভ্রমরের অবস্থা ঘটে নাই, তাহার পরিচয় আমরা পাই—যখন সে গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনকে ভ্রমর বিপদ বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিল—"সে আবার বিপদ কি, ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে?" সে বুঝিতে পারে নাই—গোবিন্দলালের ব্যবহারে তাহার প্রতি ভ্রমরের শ্রদ্ধার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছিল—যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে "গোবিন্দলাল হত্যাকারী ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।" যে ভালবাসা শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা চোরাবালুতে সৌধ নির্মাণের মত। যামিনী, বোধ হয়, জানিত না—গোবিন্দলাল যখন হরিদ্রাগ্রামে আসিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিল, তখন ভ্রমর তাহাকে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া প্রত্যার্পিতন্যাস হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছিল—সে আর হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে বাস করিবে না। সে লিখিয়াছিল—"আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।" ভ্রমর তাহা লিখিবে জানিলে, যামিনী, বোধ হয়, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাও করিত। কারণ, সে ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য বুঝে নাই।

গ্রন্থে পুলিসের কথা আছে। বিষয়ী মাধবীনাথ বলিতেন—"পুলিস টাকার বশ।" পুলিসের দারোগা ফিচেল খাঁ প্রমাণের দুরবস্থা দেখিয়া "নগদ কিছু দিয়া" তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। ইন্দিরার "পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত" সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের চাকরীতে পুলিসের কাজের অনেক পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি যে পুলিসের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ রচনার বহুদিন পরে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত পুলিস কমিশনের বিবরণেও দেখিতে পাওয়া যায়।—

(১) "Everywhere they went, the Commission heard the most bitter complaints of the corruption of the police."

কমিশন সর্বত্র পুলিসের দুর্নীতির অভিযোগ পাইয়াছেন।

(২) "The station-house officer will sometimes hush up a case on payments of his terms ; he will receive presents from parties and their witnesses."

ঘুষ লইতে পুলিস সর্বদাই আগ্রহশীল।

(৩) "If in his opinion enough of evidence is not thus (i.e. by improper inducement, by threats and by moral pressure) obtained to secure a conviction, he will not hesitate to bolster up his case with false evidence . . . ."

এইরূপ আরও অনেক অভিযোগের উল্লেখ ঐ রিপোর্টে আছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পরেও পঞ্জাবে অনুসন্ধান ফলে লিখিত হয়, লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ঘুষের পরিমাণ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ দুর্নীতি বাড়িয়াছে—কমে নাই।

'রসমঞ্জরী'র লেখক নায়িকাদিগের মধ্যে "স্বীয়া" বা "স্বকীয়া"র যে বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের কথায় তাহা এইরূপ :—

"নয়ন-অমৃত নদী সর্বদা চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায় না।
হাস্য-অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা পতিত শ্রবণে আশা
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।"

"বঙ্গদর্শনে" যখন "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রকাশিত হয়, তখন ব্যাপিকা রোহিণীর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে অনায়াসে বলা যায়, রোহিণী যদি বাল-বিধবা না হইত—মধ্যবিত্তের ঘরের ঘরণী হইয়া সে যদি সাধারণ স্ত্রীলোকের জীবন যাপন করিতে পাইত, তাহা হইলেও সে কখন "স্বকীয়া"র লক্ষণের অনুশীলন করিত না। কিন্তু পরিবর্তিত সংস্করণ পাঠ করিলে সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার অবকাশ ঘটে। সে রূপসী, কিন্তু সে রূপ কাহারও চিত্তবিনোদন করে নাই। কালিদাস বলিয়াছেন—"প্রিয়েষু সৌভাগ্য-কলা হি চারুতা"—অর্থাৎ "প্রিয়তমের অনুগ্রহেই রূপের সার্থকতা"। তাহার রূপের সার্থকতা হয় নাই। আপনার রূপ সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতন ছিল—সার্থক হয় নাই বলিয়া তাহাকে অবহেলা করা ত পরের কথা, তাহার প্রসাধনও করিত। তাহার "অধরে পানের রাগ * * আর কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়-মানা মনোমোহিনী কবরী।" সে যখন রন্ধনে রত তখন "দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল, পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না দেখিবার জন্য, রোহিণী তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল।" এই ব্যঙ্গপূর্ণ

উক্তিতে তাহার স্বভাবের আভাস পাওয়া যায়—যাহাকে "চোখের খেলা" বলে তাহাতেও তাহার আগ্রহ ছিল এবং শিকারী যেমন, যদি কখন প্রয়োজন হয় মনে করিয়া, অস্ত্র শাণিত করিয়া রাখে সে তেমনই "বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ" অনুশীলনের দ্বারা তীক্ষ্ণ করিয়া রাখিত। আমরা গ্রন্থে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই—যখন সে পাপিষ্ঠ হরলালের সহিত আলাপরত। 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থের ঐ স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগের কথায় লিখিয়াছিলেন—"যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্পদম্পতি গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল।" ব্রহ্মানন্দ উইল পরিবর্তন করিতে প্রলুব্ধ হইয়াও যখন শেষে তাহা করিতে সাহস পাইল না, তখন তাহাকে "মূর্খ, অকর্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না?" বলিয়া পাপপরায়ণ হরলাল রোহিণীর কাছে গেল। সে রোহিণীকে জানিত; সেই জন্যই সে স্ত্রীলোকের দ্বারা তাহার কার্য সিদ্ধ করিতে পারে কিনা দেখিবার জন্য রোহিণীর দ্বারা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিল। রোহিণী তখনও সংস্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করে নাই; সে শিহরিয়া বলিল—"চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না"—"আর যা বলুন সব পারিব। মরিতে বলেন মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।" টাকায় তাহার দ্বারা কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া হরলাল অন্য প্রলোভন দেখাইল—হরলাল বিধবা বিবাহ করিতে উদ্যত; রোহিণীর সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে। রোহিণী যেরূপ আগ্রহে সেই প্রলোভনে প্রবুদ্ধ হইল, তাহাতে মনে হয়, তাহার মন সেইরূপ প্রলোভনের জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। যে পিপাসাতুর সে যেমন মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকায়ও জলভ্রমে আকৃষ্ট হয়, রোহিণী তেমনই আকৃষ্ট হইল—বিচারবিবেচনার অবসরও গ্রহণ করিল না। আর সেই জন্যই যে কাজ কাটিয়া ফেলিলেও করিতে পারিবে না বলিয়াছিল, তাহার গুরুত্ব ও বিপদ বিচার না করিয়াই তাহা করিতে সম্মত হইল—অর্থের জন্য নহে, অতৃপ্ত পিপাসা-তৃপ্তির প্রলোভনে। রোহিণীর মনে হইল, সে সকল বিপদ তুচ্ছ করিতে পারে—করিবে। তাহার কার্যের কারণ—সংযম-শিক্ষার অভাব—

> "Untaught in youth my heart to tame
> My springs of life were poisoned."

মত্তাবস্থায় মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—রোহিণী তাহাই করিল। তাহার মস্তিষ্কে উপায় উদ্ভাবিত হইল। সে প্রথমে যাইয়া কৃষ্ণকান্তের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া উইল কোথায়, তাহা জানিয়া আসিল, তাহার পর নিশীথে একাকিনী—দুঃসাহসচালিতা হইয়া—তথায় যাইয়া প্রকৃত উইল চুরি করিয়া হরলাল প্রদত্ত জাল উইল তাহার স্থানে রাখিয়া আসিল। এ কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল না যে, কৃষ্ণকান্ত সুস্থ ও সবল, সুতরাং উইল পরিবর্তনের দ্বারাই হরলালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার জন্য হরলাল, হয় ত, উইল জাল অপেক্ষাও ভীষণ কাজ করিতে প্রচেষ্টা হইবে—জাল উইল ধরা পড়িবার পূর্বেই ছলে বলে বা কৌশলে পিতার জীবনান্ত ঘটাইতে আয়োজন করিবে।

রোহিণীর বুদ্ধি তখন বিকৃত—দৃষ্টি কেবল আপনার কল্পিত সুখে নিবদ্ধ। সেই জন্যই সে উইল বদল করিতে পারিল।

সেই সাফল্যে তাহার আশা বাড়িয়া গেল—সে সুখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—অতীত ভুলিয়া গেল, বর্তমানকে অবজ্ঞা করিল, কেবল বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত ভবিষ্যতের—সুখের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে স্বপ্ন যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে দেখিতে লাগিল, সে-ও আসিল, কিন্তু আশা ফলবতী করিতে নহে—উইল লইতে। হরলাল তখন লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেই উইল লইতে প্রস্তুত, কিন্তু যখন সে দেখিল, রোহিণী অর্থের জন্য তাহাকে উইল দিবে না তখন সে নিজমূর্তি ধারণ করিল; বলিল—"আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণীর স্বপ্ন টুটিয়া গেল—সে আশার উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে হতাশার পঙ্কিল পল্বলে পতিত হইল। তখন সে-ও নিজমূর্তি ধরিল। মেকলে বলিয়াছেন— "No creature is so revengeful as a proud man who has humbled himself in vain"—যে গর্বিত ব্যক্তি (কোন কারণে) নমিত হইয়াও বিফল মনোরথ হয়, তাহার মত প্রতি-হিংসাপরায়ণ আর কেহই থাকে না। রোহিণী যে মোহে তাহার ইহকালের সর্বস্ব হরলালকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, হরলাল যখন ঘৃণাতিক্ত উক্তিতে তাহা দূর করিয়া দিল, তখন রোহিণীর মনের ভাব সহজে কল্পনা করা যায়। কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার কোন উপায় তাহার ছিল না; তাই সে হরলালের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

বলিতে বলিতে রোহিণীর চক্ষু অশ্রুতে আবিল হইয়া উঠিল। যেদিন রোহিণী পিশাচীর মত একখানি বারাণসী শাড়ী ও এক সুট পিতলের গহনা ধার করিয়া সে সব গোবিন্দলালের উপহার বলিয়া ভ্রমরকে দেখাইতে গিয়াছিল, সে দিনের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কীলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। * * স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না।" আমাদিগের বড় দুঃখ রহিল যে, রোহিণী সত্য সত্যই সম্মার্জনী লইয়া পাপিষ্ঠ হরলালকে তাহার কাযের উপযুক্ত "পুরস্কার" দিল না। হরলালের মত পাপিষ্ঠের তাহাই প্রাপ্য—তাহাই "পুরস্কার"।

অন্তরের ব্যবধান ধূলিসাৎ হইবার পরে রোহিণী কি করিল, তাহা কে বলিবে? পরদিন আমরা তাহাকে দেখি—কলসী কক্ষে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইতেছে। "রোহিণী

একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা হাসি হাসিতে হাসিতে হাল্‌কা কলসীতে হাল্‌কা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। * * * হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল।"

বর্ণনায় তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন বর্ণনা দুর্লভ। শব্দ-মন্ত্রের সিদ্ধ সাধক, কথার তাজমহলের শিল্পী ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা করিয়াছেন—

"সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকিমালা গলে।
* * * কথা কয় ছলে॥
চূয়া বান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

এই বর্ণনায় যেমন মালিনীর আকৃতি ও প্রকৃতি ফুটিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় তেমনি রোহিণীর আকৃতি ও প্রকৃতি সপ্রকাশ হইয়াছে।

পূর্বদিনের ঘটনাও রোহিণীর প্রকৃতিতে পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ—সে যখন জল আনিতে যাইতেছিল, তখন যে পুষ্করিণীর পথে—বিজন বকুল-শাখায় বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল, তাহাও তাহার মনোযোগ অতিক্রম করে নাই এবং সে তাহার উদ্দেশে "দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—তাহার মনে তখন শান্তি ছিল না। যতক্ষণ আগ্নেয়-গিরির স্রাব বহির্গমনের পথ না পায়, ততক্ষণ তাহার বহিরাবরণ দেখিয়া তাহার অন্তরস্থিত বহ্নিজ্বালা অনুমান করা যায় না। মনের চাঞ্চল্যের জন্যই—"রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।" সে অভ্যাসবশে সংসারের সব কাজ করিয়া আসিয়াছে—এখন বারুণী পুষ্করিণীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কান্দিতে বসিল। তাহার মনে কেবলই প্রশ্ন—"আমি অপরের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ করিতে পাইলাম না?" তখনও সে চিরাগত সংস্কার সর্বতোভাবে বর্জন করিতে পারে নাই, সেইজন্য মনকে প্রবোধ দিয়াছিল, "পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই।" ক্রমে সূর্য অস্ত গেল—চন্দ্রোদয় হইল। সে দিকে রোহিণীর দৃষ্টি ছিল না। সে কান্দিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল উদ্যান-বাটিকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে দেখিলেন, রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে। স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয় গোবিন্দলাল তাহার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া তাহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণি, তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?" রোহিণী মুখ তুলিয়া দেখিল—"চম্পকনিন্দিত মূর্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে" দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল দেখিতে সুন্দর। রোহিণী কান্দিতে বসিবার পূর্বে দেখিয়াছিল "তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাহার চম্পকরাজিনির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে।" তিনি অহেতুকী কৃপাবশে বলিলেন—"তোমার কিসের দুঃখ, আমাকে কি বলিবে না? যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।" গোবিন্দলাল যখন বলিলেন, যদি রোহিণীর কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে এবং সে তাহা বলিতে না পারে, তবে যেন তাহার পরিবারস্থাদিগের দ্বারা জানায়, তখন রোহিণী বলিল—"একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

রোহিণী ততক্ষণে সংকল্প স্থির করিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল, গোবিন্দলাল রূপবান, তাহার পর তাহার ব্যবহার দেখিল, সে গুণবানও বটে; নহিলে তাহার দুঃখানুভব করিয়া সে সহানুভূতিস্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিল কেন? হরলাল তাহার মনে যে আশার উদ্রেক করিয়াছিল—সে সুপ্ত আশা জাগাইয়াছিল, তাহা অপূর্ণ থাকিয়া হতাশার বৃশ্চিকদংশনে তাহাকে পীড়িত করিতেছিল; হরলাল তাহার মনে যে অগ্নি জ্বালিয়াছিল—তাহার ইন্ধন তাহার অন্তরে সঞ্চিতই ছিল—তাহা হরলালের নিষ্ঠুরতায় নির্বাপিত হয় নাই, তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল। সে নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠের জন্য উইল চুরি করিয়াছে- দুরাশার প্রলোভনে গোবিন্দলালের ক্ষতি করিয়াছে—ক্ষতিও অল্প নহে। সেই অবস্থায় সে গোবিন্দলালকে দেখিল—সে রূপবান, তাহার অন্তরের পরিচয় তাহার কথায় প্রকাশ পাইল—সে গুণবান। তখন রোহিণীর মনে সুমতির সহিত কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার সহিত আশংকার যুদ্ধ চলিল। আকাঙ্ক্ষা গোবিন্দলালকে লাভের; আশংকা—সেই লাভের পথে বিপদ সম্ভাবনার। আকাঙ্ক্ষা—ও আশংকা শেষে একযোগে— "সেই বাপীতীর-বিরাজিত, চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্মিত দেবমূর্তি আনিয়া। রোহিণীর মানসচক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে কাঁদিল।"। সে গোবিন্দলালকে চিন্তা করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।*

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে রাণীর সম্মুখে কাচে লিখিয়াছিলেন,—

"Fair would I climb but that I fear to fall.

অর্থাৎ— "উচ্চে উঠি মনে হয়,—শুধু ভয়—হয় ত পতন।"

* "স্কটের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কেনিলওয়ার্থে' ইহার উল্লেখ অছে।"

এলিজাবেথ উত্তর দিয়াছিলেন—

"If thy heart fail thee, why then climb at all"?

অর্থাৎ— "মনে ভয় যদি হয়—করিও না তবে আরোহণ।"

রোহিণীর মনে আকাঙ্ক্ষা বলিতেছিল, সে গোবিন্দলালকে লাভ করিবে আর আশঙ্কা বলিতেছিল, গোবিন্দলালকে লাভ করিতে হইলে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা বিঘ্নকঙ্কর-কণ্টকিত—দুর্গম। রোহিণী যত ভাবিতেছিল ততই তাহার বিশ্বাস জন্মিতেছিল, সে কৃষ্ণকান্তের উইল চুরি করিয়া গোবিন্দলালের যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহার প্রতীকার করিলে গোবিন্দলাল তাহার মনের কথা বুঝিবে—সে-ও কৃতকার্যের জন্য দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। প্রকৃত উইল সে হরলালকে দেয় নাই, আপনি রাখিয়াছিল। সে অনেক চিন্তা করিল—আকাঙ্ক্ষার জয় হইল—আশঙ্কা পরাভূত হইল; একদিন আকাঙ্ক্ষা তাহাকে যে দুঃসাহস দিয়াছিল, সে তাহাকে আবার সেই দুঃসাহস দিল, রোহিণী স্থির করিল—হরলালের প্রলোভনে যেমন ভাবে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল তাহার স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ভাবে জাল উইল চুরি করিয়া তাহার স্থানে প্রকৃত উইল রাখিয়া আসিবে—গোবিন্দলালের ক্ষতি সে করিবে না; কারণ, সে গোবিন্দলালের রূপগুণে মুগ্ধ। আর হরলালের উপকার-পথও রুদ্ধ হইবে। প্রকৃত ও জাল উভয় উইলই ব্রহ্মানন্দের লিখিত; সুতরাং জাল উইলের বিষয় কৃষ্ণকান্ত জানিতে পারিলে ব্রহ্মানন্দের বিপদ অনিবার্য। তাহাও তাহার পূর্বাবলম্বিত উপায়ে উইল পরিবর্তনে প্ররোচিত হইবার অন্যতম কারণ। কিন্তু হরলাল প্রদর্শিত প্রলোভন আর রোহিণীর উইল চুরি উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অল্প ছিল—এবার তাহা নহে,—দুশ্চিন্তায় কয় দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। সেইজন্য "রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল।" বোধ হয়, তাহাই কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে তাহার এবার ধরা পড়িবার কারণ। সে ধরা পড়িল; কিন্তু কৃষ্ণকান্ত হরলাল নহেন; সেই জন্য মিথ্যা গল্প বলিয়া উদ্ধার পাইবার উপায় এক্ষেত্রে ছিল না। সে তাহার মনের কথাও কৃষ্ণকান্তের কাছে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই জন্য সে ধরা পড়িয়া বলিল—"আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।" অসাধারণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণকান্ত তাহার কার্যের কারণ অনুমান করিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। তিনি বুঝিলেন—ইহার মূলে হরলাল আছে; কিন্তু রোহিণীর মত নারীর চরিত্রের জটিল রহস্য—তাহার মনে আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য আর তাহার "বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার" ইচ্ছা—এ সকল তিনি মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু রোহিণীর ব্যবহারে—বিশেষ তাহার "আমি কিছু বলিব না" দৃঢ়ভাবে উক্ত এই কথায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন—"তুমি মন্দ কর্ম করিতে আসিয়াছিলে, সন্দেহ নাই; নহিলে এ প্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দন্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিসে দিব না! কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।" রোহিণী ভয় পাইল না—আপত্তি করিল না—তাহাতে যে কোন ফল হইবে না, তাহা সে জানিত। সেই জন্য সে দৃঢ় হইয়াছিল।

রোহিণী রাত্রির মত আবদ্ধ থাকিয়া প্রাতে যখন কৃষ্ণকান্তের কাছারীতে নীত হইয়া "এক তরফা" বিচারের ফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময় গোবিন্দলাল তাহার পত্নীর নিকট গত রাত্রির ঘটনার কথা শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল পূর্বে পুষ্করিণীর ঘাটে রোহিণীকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিয়াছিল—তাহার জন্য দুঃখানুভব করিয়াছিল। সে কেন কান্দিতেছিল তাহা জানিবার জন্য গোবিন্দলালের অকারণ আগ্রহ বা কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু সে কথা সে ভুলিতে পারে নাই। ক্যাম্পবেল বলিয়াছেন—"Beauty's tears are lovelier than her smiles." "সুন্দরীর মৃদুহাস্য অপেক্ষাও তাহার অশ্রু মধুর।" সুন্দরী রোহিণীর সেই অশ্রুপাতের স্মৃতি গোবিন্দলালের মনে পড়িল। সে রোহিণীর সেই ক্রন্দনের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না—সে কিছু চুরি করিতে নিশীথে—সকল বিপদ তুচ্ছ ভাবিয়া—কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে আসিয়াছিল। সেইজন্য গোবিন্দলালের অতৃপ্ত কৌতূহল বর্ধিত হইল—সে জ্যেষ্ঠতাতের কাছে গেল।

গোবিন্দলাল তথায় উপস্থিত হইলে "অধোবদনা, অবগুণ্ঠনবতী" রোহিণী "অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল।" গোবিন্দলাল সিদ্ধান্ত করিলেন বটে—"এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা"। কিন্তু সেই সময়ে—সেই অবস্থায় অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া—কটাক্ষ করায় রোহিণীর স্বভাব সপ্রকাশ হইল। পশুজাতিও তাহার বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য যে রোহিণী এক দিন রন্ধনশালায় মার্জারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল—আজ সে পরীক্ষা করিতে চাহিল—সে কটাক্ষে রূপযৌবন-সম্পন্ন গোবিন্দলাল শিহরে কিনা। কটাক্ষে গোবিন্দলাল শিহরিল, নহিলে কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইল না কেন? আর নহিলে সে জ্যেষ্ঠতাতের নিকট সাহস করিয়া বলিল কেন—"আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে এক বার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।" সে কথা যে সাধারণ নহে, তাহা কৃষ্ণকান্তের স্বগত উক্তিতেই বুঝা যায়—"দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?" অর্থাৎ গোবিন্দলাল জ্ঞানে না হইলেও অজ্ঞানে যে বিপদের পথ গ্রহণ করিতেছিল, তাহা সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞ কৃষ্ণকান্ত অতি সহজেই লক্ষ্য করিলেন এবং লক্ষ্য করিয়া স্নেহের পাত্র গোবিন্দলালের জন্য দুঃখিত ও শঙ্কিত হইলেন—কেবল স্নেহবশে তাহাকে নিবৃত্ত হইবার আদেশ করিলেন না। তিনি সে আদেশ করিলে, বোধ হয়, গোবিন্দলাল আর সেই প্রলোভনপিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইতে পারিত না।

গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে অন্তঃপুরে ভ্রমরের নিকট পাঠাইলেন। ভ্রমর—সরলা—সে তাহাকে তথায় প্রেরণের কারণ অনুমান করিতে পারিল না, তাহাকে কিছু বলিল না। শেষে গোবিন্দলাল তথায় আসিলে সে যেন নিষ্কৃতি পাইয়া পলাইয়া গেল। গোবিন্দলালকে দেখিয়া রোহিণীর মনে হইল—সে ত গোবিন্দলালের জন্য মরিতে বসিয়াছে, এখন "আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় এক বার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" তখন "রোহিণী না পারে এমন কায নাই।" গোবিন্দলাল যখন ঘটনার বিষয় জানিতে চাহিল,

তখন রোহিণী বুঝিল, তাহার সুযোগ ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, সে তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিবে। সে প্রথমে যে সব জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতেই গোবিন্দলাল বুঝিলেন—"ইহার যোড়া নাই।" সে এমন ভাব দেখাইল যে, তাহার যত লজ্জা কলঙ্ক-রটনায়। সে তখনও ছল করিয়া "আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদামের প্রতি দৃষ্টি করিল"—বলিল "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।" রোহিণী বুঝিল, গোবিন্দলালের হৃদয় তাহার জন্য করুণাসিক্ত হইয়াছে, সে মনে করিল, সত্যই এ সময় গোবিন্দলাল অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও বিশ্বাস করিতে পারে। তখন সে উইল সম্বন্ধীয় কথা বলিল। এ বার সে সত্য কথা বলিল। সত্যের প্রতি যে তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল—সত্যকথন সম্বন্ধে কোনরূপ "কুসংস্কার" ছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; হরলালকে সে বিষয়ে সে সত্য বলে নাই, "একটি মিথ্যা উপন্যাস" বলিয়াছিল। তখন তাহাই তাহার স্বার্থের অনুকূল ছিল। এখন সত্যই স্বার্থের অনুকূল—সে যে গোবিন্দলালের জন্যই বিপদ বরণ করিয়াছে; তাহা গোবিন্দলালকে জানাইয়া দেওয়াই তাহার অভিপ্রেত। সে বলিল, সে যে জাল উইল চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে, তাহাতে সম্পত্তির "বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।" গোবিন্দলাল তখনও রোহিণীর কার্যের কারণ অনুমান করিতে পারিল না, বলিল, "কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই!" গোবিন্দলাল তখনও তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল না দেখিয়া "রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।" তখন তাহার লজ্জার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; সে তখন গোবিন্দলালের চিত্ত জয় করিতে বদ্ধপরিকর; সে বলিল—"না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখন পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখন পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।" "কলঙ্কে, বন্ধনে রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল" বটে, কিন্তু তখনও সে গোবিন্দলালকে যে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না; তাই তাহাকে সে কথা আরও অনবগুণ্ঠিত করিয়া বলিতে হইল—

"আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। * * এক বার ছাড়িয়া দিন কাঁদিয়া আসি। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশছাড়া করিয়া দিবেন।"

এতক্ষণে গোবিন্দলাল রোহিণীর মনের ভাব বুঝিল, কিন্তু সে রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল না—রোহিণীর কথায় আহ্লাদিত বা ক্রুদ্ধও হইল না; সে বলিল :—

"রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার ভাল; কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

রোহিণী হতাশ হইল। গোবিন্দলাল তাহাকে দেশত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু সে যখন বলিল, তাহার দেশত্যাগের উদ্দেশ্য—"তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়"—তখন তাহার আশা-দুরাশা বর্ষার বারিপাতে আগাছার মত উঠিল—সে "বড় সুখী হইল।" আশা

চোরাবালুর ভিত্তির উপরেও সৌধ গঠিত করে—আকাশ-কুসুম দেখিতে পায়। মহাভারতকার দেখাইয়াছেন, যখন ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলেন, আচার্য দ্রোণ দেহরক্ষা করিলেন এবং কর্ণও পতিত হইলেন, তখনও দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ জয়ের আশায় কায করিতে লাগিলেন। কবি গোল্ডস্মিথ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, সে-ও আশায় নির্ভর করে—

"The wretch condemn'd with life to part,
Still, still on hope relies;
And every pang that rends the heart
Bids expectation rise."

সে সুখী হইল; কারণ, সেই অতৃপ্ত কামনা সে কিরূপে প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না—তাহা প্রকাশ করিবার অবসর অপ্রত্যাশিত উপায়ে আবির্ভূত হইল—আগ্নেয়গিরির আবরণ বিদীর্ণ করিয়া গৈরিক স্রাব বাহির হইল; আর সে দেখিল, সেই গৈরিক স্রাবে গোবিন্দলাল ভয় পাইল না, ঘৃণায় সরিয়া গেল না। রোহিণী আশা করিল, সে জয়ী হইবে। সেই জন্য গোবিন্দলাল যখন বলিল—"তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।" তখন সে সেই কথার যে অর্থ করিল, তাহাই তাহার মনের কামনারঞ্জিত।

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের সহিত হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রস্তাবের আলোচনা করিতে তাহার গৃহে গেল বটে, কিন্তু সে কথা বলিল না। "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না * * * আমি কলিকাতায় যাইব না—কোথাও যাইব না।"

সেই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সেই কথা সে গোবিন্দলালকে বলিতে গেল। সে মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল :

"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায়; আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি, প্রভু? রাখিব কি প্রভু? হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি, হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তাহার এই প্রার্থনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না—সে হয় ত হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারপ্রভাবে ক্ষণিক বিচলিত হইয়াছিল। কারণ, তখন তাহার মনের কামনা—"ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।" ধর্মের জন্য সে যে ব্যাকুলা ছিল না, তাহা তাহার হরলালকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেই সপ্রকাশ হইয়াছিল।

সে জানিত, তাহার মূলধন রূপ; হয় ত ভ্রমরকে দেখিয়া ভ্রমরের সহিত আপনার তুলনা করিয়া সে তাহার আশার অনলে ইন্ধন যোগ করিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

সে সুমতি চাহে নাই, সে মোহগ্রস্ত; সেই জন্যই তাহার "স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপূর্ণ হৃদয় থামিল না।" তাহার হৃদয় তখন দুরাশায় স্ফীত, লজ্জাহৃত আর সে যাহাকে অপরিমিত প্রেম মনে করিতেছিল, তাহা প্রেম নহে—লালসা। কারণ প্রেম স্বর্গীয়—

"Love indeed is light from heaven
A spark of that immortal fire

* * * *

To lift from earth our low desire."

রোহিণীর হৃদয় সেই প্রেম রক্ষা করিবার উপযুক্ত আধারে পরিণত হয় নাই। কালিদাসের যক্ষ বলিয়াছিল—

"আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশ প্রায় শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়শাশেরুণদ্ধি।"
"বিরহে নারীর হিয়া কুসুম-সদৃশ-সুকোমল
আশা-বৃন্তে করি' ভর কোনরূপে রহে সে সবল।"

রোহিণী আশায়—দুরাশায় চালিত হইয়াছিল এবং গোবিন্দলালকে লাভের আশায় সে কলঙ্কজনিত লজ্জা পর্যন্ত ভুলিয়া হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগে অসম্মত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা সে দেখিতে পাইল না—দিক্‌চক্রবালের মত মনে হইতে লাগিল—গোবিন্দলালের দিক হইতে কোনরূপ আগ্রহের পরিচয় সে পাইল না; আবার গ্রামেও, বোধ হয়, তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই রোহিণীর মনে পড়িল—গোবিন্দলাল তাহার প্রেমনিবেদনে প্রথমেই বলিয়াছিল— "মৃত্যুই, বোধ হয়, তোমার ভাল"—কিন্তু সেই পরামর্শ নিষ্ঠুর বলিয়া সে পরে বলিয়াছিল, সকলেই কাজ করিতে সংসারে আসিয়াছে—কাজ না করিয়া মরিবে কেন? আর তাহার মনে পড়িল—নিশ্চয়ই গোবিন্দলালের নিকট তাহার নির্লজ্জ কথা শুনিয়া ভ্রমর—যে ভ্রমর রূপে তাহার নিকটবর্তী হইতেও পারে না—সেই ভ্রমর ক্ষীরিদাসীকে দিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল—"তুমি মর" এবং সে উপায় জানিতে চাহিলে উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল—"বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় দিয়ে।" সে তখন বলিয়াছিল—"আচ্ছা"। রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গেল। কিন্তু তাহার মরা হইল না। গোবিন্দলাল পুষ্করিণীর কাচতুল্য স্বচ্ছ জলে কলসী ভাসিতেছে দেখিতে পাইলেন। ঘাটের সর্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, "স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।"

এইরূপ অবস্থায় মানুষের—বিশেষ শিষ্ট সমাজের মানুষের মনে অনুকম্পার উৎস উদ্‌গত হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সেই উৎস হইতে উদ্‌গত অনুকম্পা প্রবল হইবার বিশেষ কারণ ছিল—গোবিন্দলালই একদিন রোহিণীর কথা শুনিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মৃত্যুই, বোধ হয়, তোমার ভাল" আর তাঁহার ভ্রমর তাহা জানিয়া তাহাকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে পরামর্শ দিয়াছিল। গোবিন্দলাল অনুকম্পাবশে রোহিণীকে জল হইতে তুলিল এবং তাহার পরে উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে লইয়া যাইয়া শুশ্রূষায় তাহাকে বাঁচাইল। বাঁচিয়াই সে কতক দুঃখে—কতক অভিমানে বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী?" তখনই তাহার ছলনার প্রবৃত্তি প্রবল হইল—সে লজ্জা পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিল ; এখন বলিল—"আমি পাপপুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?" মনের অগোচরে পাপ নাই—তাহার পাপ কি তাহা রোহিণীর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সে এমন ভাব দেখাইল যে, সে পাপ করে নাই! তাহার পরে সে যখন বুঝিল, গোবিন্দলাল তাহার দুঃখে কাতর হইয়াছে, তখনই একাঘ্নী বাণের মত মর্মভেদী কথা বলিল—"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" তাহার পরে সেই কথার ভাষ্যরূপে বলিল—"রাত্রি দিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" এই কথা বলিয়া রোহিণী একাই গৃহে গেল।

রোহিণীর স্পর্শে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল কি না বলা যায় না। রোহিণী জানিল না বটে যে, তাহাকে বিদায় দিয়া গোবিন্দলাল বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া—ধূল্যব-বুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল যে জমীদারী পরিদর্শনে গেল, সে সংবাদ পাইয়া হয়ত তাহার মনে হইয়াছিল গোবিন্দলাল তাহাকে বলিয়াছিল—"তোমায় আমায় আর দেখাশুনা না হয়।" হয়ত সে মনে করিয়াছিল, তাহার সহিত যাহাতে দেখাশুনা না হয়, সেইজন্যই গোবিন্দলাল স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। সে গোবিন্দলালের দৌর্বল্যের সন্ধান পাইয়াছিল। যেদিন রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, সে দিন তাহার—গোবিন্দলালের শুশ্রূষায় সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিয়াছিল, "একদিকে স্ফটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর এক দিকে হৃদয়াধারের জীবন-প্রদীপ জ্বলিতেছে।" উড়িয়া মালী সেই সন্ধ্যায় যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সে নিশ্চয়ই তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিল—ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিবার সময় হয়ত কিছু অতিরঞ্জন বর্জন করা যায় নাই। আর পল্লীর মধ্য দিয়া রোহিণী যখন গৃহে ফিরিতেছিল, তখনও নিশ্চয়ই পল্লীর কোন কোন লোক তাহাকে দেখিয়াছিল—নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারে কে কোথায় জল আনিতে যায়? তাহার পূর্বেই নিশীথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে রোহিণীর উইল চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়া ও গোবিন্দলালের অনুগ্রহে তাহার মুক্তিলাভ—সব কথাই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল। "রটনা-কৌশলময়ী কলঙ্ক-কলিতকণ্ঠা কুলকামিণীগণ" যে সে কথা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে

করা অসঙ্গত হইবে না। ক্ষীরোদা দাসী পাঠিকা হরমণি ঠাকুরাণীকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেও তাহার পরিচয় স্বপ্রকাশ। প্রথমে দাসীরা ভ্রমরের কল্যাণকামনাপ্রণোদিত হইয়া এবং পরে পাড়ার মহিলারা কেহ বা ভ্রমরকে সতর্ক করিয়া দিলেন, কেহ বা ঈর্ষাবশে ভ্রমরকে সে সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভ্রমর কিন্তু কাহারও কথায় বিশ্বাস করিল না—কাহাকেও কাহাকেও কড়া কথা শুনাইয়া দিল; তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। "তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য—দেবদুর্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না।"

গ্রামের লোকের কথা রোহিণী শুনিত। সে বুঝিয়াছিল—ভ্রমরই তাহার গোবিন্দলাল লাভে বাধা। তাহার পাপ মনে সঙ্কল্প হইল, সে ভ্রমরকে সুখে থাকিতে দিবে না। এরূপ অবস্থায় গ্রামের রোহিণী-প্রকৃতি নারীরা যে উপায় অবলম্বন করে, সে তাহাই করিল। সে "কোন প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে একখানি বারানসী শাড়ী ও একসুট গিলটির গহনা চাহিয়া" আনিয়া—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সন্ধ্যার পরে রায়দিগের অন্তঃপুরে ভ্রমরের কাছে গেল। সে ভ্রমরের "মুণ্ডপাত" করিবার অভিপ্রায়ে পুঁটুলি খুলিয়া নির্লজ্জভাবে মিথ্যা কথা বলিল—ঐগুলি গোবিন্দলাল তাহাকে উপহার দিয়াছে! ভ্রমর অলঙ্কারগুলি পদাঘাতে ছড়াইয়া ফেলিলে সে সেইগুলি গুছাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। ওদিকে তাহারই প্ররোচনায় ব্রহ্মানন্দ জমীদারীতে গোবিন্দলালকে লিখিল, ভ্রমর "রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।"

রোহিণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল—ভ্রমর কোন দোষ না করিলেও গোবিন্দলালের কাছে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইল, গোবিন্দলাল দোষ না করিয়াও ভ্রমরের কাছে দোষী বিবেচিত হইল। ভ্রমর পিত্রালয়ে গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইতে নিষেধ করিল। আবার উদ্যানমধ্যে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সাক্ষাৎ হইল। প্রায়াগতা "যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না।" এক জন স্ত্রীলোককে সোপানাভিমুখে যাইতে দেখিয়া গোবিন্দলাল বলিল, "কে গা তুমি? আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।" রোহিণী সেই শব্দ স্পষ্ট বা অস্পষ্ট-ভাবে শুনিয়া কলসী নামাইয়া উদ্যান-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গোবিন্দলালের কাছে মণ্ডপতলে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?" গোবিন্দলাল তাহাকে ডাকে নাই—কিন্তু সে চাহিতেছিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ডাকে, সেইজন্যই গোবিন্দলালের কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও না বুঝিবার ছল করিয়া তাহার কাছে গেল। গোবিন্দলাল "ডাকি নাই" বলিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?" যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন যে পুষ্করিণীতে জল লইতে আইসে, তাহার পক্ষে সিক্ত হওয়া অবশ্য অনিবার্য। কাজেই, গোবিন্দলালের ঐ উক্তির কোন গোপন অর্থ আছে—ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া রোহিণী তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্বে গোবিন্দলালকে বলিল—"এখানে দাঁড়াইয়া

বলিব কি?" প্রসাদপুরে নীলকুঠির গৃহে যখন নিশাকরের দৃষ্টির সহিত রোহিণীর দৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল, সেই সময়ের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কিনা, তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাকে।" এ ক্ষেত্রে গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর সেইরূপ কোন "কথা" হইয়াছিল কি? নহিলে গোবিন্দলাল রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া যাইবে কেন। "সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এইমাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্বে বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।"

এই রূপজ মোহ মোহাবিষ্ট গোবিন্দলালকে ভুলের পর ভুলে জড়িত করিতে লাগিল। রোহিণী তাহার জন্য যে রূপের ফাঁদ পাতিয়াছিল, তাহাতে সে জড়াইয়া পড়িল। সেই মোহবশেই গোবিন্দলাল স্নেহশীল কল্যাণকামী পিতৃব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিল। সেই মোহই তাহাকে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগে প্ররোচিত করিল। সে যখন হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তখন সে রোহিণীর সঙ্গে যোগ রাখিয়া গিয়াছিল। সে যোগ ব্রহ্মানন্দের দ্বারা হইয়াছিল কিনা, বলা যায় না। তবে গোবিন্দলাল যখন মাতার নিকট হইতে যাইয়া প্রসাদ-পুরের সান্নিধ্যে তাহার জন্য বিলাসকুঞ্জ রচনা করিল, তখন—"একদিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে; বাহির হয় না। * * তারপর একদিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূল-রোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?"

ইহার পরে আমরা রোহিণীকে দেখিতে পাই চিত্রা-নদীতীরে নীলকুঠির অট্টালিকায়। সে তথায় গোবিন্দলালের নিকট "হাপ-পরদানসীন" ভাবে বাস করে। তাহার বেশভূষার অভাব নাই। কিন্তু, বোধ হয়, সে সেই জনহীন প্রান্তরমধ্যে গৃহে আপনাকে বন্দী বলিয়াই মনে করিতেছিল। কারণ, গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আকর্ষণ—প্রেম নহে—লালসাকলুষিত মনোভাব মাত্র। যে প্রেম বাঞ্ছিতকে সর্বস্ব দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে সে প্রেম রোহিণীর পক্ষে সম্ভব নহে। যে প্রেম সর্বস্ব দেয় তাহার সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন—

"আরও ভাল বাসিতাম তোমারে, গোপিনী।
সামান্য লজ্জার লাগি' যদি না লইতে মাগি'
যে বসন চুরি করি' নিল নীলমণি।
যে যাহারে ভালবাসে সে ত বুকে যায় আসে
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তা'র, ও রে গোয়ালিনী।
অন্তরে বাহিরে তা'র কোথা থাকে অন্ধকার?
আপনি সাধিয়া সে যে সাজে উলঙ্গিনী!"

রোহিণীর লালসাকলুষিত হৃদয়ে সে প্রেম উদ্গত হয় নাই। যে ভালবাসা নারীকে সর্ববিধ ত্যাগ সাদরে বরণ করায়, রোহিণীর হৃদয়ে সে ভালবাসার উদ্ভবও সম্ভব নহে। সেই ভালবাসা সম্বন্ধে ইংরেজ কবি পোপ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হেমচন্দ্র তাঁহার 'মদন-পারিজাতে' বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন :—

"ভূমণ্ডলপতি যদি চরণে আমার
ধরে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তা'র
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তা'র ঘরে।"

ইংরেজ কবি টেনিশন তাঁহার 'The Lord of Burlegh' নামক কবিতায় দেখাইয়াছেন, যে যে অবস্থায় অভ্যস্ত তাহার অবস্থান্তরে সুখ থাকে না। অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তান লর্ড অব বার্লে চিত্রাঙ্কনব্যপদেশে গ্রামে যাইয়া এক গ্রাম্য-বালার সারল্যে ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। বালিকা বিবাহের পরে প্রকৃত অবস্থা জানিয়া স্বামীর উপযুক্ত গৃহিণী হইবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে—স্বামীর ভালবাসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, প্রজাদিগের শ্রদ্ধা—এ সকলের মধ্যেও তাঁহার মনে হইত—যখন তিনি গ্রাম্যবালা আর তাঁহার স্বামী চিত্রকর ছিলেন তখন কি সুখের দিনই ছিল!—

"But a trouble weigh'd upon her,
And perplex'd her, night and morn,—
With the further of an honour
Unto which she was not born."

স্বামী দেখিলেন— "She droop'd and droop'd before him
Fading slowly from his side.

* * * *

Then before her time she died."

যে স্থলে সতী সাধ্বী নারীরও এই অবস্থা ঘটিতে পারে, সে স্থানে পাপপ্রবৃত্তিপরায়ণা রোহিণীর অবস্থা কিরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাই ঘটিল। কন্যার দুর্দশা দেখিয়া মাধবীনাথ তাঁহার বন্ধু নিশাকরকে লইয়া প্রসাদপুরে গমন করিলেন। নিশাকর গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তিনি রোহিণীকে দেখিলেন —রোহিণী তাঁহাকে দেখিল। পুরস্ত্রীর যে জীবন রোহিণীর আদরের ছিল না—সেই জীবন সে দুর্বহ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল। হয়ত তাহার মনে হইত—হরিদ্রাগ্রামে "হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত" বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনা—সেই "দূর হ!

কালামুখো।" বলিয়া কুজনরত কোকিলকে গালি দেওয়া, সেই পাড়ায় সকলের সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ—সেই সকলে যে সুখ ছিল, গোবিন্দলালকে লইয়া তাহার গৃহপিঞ্জরে বন্দী হইয়া থাকায় সে সুখ কোথায়? হরিদ্রাগ্রামে কে কেমন আছে, তাহা কে বলিবে? বহুদিন পরে সে প্রসাদপুরে একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখিতে পাইল;—"নিশাকর রূপবান।" তাহার মনে হইল—"অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে? * * যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুরকাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই?"

বায়রণ লিখিয়াছেন :—

"In her first passion woman loves her lover,
In all the others all she loves is love,
Which grows a habit she can ne'er get over,
And fits her loosely—like an easy glove,
As you may find, when'er you like to prove her;
One man alone at first her heart can move;
She then prefers him in the plural number,
Not finding that the additions much encumber."

প্রথম আবেগে নারী ভালবাসে প্রণয়ীকে তা'র;
তা'রপরে ভালবাসে আপনার প্রণয়ে কেবল;
তাই সে বহুরে চাহে—একে তা'র তুষ্টি নাহি আর—
বহুতে হৃদয় তা'র নাহি হয় বিরত—চঞ্চল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রোহিণীর চরিত্র আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সে যেরূপ হীনস্বভাব তাহাতে গোবিন্দলাল তাহাকে হত্যা না করিলে সে আর কাহাকেও না পাইলে, তাহার সঙ্গীত-শিক্ষক দানেশ খাঁর সঙ্গেই চলিয়া যাইত। নিশাকরের সহিত তাহার কথোপকথন শেষ হইতে পারিলে সে কি করিত বলা যায় না; কারণ, সে যে মনকে বুঝাইয়াছিল—"আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না"—তাহার কোন মূল্য নাই; সে সংকল্প নিশাকরের আহ্বানের ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারিত। কারণ, সে হরলালকে পাইবার জন্য উইল চুরি করিতে যাইতেও ইতস্ততঃ করে নাই। তাহার মনে যদি সেই সংকল্পই থাকিত তবে সে সোহাগ পাইবার জন্য ও নিশাকরকে ভুলাইবার জন্য বলিত না— "আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে আমার এমন দশা হইবে কেন? এক জনকে ভুলিতে না পারিয়া এ দেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল সে কথা শুনিয়াছিল—সে মনে করিয়াছিল, "so fair, so fawning and so false!" রোহিণীকে লইয়া আসিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিয়াছিল—"এ ভোগ, এ

সুখ নহে—এ মন্দারঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।" কিন্তু অধঃপতিত হইলেও গোবিন্দলাল রোহিণীর মত নহে—তাহার ধাতুগত সংস্কারহেতু সে রোহিণীকে ফেলিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু রোহিণীর পক্ষে গোবিন্দ-লালকে ছাড়িয়া অন্যকে আশ্রয়ের বাসনা অসম্ভব নহে। সে তখন গোবিন্দলালের গৃহে আপনাকে বন্দিনীর মত মনে করিতেছিল।—তাই সে নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল—"বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ * * * আ মরি! কি চোখ!"

গোবিন্দলালের মোহপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—তাহার ধৈর্যসীমা রোহিণীর ব্যবহারে অতিক্রান্ত হইয়াছিল। সে রোহিণীকে বলিল—"রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি, রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম?" গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল, "মরিতে পারিবে?"—রোহিণী মরিতে চাহিল না—এক দিন সে বারুণী পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল। কিন্তু আজ "সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই।" সে মনে করিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ত্যাগ করে করুক—সে মরিবে না। যে দিন সে বারুণীর জলে ডুবিয়াছিল সে দিন গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইলে সে বলিয়াছিল—"আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে, মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"—আর আজ মৃত্যুর সম্ভাবনায় সে কাঁদিয়া উঠিল—বলিল—"মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।"

অতৃপ্ত ভোগলালসা তখন রোহিণীকে পাপের পথে আরও প্রলুব্ধ করিতেছিল। কিন্তু তাহার কৃত কর্ম তখন তাহাকে যে স্থানে আনিয়াছে, তথা হইতে আর প্রত্যাবর্তনসম্ভাবনা নাই। গোবিন্দলালের মোহান্ধকার তখন দূর হইয়াছে, সে রোহিণীর স্বরূপ দেখিয়া ঘৃণায় ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে; সে বুঝিয়াছে, রোহিণী পাপ। তাহার "পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল; তারপর বড় শব্দ, তারপর সব অন্ধকার।"—"বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ" ভূমিতে লুটাইল। রোহিণীর আর বাঁচিবার অধিকার ছিল না। গোবিন্দলাল তাহাকে ত্যাগ করিলে সে যে জীবন যাপন করিত, তাহাতে সে সমাজের অকল্যাণ মাত্র হইত। এক দিকে তপ্তশোণিতরক্ত-মাংসলদল শাল্মলীকুসুম রোহিণী—আর একদিকে লতাপত্রমধ্যে গভীরবারি হ্রদের নীলিমাসুন্দর অপরাজিতা ফুল ভ্রমর—মধ্যে গোবিন্দলাল—রূপবান, গুণবান, ঐশ্বর্যাধিকারী। গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামের জমীদার বংশের সন্তান—পিতার এক পুত্র—পিতৃহীন বলিয়া জ্যেষ্ঠতাতের বড় আদরের। তাঁহার অর্থের অভাব নাই; অর্থব্যয়েও বাধা নাই; সেই অর্থব্যয় যে সুরুচি-সম্পদ-কার্যে আত্মপ্রকাশ করিত—তাহার পরিচয়, বারুণী পুষ্করিণীর বেষ্টন উদ্যান আর উদ্যানমধ্যস্থ গৃহ। জ্যেষ্ঠতাত প্রবল-প্রতাপ; গ্রামে ও জমীদারীতে "আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ।" অথচ সেই জ্যেষ্ঠতাতের নিকট তাঁহার আবদার সর্বদা রক্ষিত হয়। তিনি তাহা জানিতেন বলিয়াই

রোহিণী উইল পরিবর্তন করিতে যাইয়া ধরা পড়িলে তিনি তাহার জন্য জ্যেষ্ঠতাতের নিকট অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন।

গোবিন্দলাল যে তখনও বিমলচরিত্র ও অমলচিত্ত তাহা তাহার রোহিণীর জন্য নিঃসঙ্কোচে কৃষ্ণকান্তের নিকট অনুরোধ করিতে গমনেই স্বপ্রকাশ। যে পরিবেষ্টনে যেভাবে সে পালিত ও বর্ধিত তাহাতেই তাহার মানসিক দৌর্বল্যের কারণ উদ্ভূত হইয়াছিল। সে যাহা চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে—তাহার রূপ অসাধারণ, তাহার অর্থ প্রভূত, সে বিধবা জননীর "অন্ধের যষ্টি," বংশপতি জ্যেষ্ঠতাতের নয়নের মণি; সে ভ্রমরের প্রেমে পরিতৃপ্ত—সুখী। যে কখন কোন অভাব ভোগ করে না—কোন বিষয়ে বাধা পায় না, তাহার মনে দৌর্বল্য স্বভাবতঃ থাকিয়া যায়। ইংরেজীতে তাহাকে "spoilt child" বলে—বাঙ্গালায় চলিত কথায় বলা হয়, তাহার মাথা খাওয়া হইয়াছে। সেরূপ লোক স্বভাবতঃ মনে করে, পৃথিবীর উদ্যানে সকল ফুল সে চয়ন করিতে পারে; আর যদি পুষ্পচয়নকালে, অতি ক্ষুদ্র কণ্টক অঙ্গুলী বিদ্ধ করে, তবে সে এমন আর্তনাদ করে যে, মনে হয়, তাহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

গোবিন্দলালের সহিত পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ বারুণী পুষ্করিণীর কূলে পুষ্পোদ্যানে। সে দেখিল, পুষ্করিণী হইতে জল লইতে আসিয়া গ্রামের ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী বিধবা রোহিণী ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। সূর্য অস্ত গেল—চন্দ্রোদয় হইল। গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিল, রোহিণী তখনও ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে, দেখিয়া তাহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল; তাহার মনে হইল—এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি, তবে কেন করিব না?"—এই দার্শনিকোচিত মনোভাব লইয়া সে যাইয়া রোহিণীকে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল—যদি তাহার কোন উপকার করিতে পারে। তাহার এই "অসময়ের করুণাটি" যে রোহিণী ভুল বুঝিতে পারে—যাহার ভাবনা যেরূপ সে যে সেইরূপ বুঝে তাহা গোবিন্দলাল কল্পনা করিতে পারিল না—পারিলে কখনই ঐ অহেতুকী করুণার পরিচয় দিত না।

তাহার পরে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাই—নিশাশেষে তাহার শয়নকক্ষে—উদ্যানস্থিত মল্লিকা-গন্ধরাজ-কুটজের সুগন্ধবাহী সমীরণ সেবনের জন্য বাতায়নের সম্মুখে। তাহার পার্শ্বে "ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা"—তাহার পত্নী ভ্রমর। সে স্ত্রীর "মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্ত-লোচনে দৃষ্টি করিতেছিল"—"সেই সময়ে সূর্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্বদিক হইতে আসিয়া পূর্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমলা, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল।

হাসি-চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।"

যে দিন এইরূপ পবিত্র আনন্দের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনাকাশে প্রলয়ের মেঘ দেখা দিল। বাইবেলের সেই কথা—

"Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand......And it came to pass......that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain." নবীনচন্দ্র এক দিনের কথায় সূর্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন :

"পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন,
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!'

যখন গোবিন্দলাল ও ভ্রমর পরস্পরের প্রেমে পরিতৃপ্তির পূর্ণ আনন্দসম্ভোগ করিতেছিল, তখন গৃহে দাসীদিগের মধ্যে রোহিণীর ধরা পড়ার কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। তাহাদিগের আলোচনা হইতে ভ্রমর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা গোবিন্দলালকে দিল এবং গোবিন্দলালের ঘাড় নাড়া দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। কারণ—"গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" ভ্রমরের নিকট সংবাদ পাইয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইল। কারণ, গোবিন্দলাল পরদুঃখকাতর।

গোবিন্দলালের এই পরদুঃখকাতরতা তাহার স্বভাবগত দৌর্বল্যমাত্র কি না, তাহা বলা যায় না। অর্থাৎ যে দিন সন্ধ্যায় বাপীতটে রূপসী রোহিণীকে রোদনরত দেখিয়া সে তাহার প্রতি করুণার্দ্র হইয়াছিল, সেই দিন সেই অহেতুকী করুণার মধ্যে রূপজ মোহ—কুসুমে কীটের মত প্রবেশ করিয়াছিল কি না, কে বলিবে? কারণ, পরদুঃখকাতরতা যত প্রশংসনীয়ই কেন হউক না, তাহারও পাত্রভেদ—অধিকারিভেদ থাকে। সত্য বটে—

"The quality of mercy is not strain'd ;
It droppeth as the gentle rain from heaven ;
Upon the place beneath: it is twice bless'd ;
It blesseth him that gives, and him that takes." ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা যাহাকে প্রদত্ত হয়—যাহার প্রতি বর্ষিত হয়, সে তাহা লাভের উপযুক্ত না হইলে—অমৃত যেমন বিষে পরিণত হইতে পারে, তেমনই অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া অনিষ্টের কারণ হইতে পারে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, রাক্ষস দেবতার বর লাভ করিয়া সেই বরের অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারে আগ্রহানুভব করিয়াছে; কারণ, সে বরলাভের যোগ্য নহে। গোবিন্দলাল যে সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠতাতের কোন কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিত না, তাহা রোহিণীর বিষয় জিজ্ঞাসার জন্য গোবিন্দলালকে আগ্রহশীল দেখিয়া তীক্ষ্ণ

বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ কৃষ্ণকান্তের উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়—"হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" রোহিণী সেই অবস্থায়ও গোবিন্দলালের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। গোবিন্দলাল সেই কটাক্ষের অর্থ করিয়াছিল—"ভিক্ষা।"—"আর্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ হইতে উদ্ধার।" রোহিণীর প্রতি সে যেমন অহেতুকী করুণানুভব করিয়াছিল, তেমনই তাহার নিশীথে জ্যেষ্ঠতাতের শয়নকক্ষে যাইয়া উইল ছিঁড়িবার ব্যাপারে "আসল কথা" জানিবার জন্য অকারণ কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিল না। এই কৌতূহলের সঙ্গে কি বাপীতটের ঘটনার কোন সম্বন্ধ ছিল না?

সে সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, রোহিণী যে সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। অহেতুক দয়ার মত অহেতুক কৌতূহলকে যে সে এক সূত্রের আকর্ষণ মনে করিয়াছিল, তাহা তাহার কাছারীতে কটাক্ষ করায় বুঝিতে পারা যায়। সে সূত্র কি তাহার রূপের সূত্র?

গোবিন্দলালের কৌতূহলই রোহিণীকে তাহার বাঞ্ছিত সুযোগ প্রদান করিল। সে গোবিন্দলালকে পরীক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইল। আর গোবিন্দলাল তাহার ব্যবহারে, তাহার কথায় "ইহার যোড়া নাই" বুঝিয়াও কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিল না। রোহিণীর কথায় হীরামালিনীর কথারই মত "হীরার ধার," আর সে কথায় কথা বাড়াইয়া গোবিন্দলালকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন বুঝিল, অবস্থা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল, তখন বলিল, সে গোবিন্দলালের জন্যই উইল চুরি করিয়া প্রকৃত উইল কৃষ্ণকান্তের দেরাজে রাখিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পরে তাহার সে কাজের কারণ জিজ্ঞাসায় সে যাহা বলিল, তাহাই "প্রেম সম্ভাষণ", কিন্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ অনিবার্য।

গোবিন্দলাল রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইল। তাহার "সমুদ্রবৎ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।" কিন্তু উদ্বেলিত হৃদয়-সমুদ্রের সেই দয়ার তরঙ্গ-চূড়ার মধ্যে কি মোহাবেশ ছিল? যদি না ছিল, তবে গোবিন্দলাল কিরূপে নির্বিচারে রোহিণীর কথা বিশ্বাস করিল? তাহার একবারও মনে হইল না—রোহিণী তাহার জন্য জাল লইয়া প্রকৃত উইল দিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জাল উইল সে পূর্বে কেন আনিয়াছিল? দুরন্ত হরলালের যে বংশগৌরববোধ ছিল, গোবিন্দলাল তাহার পরিচয় দিতে পারিল না—"যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখন গৃহিণী করিতে পারিব না।" গোবিন্দলাল বলিল বটে, "রোহিণি, মৃত্যুই, বোধ হয়, তোমার ভাল"—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মৃত্যু হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিল—সেজন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে আগ্রহশীল হইল—তাহাকে ও তাহার পিতৃব্যকে কলিকাতায় পাঠাইতে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাতে তাহারও যে কলঙ্ক তাহাও বুঝিতে চাহিল না বা পারিল না। সে বলিল, "তোমায় আমায় আর দেখা-শুনা না হয়।"

গোবিন্দলালের সহিত এইস্থানেই প্রতাপের প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রতাপ শৈবলিনীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়েন নাই—তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।" সেই জন্যই

রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না।"—আর "ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্তস্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন।"—আর গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন,—"যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও।"

গোবিন্দলাল যদি রোহিণীর জন্য অকারণ করুণা ব্যক্ত না করিত, আর রোহিণী সেই করুণার অন্তরালে তাহার রূপজ মোহ লক্ষ্য বা কল্পনা না করিত, তবে যে রোহিণীর কার্যের পরে, ঘৃণিতা রোহিণী হরিদ্রাগ্রামে বাস অসম্ভব বুঝিয়া স্থান ত্যাগ করিত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। গোবিন্দলালের তাহার প্রতি "করুণাই" রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রামে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, সে তাহার রূপের রজ্জুতে গোবিন্দলালকে বন্ধ করিয়া আপনার কাছে আনিতে পারিবে। গোবিন্দলালই তাহার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি।

গোবিন্দলালের মনে দয়াই দেখা গেল—কিন্তু ঘৃণার উদ্রেক হইল না। "পাপকে ঘৃণা করিও, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।"—একথা সাধারণ মানুষের জন্য নহে; কারণ, পাপকে ঘৃণা না করিলে যেমন পাপীর সংশোধন অসম্ভব হয়, তেমনই যে ঘৃণা না করে, তাহার বিপদ ঘটিতে পারে। গোবিন্দলাল রোহিণীর পাপকেও ঘৃণা করিতে পরিল না—তাহাই তাহার অধঃপতনের কারণ হইল। এমন কি যখন রোহিণী—যে কারণেই কেন হউক না—ইচ্ছা করিয়া মরিবার জন্য জলে ডুবিল, তখন গোবিন্দলালের মনে পড়িল—সে একদিন রোহিণীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "মৃত্যুই, বোধ হয়, তোমার ভাল"—আর ভ্রমর তাহাকে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিল। সে জলে ডুবিয়া রোহিণীকে তুলিল। তখন "রোহিণী জীবিত আছে কিনা সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাস-প্রশ্বাসরহিত।" সে অবস্থায় তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সে মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন্ করিয়া শুশ্রূষার জন্য উদ্যানস্থ প্রমোদ-গৃহে লইয়া গেল। দীপালোকে গোবিন্দলাল বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত রোহিণীকে দেখিল—রোহিণীর রূপ দেখিল। তাহার চক্ষুতে জল আসিল; সে বলিল;—"মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" বাগানের মালী ব্যতীত আর সকল ভৃত্য যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল—নিকটস্থ কোন গৃহ হইতে কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করিলেন না। মালীকে রোহিণীর হাত দুইখানি ধীরে উঠাইয়া পরে নামাইতে উপদেশ দিয়া—"সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া" রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিল। রোহিণী বাঁচিল। চৈতন্য লাভ করিয়াই রোহিণী অভিমানের সুরে বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? গোবিন্দলাল পাপমুখে লোকের অধিকার বিচার করিতে আরম্ভ করিল। রোহিণীর সে বিচারে আগ্রহ ছিল না। গোবিন্দলাল তাহাকে দেখিয়াছে—সে তাহার স্পর্শলাভ করিয়াছে; সে বলিল, গোবিন্দলালকে লাভ করিতে না পারায় তাহার "রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয়

পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে স্পর্শ করিতে পারিব না।" গোবিন্দলাল বলিয়াছিল, "আত্মহত্যা পাপ"—রোহিণী বলিয়াছিল, "আমি মরিব।" রোহিণী বাঁচিয়া চলিয়া গেল আর—"গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপাতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ভাবিতে লাগিলেন—'হা নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।" গোবিন্দলালের মনে হইল সে মরিবে—ভ্রমর মরিবে, সে কি "Coming events cast their shadows before"? গোবিন্দলালের মৃত্যু নৈতিক—ভ্রমরের মৃত্যু শারীরিক।

গোবিন্দলাল তখন মানুষের স্বভাবজ ও সংস্কারগত ভাব বর্জন করিতে পারে নাই। সে জানিত—পাপের ফল মৃত্যু। সে কেবল মনে করে নাই—দয়া হইতে মোহ উৎপন্ন হইতে পারে— "Pity melts the mind to love." সে রামায়ণকারের সেই কথা মনে করিয়াও সাবধান হইতে পারে নাই—"যে পুরুষ স্বভার্যাতে সন্তুষ্ট নহে, সেই অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে এবং সজ্জনরা তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন।" তাহার মনে যদি কোন দোষ না থাকিত, তবে সে সেই রাত্রির ঘটনা অকপটে ভ্রমরকে বলিতে কুণ্ঠিত হইত না!

গোবিন্দলাল যদি সরলভাবে সে সন্ধ্যার কথা ভ্রমরকে বলিত, তবে হয়ত সে অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইত; কারণ, অনেক স্থানে দেখা যায়, পুরুষের কুটিল বুদ্ধি যে ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়, স্ত্রীলোকের সরল বুদ্ধি তথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহার কারণ, নানারূপ স্বার্থের প্রভাবে পুরুষের বুদ্ধি প্রভাবিত হয়; নারীর বুদ্ধি একই লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হয়।

> "Man's love is of man's life a thing apart,
> 'Tis woman's whole existence".

"প্রণয় রমণী-জীবন—ইহকাল—পরকাল।" এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে, যে দিন গোবিন্দলাল রোহিণীকে পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া কান্দিতে দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে দিনও যে ভ্রমরকে সে কথা বলে নাই—পরস্ত্রীর প্রতি তাহার অহেতুকী দয়ার বিষয় গোপন রাখিয়াছিল—এমন কি যে দিন রোহিণী চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে জানিয়া সে তাহাকে উদ্ধার করিতে আগ্রহানুভব করিয়াছিল, সে দিনও—ভ্রমরের সহিত তাহার সেই বিষয়ে কথোপকথনে—সে বিষয় ব্যক্ত করে নাই, তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। সে রোহিণীর রূপরাশি দেখিয়াছিল, তাহার সহিত আলোচনায় বুঝিয়াছিল—"ইহার যোড়া নাই", রোহিণীর তাহার প্রতি আসক্তির কথা তাহার মুখেই শুনিয়াছিল, আর তাহার পরে ঘটনাচক্রে তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। দর্শন—শ্রবণ—স্পর্শন—তাঁহার এই পরিপূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল,

রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল।" গোবিন্দলাল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল—বুঝিয়া আপনার প্রবৃত্তি সংযত করিবার প্রশস্ত পথ ত্যাগ করিয়া—"মনে মনে শপথ করিয়া" স্থির করিয়াছিল—"মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।"

গোবিন্দলাল এইরূপ মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, স্বামিস্ত্রীর যে সম্বন্ধ সম্বন্ধে কালিদাস "অজবিলাপে" বলিয়াছেন—পত্নী ইন্দুমতী স্বামীর—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"

অর্থাৎ সংসারকর্মে গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্যালাপে সখী ও ললিত-কলাবিদ্যায় প্রিয় শিষ্যা। আর ভবভূতি বলিয়াছেন পত্নী—

"গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্তির্ণয়নয়োরসাবস্যাঃ স্বার্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনবসঃ—
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ"

অর্থাৎ ইনি আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ, ইঁহারই স্পর্শমাত্র লগ্ন চন্দন-রসস্বরূপ এবং ইঁহারই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল ও কোমল মুক্তাহারস্বরূপ।

পতিরূপে গোবিন্দলাল পত্নী ভ্রমরের সম্বন্ধে সে কথা বলিতে পারিত না। সে যদি তাহা জানিতে পারিত তবে সে ভ্রমরের পত্র-প্রাপ্তির পরেও ভ্রমরের সেই পত্র লিখিবার কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই তাহার উপর রুষ্ট হইতে পারিত না। গোবিন্দলালের ভ্রমরের সম্বন্ধে মত কি ছিল, তাহা সে মাতার সহিত কাশী-যাত্রাকালে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল—সে ভ্রমরকে বলিয়াছিল—"তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিলে আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" অর্থাৎ পত্নী পতির খেলিবার পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পর্কে এইরূপ ধারণার জন্যই গোবিন্দলাল জমীদারীতে ভ্রমরের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং ফিরিয়া আসিয়া, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে দেখিয়া, আনিতে নিষেধ করিয়াছিল।

"গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" গোবিন্দলাল যে তাহা জানিত,—ভ্রমরের যে রোহিণীকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল সে কেবল গোবিন্দলাল যে বলিয়াছিল, "সে নির্দোষী আমার এইরূপ বিশ্বাস" সেইজন্য। গোবিন্দলাল সেই বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করে নাই—তাহার অপমান করিয়াছিল—যেদিন সে রোহিণীর পাপ দেহ স্পর্শ করিয়াছিল সেদিন—সেই দুর্দিনে তাহার উদ্যান হইতে প্রত্যাবর্তনে বিলম্বের কারণ ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিল—"আজ নহে"—"তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া

কাজ নাই।" যদি ঘটনার স্রোতও অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত না হইত, তবে গোবিন্দলাল স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে তাহার ধারণা লইয়া, দুই বৎসর পরেও মনে করিত—ভ্রমর "বালিকা"—তাহার সকল কথা জানিবার অধিকার ভ্রমরের নাই। গোবিন্দলাল স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে যে ভাব মনে পোষণ করিয়াছিল, তাহার অভিব্যক্তি সুইডেনের রাজা একাদশ চার্লসের উক্তিতে আমরা পাই। তাঁহার পত্নী যখন কোন বন্দীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"Madame, I married you to give me children, not to give me advice." 'সন্তান-লাভের জন্যই তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে পরামর্শ দিবে বলিয়া নহে।' বৃটেনে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সম্বন্ধে বিখ্যাত সাংবাদিক ঐ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন— "It still represents much of the thought of men in relation to women."

রোহিণীকে ভুলিবে মনে করিয়া গোবিন্দলাল জ্যেষ্ঠতাতের নিকট জমীদারী দেখিতে যাইবার প্রস্তাব করিল। সে মনে করিল, বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিবে। সেজন্য যে হরিদ্রাগ্রামে তাহার সুযোগের অভাব ছিল, এমন নহে। রোহিণী দরিদ্র ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রী, অন্য কোন আশ্রয়ের অভাবে ব্রহ্মানন্দের গৃহে থাকিত—তথায় দাসদাসী ছিল না—"জল আনা বাসন মাজাটা রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল"—রন্ধন ত ছিলই। গোবিন্দ-লাল প্রবলপ্রতাপ জমীদার পরিবারের সন্তান। সে ইচ্ছা করিলে ভ্রমরের সঙ্গে যে সময় কাটাইত না, সে সময় বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে পারিত; বারুণী পুষ্করিণীর বাগান বাড়ীতে তাহাকে যে যাইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। গোবিন্দলাল জমীদারীতে গেল—ভ্রমরকে সঙ্গে লইয়া গেল না। ভ্রমরের শাশুড়ী তাহাকে যাইতে দিলেন না। কিন্তু যে গৃহে গোবিন্দলালের ইচ্ছাই আদেশ, সে গৃহে তাহার ভ্রমরকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা থাকিলে সে ইচ্ছা অনায়াসে কার্যে পরিণত হইত। দেখা গিয়াছে, যখন ভ্রমরের মাতার পীড়ার সংবাদে পরিবারের কর্তা কৃষ্ণকান্ত "চারিদিনের কড়ারে" ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন তখন গোবিন্দলাল আসিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলে কৃষ্ণকান্তও আর বধূকে আনিবার উদ্যোগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং গোবিন্দ-লালের অনিচ্ছায় বা আগ্রহের অভাবেই ভ্রমর স্বামীর সঙ্গে যাইতে পারে নাই। ভ্রমরের "কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি" কিছুতেই গোবিন্দলালকে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্ররোচিত করিতে পারে নাই।

গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রাম হইতে জমীদারীতে গেল; কিন্তু মন ত সঙ্গে গেল।

> "The mind is its own place, and in itself
> Can make a heaven of hell, a hell of heaven".

বন্দরখালিতে যাইয়া গোবিন্দলাল প্রজাদিগের ধর্মঘট নষ্ট করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, কি "হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে

ধ্যান" করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। তথায় সে ভ্রমরের পত্র পাইয়াছিল। পত্রে ভ্রমর লিখিয়াছিল :—

"সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমার কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।" ভ্রমরের পত্রেই তাহার বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাহার পত্রে—

"তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই।"

পত্রের ভাব গোবিন্দলালের নিকট অপ্রত্যাশিত। তাহার কারণ, তাহার মতে স্ত্রীর সহিত তাহার সম্বন্ধ "আমি অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে।"

ভ্রমর লিখিয়াছিল, গোবিন্দলালের উপহার বস্ত্রালঙ্কার রোহিণী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে দেখাইয়া গিয়াছে, আর ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছিল, ভ্রমর রাষ্ট্র করিয়াছে—"তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ।" যে ব্রহ্মানন্দ রোহিণী নিশীথে কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহে উইল চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছিল তাহার অপরাধের পরেও তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া ভ্রমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছিল, সেই ব্রহ্মানন্দের পত্রে ঐ কথা। গোবিন্দলাল যদি স্থিরভাবে বিবেচনা করিত, তবে উভয় পত্রের বিষয় মনে করিলে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত।

গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিল। ভ্রমর তাহাকে লিখিয়াছিল—"তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

সেই পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়াছিল; কিন্তু ভ্রমরকে লিখে নাই—ভ্রমরের অভিযোগ তাহার নিকট রহস্যাচ্ছন্ন মনে হইতেছে—সে গৃহে ফিরিয়া সে বিষয়ে সব শুনিবে ও বলিবে, তাহা হইলে যে ভ্রমর পিত্রালয়ে যাইত না, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কারণ, প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল অত্যন্ত অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

গোবিন্দলাল যদি সত্যই ভ্রমরকে পূর্ববৎ ভালবাসিত, তবে সে ভ্রমরের অভিমানের মর্যাদা রক্ষার কথা মনে করিত। সে তাহা করে নাই। কেবল তাহাই নহে—যখন গৃহে ফিরিয়া দেখিল, ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে, তখন—পিতৃব্যের ব্যবস্থানুসারে—তাহাকে আনিতে পাঠাইবার আয়োজন করিলে সে মাতাকে সে কাজ করিতে নিষেধ করিল। ভ্রমরের সহিত কলহ করিবার জন্য যে জ্যেষ্ঠতাতের সম্বন্ধে বলিয়াছিল—"আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না।"—তাঁহাকে ভ্রমরকে আনিবার বিষয়ে কথা রক্ষা করিতে দিল না।

গোবিন্দলাল মনে করিল—"এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে

ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণ-ধারণ করিতে পারে না?" সে যে ভ্রমরের জিজ্ঞাসায় বারুণী পুষ্করিণীর তীরে উদ্যানের ঘটনা প্রকাশ করে নাই—বুঝে নাই, সে ঘটনা গোপন থাকিবার কথা নহে—রটনায় তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত রূপধারণ করিতে পারে—তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার তাহা ভুলিয়া ভ্রমরের উপর রুষ্ট হইবার কারণ—"রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় ত্যাগ করে নাই।"

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পিত্রালয় হইতে আনিতে নিষেধ করিয়াই নিরস্ত হইল না—ভ্রমরের সম্বন্ধে যে দৌর্বল্য মনে ছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য মনে করিল—"ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা।" "অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশমজন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করে।" কিন্তু গোবিন্দলাল বিষ সুধা বলিয়া বিবেচনা করিল—"রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল; দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল।"

কৃষ্ণকান্ত তখন পীড়িত—হয়ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রের রোহিণী-ঘটিত ব্যাপার তাঁহার পীড়া বর্ধিত করিতেছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল তাঁহার নিকটে থাকা অপেক্ষা রোহিণীর স্মৃতিবিজড়িত বারুণী পুষ্করিণীর তীরে পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে অধিক সময় যাপনে প্রীত হইল। তথায় আবার রোহিণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—সে রোহিণীকে বৈঠকখানায় লইয়া গেল—রোহিণী বুঝিল, গোবিন্দলাল তাহার রূপে মুগ্ধ। "যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনই অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়।" গোবিন্দলালের তাহাই হইতেছিল। যেদিন সে রোহিণীকে বুঝিতে দিল, সে তাহার রূপে মুগ্ধ, সেদিন বাগান হইতে তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইল। সে অভ্যাসবশে যখন কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে গেল সে দিন কৃষ্ণকান্ত প্রথমেই ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার এত রাত্রি হইল কেন?" এই প্রশ্ন ভ্রমর আর একদিন তাহাকে করিয়াছিল—সে উত্তর দেয় নাই। কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নেও সে উত্তর দিল না—তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বৈদ্য ডাকিতে গেল। বৈদ্য আসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কর্তব্য পালন করিতে ব্যস্ত। তিনি উইল বাহির করাইয়া তাহাকে পরিবর্তন করাইলেন—তাঁহার সম্পত্তির যে অর্ধাংশ গোবিন্দলাল পাইবে, তাহাতে গোবিন্দলালের স্থানে ভ্রমরের নাম লিখাইলেন—"ভ্রমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।" গোবিন্দলালের কর্তব্যবুদ্ধি—স্নেহশীল পিতৃব্যের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সেই মৃত্যুর ছায়াগম্ভীর কক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল, সে পিতৃব্যের স্বাক্ষরান্তে আপনি "উপযাজক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিল।" যে সময় কৃষ্ণকান্ত "ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার" মনে করিয়া সকলকে হরিনাম করিতে বলিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন—যেন বলিতেছিলেন—

"Twilight and evening bell,
And after that the dark!
And may there be no sadness of farewell,
When I embark."

তখন—সংসারের শেষ বন্ধন ছিল—আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের হিতচিন্তা। গোবিন্দলালের কর্তব্যবুদ্ধি ও জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি শ্রদ্ধা যদি বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত না হইত, তবে সে কৃষ্ণকান্তের সেই কার্যে তাঁহার আদেশ শুনিয়া নতমস্তকে তাহা পালন করিতে কৃতসংকল্প হইত—ভ্রমর তোমার পত্নী—তুমি ও ভ্রমর অভিন্ন—তোমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার ভার আমি ভ্রমরকে দিয়া মহাপ্রস্থান করিতেছি। বাস্তবিক গোবিন্দলাল যে উপযাচক হইয়া উইলে সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহাতে, বোধ হয়, কৃষ্ণকান্ত জীবনের শেষ সময়ে আশায় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গোবিন্দলালের পক্ষে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুকালীন নির্দেশ তাঁহার মৃত্যুর পরেই যেন "ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার"—হইল। তাহার কারণ—পাপ অন্ধকার ভালবাসে—আলোকে ভয় করে। সে বংশের মর্যাদা রক্ষার্থ কৃষ্ণকান্তের উইলের নির্দেশের কদর্থ করিবার জন্য শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিল।

যখন শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল—তখন গোবিন্দলাল স্থির করিয়াছে—ভ্রমর "কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে। তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইতে হইল। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—রোহিণীর কথা কেহই বলিল না। গোবিন্দলাল অনেক চেষ্টায়ও ভ্রমরের পিত্রালয়ে গমন ব্যতীত কোন দোষ আবিষ্কার করিতে পারিল না—সেই দোষই অমার্জনীয় অপরাধ স্থির করিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশ্যভাবে পাঠের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উইল সে লিখিবার সময়েই পড়িয়াছিল—তাহাতে স্বাক্ষরও দিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে উইল পঠিত হইবার পরে আসিয়া ভ্রমরকে বলিল—"তোমার অর্ধাংশ" এবং "তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।" বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন কৃষ্ণকান্ত উইলে ভ্রমরকে সম্পত্তির অর্ধাংশ দিয়া ভুল করেন নাই—ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি দুইটি ভুল করিয়াছিলেন—প্রথম, গোবিন্দলালের কথার অপেক্ষা না রাখিয়া গোবিন্দলালের জমীদারী হইতে ফিরিবার দিনই ভ্রমরকে আনিতে পাঠান নাই; তিনি পরিবারের কর্তা, গোবিন্দলাল তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না—সে প্রতিবাদের ফল হরলাল ভোগ করিয়াছিল। দ্বিতীয়—যখন রোহিণীর নামের সঙ্গে গোবিন্দলালের নাম জড়িত হইয়া জনরবে রটিত হইতেছিল, তখন তিনি গোবিন্দলালকে ডাকিয়া সতর্ক করিয়া দেন নাই—ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া তিরস্কার করেন নাই। তিনি সেই ভুল সংশোধন করিবার অভিপ্রায়েই উইলের পরিবর্তন করিয়া—গোবিন্দলাল ও ভ্রমর অভিন্ন জানিয়া—ভ্রমরকে সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব দিয়াছিলেন। "মক্ষিকা-ব্রণমিচ্ছন্তি"—সেইজন্য রোহিণীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল যেমন ভ্রমরের পিত্রালয়ে গমনে তাহার অপরাধ সন্ধান করিয়াছিল, তেমনই কৃষ্ণকান্তের উইলের ব্যবস্থায়ও ত্রুটির সন্ধান পাইল। সে মনকে

বুঝাইল, যে পিতৃব্য তাহার পিতার অধিক ছিলেন, তিনি তাহাকে অপমান করিয়া গিয়াছেন—স্ত্রীর অন্নদাস করিয়া গিয়াছেন।

সে তখন "রোহিণীকে ভাবিতেছিল—তীব্র জ্যোতির্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্র-তারারূপিণী রূপতরঙ্গিনী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।" সেই জন্যই ভ্রমর যখন বলিল—"অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে। আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম" —তখনও সে কথা কহিল না। "তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মূর্ছিতা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা।" সে কোন কথা বলিল না।

"গোলাব সুন্দরতম ফুট-ফুট করে যবে ধীরে;
আশা সমুজ্জ্বলতম ভীতি হ'তে মুক্তি-পথে তা'র;
গোলাব মধুরতম সিক্ত যবে প্রভাত-শিশিরে;
প্রেমিকা সুন্দরীতমা নেত্রে যবে অশ্রুবারিধার।"

সে সৌন্দর্য প্রেমই দেখাইয়া দেয়। আর সেই জন্যই

"—Blessings on the falling out
That all the more endears,
When we fall out with those we love
And kiss again with tears!"

গোবিন্দলাল তখন প্রেমকে মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে—সেই জন্যই সে তখনও ভ্রমরকে আদরে বক্ষে ধরিতে পারে নাই। সে গৃহে ফিরিয়া ভ্রমরের পত্রে লিখিত বিষয় জানিবার চেষ্টাও করে নাই; রোহিণী তাহাকে তাহার প্রদত্ত কি বস্ত্রালঙ্কার দেখাইয়া গিয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসাও করে নাই। অর্থাৎ নির্ধারণের চেষ্টা সে করে নাই; করিবার প্রকৃতি তাহার ছিল না—সেই জন্য সে তাহা প্রয়োজন মনে করে নাই। সে তখন সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে, সে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিবে এবং রোহিণীর রূপ-সরোবরে স্নান করিবে। গিরিজায়া গাহিয়াছিল :—

"কি বা কাননবল্লরী গল বেড়ি বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস।"

গোবিন্দলাল স্থির করিয়াছিল, সে রোহিণীকে "গল বেড়ি" করিবে।

ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছিল—যে সম্পত্তি কৃষ্ণকান্ত তাহার নামে লিখিয়া দেওয়ায় গোবিন্দলাল আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল, গোবিন্দলালের সেই সম্পত্তি তাহার নামে লিখিয়া দিলে—যদি গোবিন্দলাল তুষ্ট হয়।

গোবিন্দলালের তখন রন্ধ্রগতশনি। সে নিশ্চয়ই হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইয়া—রোহিণীকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিল, তাহাকে তাহা করিতে হইল না—তাহার মাতার কথায় সে সুযোগ লাভ করিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের সম্পত্তি ভোগ করিতে অসম্মত হইয়াছিল; তিনিও তাহাই মনে করিলেন—তিনি পুত্রকে বলিলেন—"তুমি পুত্রের কাজ কর! এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।" গোবিন্দলাল বুঝিল, এই ত সুযোগ। সে মাতাকে রাখিয়া আসিবে বলিয়া যাত্রার আয়োজন করিল—"নিজ নামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয়" করিল; আর "কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল"—তাহাও বিক্রয় করিল। তাহার পরে সে ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইল। ভ্রমরের কাতর জিজ্ঞাসায় সে বলিল, তাহার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই। ভ্রমর তাহাকে দানপত্র দিলে সে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে তখন ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার ছলই সন্ধান করিতেছিল।

তবুও গোবিন্দলালের মনে একবার অনুশোচনার ভাব দেখা দিল। যে পরিচিত স্থল ছাড়িয়া অপরিচিত সমুদ্রে তরী ভাসাইতে যায়, বোধ হয়, তাহার মনে একবার পরিচিত পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। "বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না," কিন্তু "যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না—এখন যাই।" সে ফিরিল না—কেন না, সে মনকে বুঝাইল, যাত্রা করিয়া ফিরিলে লজ্জা পাইতে হইবে; ফিরিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কারণ, "রোহিণীর রূপরাশি (তাহার) হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।" সে কোনরূপে পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ব্যাকুল—অশ্বে আরোহণ করিয়া, কশাঘাত করিল—পরিচিত পুরাতন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—নূতন তাহাকে আকৃষ্ট করিল। নূতন তখনও দূরস্থ—

" 'Tis distance lends enchantment to the view,
And robes the mountain beloved of me here."

গোবিন্দলাল মাতাকে কাশীতে রাখিতে যাইবার সুযোগ লইয়াছিল—সে কাশীতে থাকিবার জন্যও যায় নাই, আবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরিবার জন্যও যায় নাই। মাতাকে কাশীতে রাখিয়া গৃহে ফিরিবার কথা বলিয়া—মাতাকে মিথ্যায় ভুলাইয়া কাশী ত্যাগ করিল। অধঃপতনের পথে গেল। সে পথে রোহিণী তাহার সঙ্গী। উভয়ে সেই পথে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইল।

লক্ষ টাকা ও রোহিণীকে সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দলাল ভাবিল—

"ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম, এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যা'ব সঙ্গে।"

সে যশোহর জিলায় একটি পুরাতন নীলকুঠীর ত্যক্ত গৃহ কিনিয়া তাহাকে সংস্কার করাইয়া সুসজ্জিত করিল। যাঁহারা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' নীলকর য়ুরোপীয়দিগের অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিবেন, নীলকুঠির গৃহই গোবিন্দলাল-রোহিণীর উপযুক্ত স্থান। সে স্থান পাপ-কলুষিত। গোবিন্দলাল-রোহিণীর পাপে তথায় আরও পাপ পুঞ্জীভূত হইল। সে গৃহে বিধাতার অভিসম্পাত ছিল।

রোহিণী দূরে ছিল—নিকটে আসিল; মোহের আকর্ষণ-প্রলেপ দূর হইয়া গেল। ভ্রমর নিকটে ছিল—দূরে গেল; তাহার গুণ গোবিন্দলালের মনে পড়িতে লাগিল। পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার কাছে যায়—যখন অগ্নিতে দগ্ধপক্ষ হইয়া দীপাধারের তলে পড়িয়া যন্ত্রণা ভোগ করে—তখন তাহার যে অবস্থা হয়, গোবিন্দলালের সেই অবস্থা হইল। গোবিন্দলাল "রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।" মনে হইল—

"গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে?"

কিন্তু কূলে ফিরিবার উপায় কোথায়?—

"কূলেতে কণ্টকতল বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

সে ভুজঙ্গ তাহার মনুষ্যত্বের শেষ ভগ্নাবশেষ। রোহিণীতে তাহার অধঃপতনের কারণ, কি সে রোহিণীর অধঃপতনের কারণ, সে বিচার গোবিন্দলাল করিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু যখন সে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল—

"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।"

তখনও সে মনে করিল—"এ হৃদয়-সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে।" তাই "নীলকণ্ঠের মত গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে।" সত্যই "A sorrow's crown of sorrow is remembering happier things". এ জন্যই গোবিন্দলাল যখন কণ্ঠস্থ বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছিল তখন—"সেই পূর্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়-সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল।" তাই "তখনই ভ্রমর তাহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা,—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।" মনের সেই ভাব রোহিণীকে হত্যা করিবার পূর্বে উক্ত গোবিন্দলালের

কথায় সপ্রকাশ হইয়াছিল—"তুমি কি, রোহিণি, যে, তোমার জন্য ভ্রমর, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে তৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?"

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া সত্যই বনবাসী হইয়াছিল। মানুষ সামাজিক জীব—সে সমাজ চাহে। গোবিন্দলাল সেই সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রসাদপুরে তাহার কি ছিল? আর হরিদ্রাগ্রামে? হরিদ্রাগ্রামে সম্পত্তি ছিল, সমাজ ছিল, বারুণী পুষ্করিণীর কূলে বিশ্ব-কুসুমশোভাময় উদ্যান ছিল, বৃহৎ পরিবারের কর্তৃত্ব ছিল, কৃষ্ণকান্তের অসীম স্নেহ ছিল—আর যে অতুলনীয়া সেই প্রেমময়ী পত্নী ভ্রমর ছিল।

যখন গোবিন্দলালের সেই অবস্থা—সে যাহা কুসুমদাম মনে করিয়াছিল, তাহা তাহাকে সূচিবেধ যাতনা দিতেছিল—সে অহরহঃ মনে বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তখন রোহিণীর স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশ পাইল। বন্দী যখন মুক্তিলাভের আশায় ও আগ্রহে শতবার কারাগারের প্রাচীর পরীক্ষা করিয়া কোথাও দৌর্বল্যের সন্ধান পায় না, তখন যদি সে দেখে, তাহার আকর্ষণে বাতায়ন বন্ধনভ্রষ্ট হইতেছে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, গোবিন্দলালের সেই অবস্থা। যদি রোহিণীর অত্যাজ্যতা সম্বন্ধে তখনও তাহার কোন দ্বিধা থাকিয়া থাকে, তবে রোহিণী যে মরিতে চাহিল না—মরিতে ভয় পাইল—বলিল, "মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ।" তখন সে দ্বিধার আর কোন অবকাশ রহিল না। সে যে নিশাকরের সন্ধানে গোপনে অভিসারে গিয়াছিল, তাহা গোবিন্দলাল স্বয়ং দেখিয়াছিল, সে যে নিশাকরকে বলিয়াছিল, "একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এ দেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি", তাহা গোবিন্দলাল স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। তাহার পর—রোহিণীর মরিতে অনিচ্ছা। গোবিন্দলালের ধৈর্যসীমা অতিক্রান্ত হইল। সে রোহিণীকে হত্যা করিল। কিন্তু আপনাকে হত্যা করিতে পারিল না। সেই স্থানেই তাহার পাপজনিত দারুণ দৌর্বল্য দেখা গেল। সে মরিতে ভয় পাইতেছিল। সে পলাইয়া গেল। তাহার গৃহত্যাগের পর পঞ্চম বৎসরে সংবাদ আসিল—সে বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—তথায় তাহাকে ধরিয়া পুলিশ যশোহরে আনিয়াছে—যশোহরে তাহার বিচার হইবে।

বিলাসে লালিত, সুখে অভ্যস্ত গোবিন্দলাল বৈরাগীর ছদ্মবেশে পলাইয়া থাকিয়া কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে গোবিন্দলাল একদিন তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি কৃষ্ণকান্ত তাহার কল্যাণজন্য পত্নীকে দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ভোগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, বিপদে পড়িয়া সেই সম্পত্তির আয় হইতে তাহার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে অনুরোধ করিল; লিখিল—"আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তবে ফাঁসী যাইতে না হয়। এই ভিক্ষা।" ভয়—তাহার অবস্থা হইবে—

> "Cut off even in the blossoms of my sin,
> Unhouse'd, disappointed, unaton'd
> No reckoning made, but sent to my account
> With all my imperfections on my head."

তাহার বাঁচিতে ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু মরিতে ভয় ছিল। হয়ত জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, শেষ কাজ উইল পরিবর্তন শেষ করিয়া সকলকে বলিলেন, "ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।" যেন তিনি দেখিতেছিলেন :—

"সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণপদতরী;
এই কূলে সন্ধ্যা, ঊষা অন্য কূলে মুগ্ধ করি।"

হয়ত রোহিণীর মৃত্যুও তাহার মনে পড়িয়াছিল।

ভ্রমরের নির্বন্ধাতিশয়ে মাধবীনাথের কৌশলে গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল; কিন্তু হরিদ্রাগ্রামে গেল না—লজ্জায়। সে তাহার বিলাসপুরী প্রসাদপুরে গেল, দেখিল তথায় "কিছু নাই, কেহ নাই।" তাহার মনে হইল—

"I feel like one
Who treads alone
Some banquet-hall deserted,
Whose lights are fled,
Whose garlands dead,
And all but he departed."

ইটকাঠ বিক্রয় করিয়া সে চলিয়া গেল।

তাহার পরে গোবিন্দলাল কলিকাতায় আসিল—জনারণ্য কলিকাতায় "গোপনে সামান্য অবস্থায়" দিনযাপন করিতে লাগিল। পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত পত্নীকে "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব" বলিবার সময় যে গোবিন্দলাল মনে করিয়াছিল—যেদিন ইচ্ছা প্রাণ ত্যাগ করিবে—"মাটীর ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব"—সে কিন্তু মরিতে পারিল না। যখন মরিলে তাহার মুক্তি তখনও সে মরিতে পারিল না। তাহার প্রায়শ্চিত্ত তখনও অসম্পূর্ণ। সে ভ্রমরকে বলিয়াছিল, "তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?"—সেই হত্যাপরাধে বিচারাধীন হইয়া দান প্রার্থনা করিয়াছিল—কিন্তু তখনও লিখিয়াছিল "আমার পৈত্রিক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয়" করা অভিপ্রেত হইলে তাহা করিবার এই সময়। এবার সে ভ্রমরকে যে পত্র লিখিল, তাহা ভিখারীরই উপযুক্ত—

"আমি এখন নিঃস্ব * * * আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি। * * * আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই। তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করিল তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? * * * পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

স্ত্রীলোকের জীবননাশ যে পুরুষের জীবননাশ অপেক্ষা ঘৃণ্য, ইহা হিন্দুর সংস্কার-বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছিলেন।

গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইতে চলিল।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পাইল; ভ্রমর তাহাকে হরিদ্রাগ্রামে যাইয়া তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে বলিয়াছে—বলিয়াছে, হরিদ্রাগ্রামের গৃহও তাহার। কিন্তু সে আর হরিদ্রা-গ্রামে থাকিবে না—সে গঙ্গাতীরে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া তথায় যাইয়া বাস করিবে! যত দিন তাহা প্রস্তুত না হয়, তত দিন সে পিত্রালয়ে থাকিবে।

ভ্রমরের পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল ভাবিল—"কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই।" সে বিস্মিত হইল, "সেই ভ্রমর!" কিন্তু গোবিন্দলাল বুঝিতে চাহিল না—সে ভ্রমরের প্রতি যে কুব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে সে আর তাহার ব্যবহারে কোমলতালাভের আশা করিতে পারে না—তাহার ব্যবহারের অগ্নিতে তাহার পাপ ইন্ধন যোগ করিয়াছে—সেই অগ্নিতে ভ্রমরের কোমলতা দগ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সে যে তখনও ভ্রমরের পক্ষে কোমলতা দেখিবার আশা করিয়াছিল, তাহা তাহার যে মনোভাবের পরিচায়ক, সেই মনোভাবহেতুই সে ভ্রমরকে বলিয়াছিল—ভ্রমরের সহিত তাহার সম্বন্ধ—"আমি অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে।" তাহার মনের মালিন্য তখনও দূর হয় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। সে হরিদ্রাগ্রামে গেল না; কিন্তু লিখিল—"যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমরের উত্তর রোহিণীর তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার দেখাইবার পর হইতে তাহার কার্যের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন। সে মাসিক পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল; "অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা।"

ভ্রমর মনকে দৃঢ় করিয়াছিল—তাহারই চেষ্টায় তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুকাল সমাগত বুঝিয়া তাহার পিতা গোবিন্দলালকে সংবাদ জানাইলেন। গোবিন্দলাল এই বার হরিদ্রাগ্রামে আসিল—ভ্রমরকে একবার দেখিল—শেষ দেখা। মনে হইতে পারে—"গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে।" কিন্তু তাহা নহে—সে কাহাকেও ভালবাসে নাই। সে রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহাকে ভালবাসে নাই। আর সে যদি ভ্রমরকে সত্য সত্যই ভালবাসিত, তবে সে রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইত না। তাহার ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ কেবল—

> "তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরারে,
> যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।"

গোবিন্দলাল আসিয়াছে জানিয়া ভ্রমরের মনে হইল—তাহার শেষ কামনা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাহার আগ্রহে গোবিন্দলাল সেই মরণাহতার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল। ভ্রমর তাহাকে নিকটে আসিতে বলিল এবং তাহার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল।" নিবিবার পূর্বে দীপ একবার জ্বলিয়া আলোক বিকীর্ণ করিল; ভ্রমর বলিল—

"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" আজ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণকালে সে তাহার সংস্কার আর দমিত করিল না।

গোবিন্দলাল কোন কথা বলিতে পারিল না—কান্দিল। এত দিনে সে বুঝিল, ভ্রমরের ভালবাসা কি; বুঝিল, ভ্রমর স্থির করিয়াছিল, সে তাহার অপমান সহ্য করিতে পারে, কিন্তু "প্রেমের সহে না ত অপমান।" তখনও হয়ত তাহার মনে হইয়াছিল—

"O, that 'twere possible
After long grief and pain
To find the arms of my true love
Round me once again."

গোবিন্দলাল যথারীতি ভ্রমরের সৎকার করিয়া ফিরিল। এইবার তাহার প্রকৃত যাতনা আরম্ভ হইল। সে বিকৃতমস্তিষ্ক হইল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে ছিল—"পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

কিন্তু বিকৃতমস্তিষ্ক বিবেকের দংশন অনুভব করিতে পারে না; তাহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় না। দগ্ধ না হইলে স্বর্ণের মালিন্য দূর হয় না। সেইজন্য পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অংশের পরিবর্তন করিয়াছিলেন—চিকিৎসায় প্রকৃতিস্থ হইয়া গোবিন্দলাল কোথায় চলিয়া গেল।

ভ্রমরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসীর প্রচলিত প্রথানুসারে সে এক বার হরিদ্রাগ্রামে আসিল; তখন তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ—সে তখন প্রায়শ্চিত্তশুদ্ধ-হৃদয়ে পরম শান্তি-লাভ করিয়াছে—সে ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়াছে—ভগবানই তখন তাহার "ভ্রমরাধিক ভ্রমর"।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে নারী-চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন; "দুর্গেশনন্দিনী"তে প্রতিহিংসাপ্রদীপ্তা বিমলা ও ত্যাগপূত-প্রেমপূর্ণ আয়েষা হইতে 'রাজসিংহের' চঞ্চলকুমারী পর্যন্ত নানা নারীচরিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন—ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব নারীচরিত্রে কিরূপ লক্ষিত হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট নারীদিগের মধ্যে ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। কোমলে কঠোরে—ভালবাসায় ও কর্তব্যজ্ঞানে ভ্রমর অতুলনীয়।

যে বৎসর (১২৮২ বঙ্গাব্দ) পৌষমাসে 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ আরম্ভ হয়, সেই বৎসর ভাদ্রমাসে ঐ পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশ করেন। ভ্রমরের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে সেই প্রবন্ধে তাহার উৎস সন্ধান করা যায়। ঐ প্রবন্ধের আরম্ভ এইরূপ—

"কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দু কাব্য-সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা-গুণের বিশেষ

অধিকারিণী—ইনিই আর্য-সাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্ব-মনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্যনায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধা নায়িকাগণ সীতার অনুসরণমাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য সাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। * * * মহাভারতে নায়ক-নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতাচরিত্রানুবর্তিনী নায়িকারও অভাব নাই, কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন।"

তিনি বলিয়াছেন—"দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প ধর্মের কিছু বিরোধী। কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। * * * দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘা-প্রিয়তা নির্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। * * * দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্মানুরক্ষা অপেক্ষা প্রবল।"

এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন-তীক্ষ্ণ ক্ষমতা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে "অপূর্ব নূতন সৃষ্টির" কল্পনা করিতেছিলেন। সেই কল্পনা ভ্রমর চরিত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—সার্থক হইয়াছিল। ভ্রমর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধর্মাচরণের সহিত দর্পের—পতির প্রতি ভালবাসার সঙ্গে পতির সম্বন্ধে কর্তব্যবোধের সম্মিলন।

আট বৎসর বয়সে গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পর—গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহের কারণ না ঘটা পর্যন্ত সে কি ছিল, তাহা—তাহারই কথায়—"আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল।"

এ কথা কত সত্য তাহা আমরা গ্রন্থে ভ্রমরের সহিত প্রথম পরিচয়কালেই বুঝিতে পারি। যেদিন জাল উইল লইয়া প্রকৃত উইল রাখিতে আসিয়া রোহিণী কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে ধরা পড়ে, তাহার পরদিন ঊষাকালে গোবিন্দলাল যখন শয়নকক্ষে বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া তথায় দাঁড়াইলেন, তখন "তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল"—সে ভ্রমর। যে বয়সে বাল্যকাল আসিয়া যৌবনে মিশিয়া যায়—একে অপরকে স্থান দিতে চাহে না—ভ্রমরের তখন সেই বয়স। তবে তাহার বালিকার চাপল্য তখনও গাম্ভীর্যে পরিণতি লাভ করে নাই। তাহা দাসীদিগের সহিত তাহার ব্যবহারে স্বপ্রকাশ। সে "নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিল না।" "গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য—দেবীদুর্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ?" কৃষ্ণকান্তের সম্পত্তির আয় বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা। গোবিন্দলাল তাহার অর্ধাংশের অধিকারী। তাহাতেই ভ্রমরের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দলাল সুপুরুষ—তাহার "অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাহার চম্পকরাজিনির্মিত

স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে"—সে "কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর উন্নত দেহ।" সে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, মল্লিনাথ বলিয়াছেন—বিবাহে—

"কন্যা বরয়তে রূপম্ মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্
বান্ধবাকুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ॥"

অর্থাৎ কন্যা রূপবান স্বামী পাইতে ইচ্ছা করে, মাতা জামাতার ঐশ্বর্য চাহেন, পিতা বিদ্যার আদর করেন। বান্ধবগণ বরের কুল সম্বন্ধে অবহিত হইতে আগ্রহশীল, সাধারণ লোক মিষ্টান্ন লাভ করিতে চাহে। গোবিন্দলালে সে সকলের কোনটির অভাব ছিল না। ভ্রমর স্বামীর আদরের অভাবও অনুভব করে নাই। প্রথমে যখন আমরা তাহার দর্শন পাই, তখন সে স্বামীর পার্শ্বে—প্রভাতালোকে—"হাসি—চাহনিতে, সেই আলোকে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে মিশিয়া গেল।"

কিন্তু সেই দিনই ভ্রমরের রবিকরোজ্জ্বল-মেঘলেশহীন অদৃষ্ট-গগনে—সকলের অলক্ষিতে যে মেঘ উদিত হইল, তাহাই বর্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া বজ্রপাত ঘটাইবে—তাহার বক্ষে বিদ্যুৎ ও বজ্র লুক্কায়িত ছিল। তাহার আভাস কয়দিন পূর্বে গোবিন্দলালের কুসুমিত উদ্যানে বারুণী পুষ্করিণীর কূলে তাহার সহিত রোহিণীর সাক্ষাতে পাওয়া গিয়াছিল—সে দিন গোবিন্দলাল উপেক্ষার বাতাসে তাহা উড়াইয়া দেয় নাই—অসময়ে করুণায় তাহা পুঞ্জীভূত হইতে দিয়াছিল। ভ্রমর যখন স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহস্যালাপ করিতেছিল—তখন দাসীরা রোহিণীর কথার আলোচনা করিতেছিল—রোহিণী নিশীথে কৃষ্ণকান্তের ঘরে কি চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছিল—কাছারীর গারদে কয়েদ ছিল। ভ্রমরের মুখে সে বিষয় শুনিয়া গোবিন্দলাল ঘাড় নাড়িল—রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল—তাহা গোবিন্দলালের বিশ্বাস হইল না। গোবিন্দলাল যে রোহিণীর ধরা পড়ার সঙ্গে তাহার বারুণী পুষ্করিণীর চাতালে বসিয়া একদিন সন্ধ্যায় ক্রন্দনের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে কথা সে তখন ভ্রমরকে বলে নাই—এখনও বলিল না। কিন্তু ভ্রমরও বিশ্বাস করিতে পারিল না—রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তাহার কারণ, "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।"—"রোহিণী যে অপরাধিনী নয়, ভ্রমরের তাহা দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী।" কারণ—গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই তাহার বিশ্বাস। ভ্রমর গোবিন্দলালকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বুঝিল, সে রোহিণীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে যাইতেছে। ভ্রমর আপত্তি করিল না—গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তখনও ভ্রমর কল্পনাও করিতে পারে নাই—অল্পদিনের মধ্যে উভয়ের যে অবস্থা হইবে, তাহাতে—"নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ-হাসি আধ-প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্ধেক বলে সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি

নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত 'এত রূপ!'—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত 'এত গুণ!—সে চাহনি আর নাই। * * * সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন ভাষা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্ধেক ভাষায়, অর্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন। এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে।"

যে দিন রোহিণীর ধরা পড়ার সংবাদ পাইয়া গোবিন্দলাল তাহার উদ্ধারসাধনের চেষ্টায় রত হইল, সেই দিনই রোহিণী কৃষ্ণকান্তের আদেশে ভ্রমরের নিকট নীত হইলে ভ্রমর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, পাছে রোহিণী কাঁদিয়া ফেলে; গোবিন্দলাল আসিলে সে যেন "দায় হইতে উদ্ধার পাইল।" সে গোবিন্দলালকে রোহিণীর কাছে রাখিয়া "ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল।" সে যে "একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে একটি রূপকথা বল না!" সে সরলা তরুণীর মনে কোনরূপ সন্দেহের স্থান নাই।

কিন্তু রোহিণী গোবিন্দলালকে "প্রেম নিবেদন" করিল। গোবিন্দলালের ভাব দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে অব্যাহতি দিলেন। গোবিন্দলাল যে রোহিণীর "প্রেম নিবেদন" অপ্রত্যাশিত মনে করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। রোহিণী অব্যাহতি পাইয়া চলিয়া যাইবার পরে গোবিন্দলাল চিন্তিত ছিল, তখন ভ্রমর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাবছ কি? তাহার বিশ্বাস ছিল—"যে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে", তাই সে গোবিন্দলালকে বলিল, "আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।" সে এমন কথাও বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাসতে নাই।" গোবিন্দলাল বিচলিত হইল—ভ্রমরের ভালবাসাপ্রসূত বিশ্বাস কি অসাধারণ! তাই সে বলিয়া ফেলিল—"রোহিণী আমায় ভালবাসে।" সময় সময় মনের কথা অনিচ্ছায়ও লোক প্রকাশ না করিয়া পারে না। শুনিয়া ভ্রমরও তাহার মনের কথা প্রকাশ না করিয়া পারিল না—যে পরপুরুষকে ভালবাসা জানায়, মৃত্যুই তাহার উপযুক্ত পথ। গোবিন্দলালও যে রোহিণীকে বলিয়াছিল, "মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল"—তাহা ভ্রমর জানিত না। সে কোন পুরুষের পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হওয়া এবং কোন নারীর পরপুরুষে আকৃষ্ট হওয়া অমার্জনীয় ও ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়াই বিশ্বাস করিত—সেরূপ কার্য সে সমাজের ও ধর্মের শত্রুতাসাধন মনে করিত। এই বিশ্বাসই যে তাহাকে স্বামীকে অসাধারণ তেজস্বিতার ও পবিত্রতার পরিচায়ক পত্র লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

রোহিণী, বোধ হয় গোবিন্দলালকে রূপের জালে জড়াইতে পারিল না বলিয়া এবং গ্রামের লোকের নিকট লজ্জায়, বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গেল বটে, কিন্তু গোবিন্দলালের চেষ্টায় মরিতে পারিল না। সে ঘটনায় মানসিক দৌর্বল্যের পরিচয়ে গোবিন্দ-লাল ভগবানকে ডাকিল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীকে সকল কথা বলিল না। সে

রোহিণীকে ভুলিবার চেষ্টায় জমীদারীতে গেল, ভ্রমরকে সঙ্গে লইল না—তাহাকে কোন কথা জানিতেও দিল না। ভ্রমর কিন্তু স্বামীর বিরহে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল—

"কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিল--সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ধোপাকে গালি পাড়ে অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত—ঐ পর্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল—আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে। শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি। বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।"

চিন্তামণি প্রোষিতভর্তৃকার কথায় লিখিয়াছেন—

"হাস্যং পরগৃহে যানং সমাজোৎসবদর্শনম্।
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥"

যাহার পতি বিদেশে গিয়াছে, তাহার হাস্য, অন্যগৃহে গমন, সমাজোৎসব দর্শন, ক্রীড়া ও শরীর-সংস্কার বর্জনীয়।

ভ্রমর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পড়িত। উহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' থাকে। তাহাতে প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ—

"অনল চন্দন চুয়া গরল তাম্বুল গুয়া
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মত বেশ অস্থিচর্ম অবশেষ"
—ইত্যাদি।

আর 'মেঘদূতে' বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর বর্ণনা—শিশিরমথিতা পদ্মিনীর মত, প্রবল-রুদিতোচ্ছুনেত্রা—

"তৈল বিনা রুক্ষ অলক-কুন্তল
পড়ে আলু থালু কপোল দেশে
উড়িছে কাঁপিয়ে, পল্লব-কোমল॥
অধর-শুকানো গভীর শ্বাসে।"

ইহাই বিরহিণী নারীর লক্ষণ। ভ্রমরে এই সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল।

কিন্তু ক্ষীরি প্রভৃতি যাহারা কখন ভ্রমরের প্রেম পায় নাই, কখন তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহারা ভ্রমরের বেদনাভিব্যক্তি বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল। তাই ক্ষীরি বলিল, "তুমি মরতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি (তোমার স্বামী) হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়ে, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

সে রাত্রিতে রোহিণী ডুবিবার পরে প্রাণ পাইয়াছিল; সে দিন তাহার উদ্যান হইতে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল; তাহা কেহ কেহ দেখিয়াছিল এবং দেখিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহা গোপন রাখে নাই। ক্ষীরি তাহা শুনিয়াছিল—হয়ত তখন তাহা গ্রামে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষীরি বা অন্য কোন দাসী সাহস করিয়া তাহা ভ্রমরকে বলে নাই। তাহা যে তাহাদিগের অসাধারণ সংযমের পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য; কারণ, একে ত সংবাদপত্র ও স্ত্রীলোক কোন সংবাদ গোপন রাখিতে পারে না—তাহাতে ক্ষীরি যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহা রোহিণী ধরা পড়ার পরদিন প্রভাতে তাহাদিগের কথায় জানিতে পারা গিয়াছিল। সে যাহাই হউক, ক্ষীরির কথায় ভ্রমর বেদনানুভব করিলেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। সে ঊর্ধ্বমুখে সজলনয়নে যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে গুরো! শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সেদিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে?" তাহার আপনার হৃদয় পবিত্র—প্রেম বিশুদ্ধ, তাই তাহার "মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ের যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখানে পর্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না।"

ক্ষীরি যখন ভ্রমরের কাছে ঐ কথা বলিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিল, তখন সে মনে করিল, "একরত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না!" সে তখন সেই দুঃখ অপরের নিকট—সহানুভূতি লাভের আশায়—ব্যক্ত করিল। ফলে "যে সূর্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা"—আরও কত কথা উঠিল।

তাহার পরে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। ভ্রমরের সুখ অনেকের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। "বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্মলা, সাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা, প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। * * * কেহ আদর করিয়া, কেহ বিগড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে ভ্রমরকে জানাইল যে,

ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।” তাহাদিগের “কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতি-বিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।”

ভ্রমরের মনে সন্দেহ ছিল না—বহুজনের কথায় সন্দেহ দেখা দিল। সে “আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, ‘হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহ-ভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া, প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।”

ভ্রমরের অনাবিল পতিপ্রেম তাহাকে সন্দেহ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্ররোচনা দিতে লাগিল।

তাহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন রোহিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল বুঝিয়াছিল, রোহিণীর “যোড়া নাই”—ভ্রমর তাহা জানিত না। রোহিণী আসিয়া ধারকরা বেনারসী শাড়ী ও গিল্টী-করা গহনা দেখাইয়া বলিল, সে সব গোবিন্দলালের উপহার। কেহ যে এমন মিথ্যা কথা বলিতে পারে, ভ্রমরের সে ধারণা ছিল না। সে বিশ্বাস করিল, গোবিন্দলাল অবিশ্বাসী হইয়াছে। ভ্রমর ভাবিল—

“অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা!”

ক্ষীরি যেদিন সে কথা বলিয়াছিল, সেদিন ভ্রমর ভাবিয়াছিল—“তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।” যখন সকলেই সেই এক কথা তাহাকে শুনাইতে লাগিল, তখন ভ্রমর ভাবিয়াছিল—“আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়?” কিন্তু যখন পাপিষ্ঠা রোহিণীর মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ফলবতী হইল, সেদিন ভ্রমরের আর সে ভাব রহিল না। সেই সরলা, কোমলা, প্রেমবিহ্বলা বালিকার স্থানে তেজস্বিতার প্রতীক যুবতী আবির্ভূতা হইল। ভ্রমর স্বামীকে লিখিল :—

“সেদিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরী হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

“তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমার এ ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও

বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়—ভ্রমর কোথাও বলিল না, যতদিন তোমার ভালবাসা, ততদিন আমারও ভালবাসা। ভালবাসা—ভ্রমরের মত নারীর পবিত্র ভালবাসা স্বামীর ভালবাসা সাপেক্ষ নহে। সে ভালবাসার বিনাশ নাই।

> "Love is indestructible ;
> Its holy flame for ever burneth,
> From Heaven it came, to Heaven returneth."

আর ভ্রমরের ভালবাসার মত ভালবাসা সম্বন্ধে বলিতে হয়—

> "It soweth here with toil and care,
> But the harvest-time of Love is there."

ভ্রমর পূত প্রেম দিয়া অপবিত্র "ভালবাসা" চাহে নাই। সে গোবিন্দলালকে কখন ভালবাসায় বঞ্চিত করে নাই—কিন্তু যে ভক্তির পাত্র কেবল সে-ই ভক্তি পাইতে পারে, যে বিশ্বাসের উপযুক্ত, সে-ই বিশ্বাস পাইতে পারে।

ভ্রমর তাহার পত্রে তাহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিয়াছে। গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিতেছে শুনিয়া সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

তাহার পরে তিনটি ঘটনা ঘটিল।

(১) গোবিন্দলাল আপনার দোষ অবজ্ঞা করিল, কেবল ভ্রমরের ত্রুটিই অতিরঞ্জিত করিয়া দেখিতে লাগিল। যে মনোভাবের অণুবীক্ষণে সে ভ্রমরের ব্যবহার লক্ষ্য করিল, তাহাই রোহিণীর প্রতি আকর্ষণে বিকৃত। সে ভ্রমরকে কৃষ্ণকান্তের ব্যবস্থানুযায়ী দিনে আনিতে নিষেধ করিল। শেষে সে রোহিণীর সহিত যে আলাপ ও ব্যবহার করিল—তাহাতে অধঃপতনের পঙ্কিল পথে রোহিণী বুঝিল, গোবিন্দলাল তাহার মোহে মুগ্ধ।

(২) আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে ব্যথিত কৃষ্ণকান্ত হরিনাম করিতে করিতে পরলোকগত হইলেন।

(৩) গোবিন্দলালকে যাহা বলিবার অবসর কৃষ্ণকান্তের হয় নাই, তিনি উইলের ব্যবস্থা পরিবর্তনে তাহা বজ্রনাদে বলিয়া যাইলেন।

গোবিন্দলাল যদি জমীদারী হইতে ফিরিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইতে নিষেধ না করিত, তবে ভ্রমরের কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসায় সে রোহিণীর দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাইত এবং কি কারণে ভ্রমর তাহাকে দোষী মনে করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিত। কিন্তু গোবিন্দলালই সে পথ বন্ধ করিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তকে গোবিন্দলাল শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত—তাঁহার

জীবন-প্রবাহ ক্ষীণ বুঝিয়া সে স্বয়ং বৈদ্যের কাছে গিয়াছিল—"শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন।" তিনি উইলে সম্পত্তিতে তাহার অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিলে, সে "উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিল। সে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুতে পিত্রালয় হইতে আগত ভ্রমরকে বলিয়াছিল, "পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর।" সে যখন রোহিণীকে লইয়া বিদেশে যাইয়া বাস করিবে ঠিক করিয়াছিল, তখনও সে ভ্রমরকে বলিয়াছিল, "আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না।" তবুও সে কৃষ্ণকান্তের কার্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়া তাহার কদর্থ আপনাকে বুঝাইয়াছিল। কারণ, "রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় ত্যাগ করে নাই।" যে সম্পত্তি কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে গোবিন্দলালের নহে—ভ্রমর তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই; কিন্তু যখন সে দেখিল, গোবিন্দলাল তাহা মনে করিতেছে না, তখনই পিত্রালয়ে গিয়াছিল—কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দানপত্রের দ্বারা দিতে।

গোবিন্দলাল বহু চেষ্টা করিয়াও ভ্রমরের একাধিক "অপরাধ" পায় নাই—গোবিন্দলালের আগমনকালে সে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। সেজন্য ভ্রমর ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল—"আমার শত, সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর।" কিন্তু গোবিন্দলাল ক্ষমা করে নাই. বলিয়াছিল —"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর যখন কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রাপ্ত সম্পত্তি স্বামীকে প্রদানের দলিল করিতে পিত্রালয়ে গিয়াছিল, সেই সময়ে—সেই সুযোগে—গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। গোবিন্দলালের জননী, হয়ত পুত্রের কথায়, মনে করিতেছিলেন, তাঁহাকে পুত্র-বধূর সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী মাত্র হইতে হইয়াছে—সেইজন্য পূর্ব সংকল্পিত কাশীবাসের বাসনা প্রবল করিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে কাশীতে লইয়া যাইতে আগ্রহান্বিত হইল ; বলিল, সে তাঁহাকে "কাশী রাখিয়া আসিবে।" সে যে আর হরিদ্রাগ্রামে ফিরিতে চাহে না, তাহা বলিল না। ওদিকে ভ্রমর দানপত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। শাশুড়ী তাহার অনুরোধে কাশীগমন-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। গোবিন্দলাল মাতাকে বলিয়াছিল—"চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব"—ভ্রমরকে যাত্রাকালে বলিল, "আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।" রোদনবিবশা ভ্রমর চক্ষুর জল মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?" তখন তাহার চক্ষুতে আর জল নাই, তাহার কণ্ঠস্বর স্থির ও গম্ভীর, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা। গোবিন্দলালকে নিরুত্তর দেখিয়া সে বলিল, "দেখ. তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?" গোবিন্দলাল বলিল, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।" কেন ইচ্ছা নাই, তাহার উত্তরে গোবিন্দলাল বলিল, স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকিবে না। ভ্রমর আবার সেই পিত্রালয় গমনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল—"এক অপরাধ কি মার্জনা হয় না?" গোবিন্দলাল বলিল, "এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।" তখন ভ্রমর দানপত্র স্বামীর হস্তে দিল ; গোবিন্দলাল তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া

ফেলিল। ভ্রমর আবার বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন।" গোবিন্দলাল উত্তর দিল, "ইচ্ছা নাই।" তখন ভ্রমর বলিল, "ধর্ম নাই কি?" গোবিন্দলাল যখন উত্তরে বলিল, "বুঝি আমার তাও নাই"—তখন ভ্রমর ঘৃতাহুতিপুষ্ট পবিত্র যজ্ঞানলশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—যুক্ত করে, অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল—

"তবে যাও—আর, আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? —দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর ফিরিয়া আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি,—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

সত্যই পাপ গোবিন্দলালের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট করিয়াছিল, নহিলে সে ভ্রমরের সেই কথায় শিহরিয়া উঠিত—আপনার সংকল্পের পরিণাম অনুমান করিত। মানুষের ধর্ম তাহার কর্তব্য—সেইজন্যই ধর্ম ক্রিয়ামূলক। গোবিন্দলাল ধর্ম হারাইয়াছিল—তাই কোন কথা বলিতে পারিল না। ভ্রমরের মাতৃহৃদয়ের যে বেদনা—সূতিকাগারে মৃত পুত্রের জন্য শোক, সে পত্নীত্বেই ভুলিতে পারিয়াছিল; আজ সেই বেদনা ও সেই শোক তাহাকে পীড়িত করিল; সে "মেঝের উপর পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল।"

নারীর গৌরব মাতৃত্বে। ভ্রমরের মাতৃত্ব আজ তাহাকে তাহার পুত্রের কথা স্মরণ করাইল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' বলিয়াছেন—"শিশু মা'র কোলে উঠিলে মাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী দেখে।" য়ুরোপের শিল্পীরা মাতৃমূর্তিতেই দেবতার বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়াছেন। সন্তান মাতাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, আর মাতা সন্তানকে সুন্দর দেখেন। তাই ভ্রমর পুত্রের উদ্দেশে বলিল, "তোর চেয়ে কে সুন্দর?" তাহার বিশ্বাস ছিল—"আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত?"

এই একটি ঘটনায় ভ্রমরের মাতৃভাবের পরিচয়।

ভ্রমর দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্ঘটনা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমার স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম কেন?"

সে যে ভালবাসার আলোকে আপনাকে পূর্ণ সুখে সুখী মনে করিত, তাহার আলোক তাহার পক্ষে নির্বাপিত হইল—যেন অকাল-জলদজাল প্রভাত কমলদলে নবরবিকর নিবারণ করিল। তাহার অবস্থা সোফোক্লেসের কথায়—

> "Blind, having seen ;
> Poor, having rolled in wealth".

"ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।" হাস্যময়ী ভ্রমর মনে বুঝিল—"যখন দেবতা নিষ্ঠুর, তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে।" ভ্রমরের জীবন অশ্রুসিক্ত হইল।

তখন ভ্রমরের মনে দারুণ দ্বন্দ্ব। তখন আশায় ও সন্দেহে দ্বন্দ্ব—আশা গোবিন্দলাল যে পথে যাইতেছিল, সে পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে; বিপুল সম্পত্তি, বিরাট সম্ভ্রম, ভ্রমরের ভালবাসা, শুভবুদ্ধি তাহাকে ফিরাইবে--আর সন্দেহ, সে তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার পরে সে আর ফিরিবে কি? ভ্রমর স্বামীকে রাখিবার ও পাইবার জন্য যতদূর সম্ভব নত হইয়াছিল—চরণে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল—অথচ তাহার কোন অপরাধ ছিল না। আবার দ্বন্দ্ব কর্তব্যে ও ভালবাসায়। সে দ্বন্দ্বের শেষ কোথায় তখনও জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। সেইজন্য গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পর—সে মাসের পর মাস গোবিন্দলালের প্রত্যাবর্তন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরে সংবাদ আসিল, সে মাতাকেও মিথ্যা কথায় প্রবঞ্চিত করিয়া—হরিদ্রাগ্রামে আসিবে বলিয়া কাশী ত্যাগ করিয়াছে। আবার রোহিণী তারকেশ্বরে "হত্যা দিতে" যাইবার ছল করিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেল—আর ফিরিল না। ভ্রমর সন্দেহ করিল—কিন্তু স্থির করিল "আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না।" তাহার ভালবাসার জন্যই সে মনে করিত—"এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন?" মনের অস্থিরতায় সে পিত্রালয়ে গেল। তথায় গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিল. আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনিও কোন সংবাদ পায়েন না।

এক বৎসর অতিবাহিত হইল। ভ্রমরের দুঃখের অন্ত নাই। "প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রোগ-শয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।" তাহার পক্ষে—ইহা শেষের আরম্ভ।

ভ্রমর এখন "বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ন-নয়নেন্দীবর।" এই জীবনে দুঃখ পাইয়া ভ্রমর, হিন্দুনারীর চিরাগত সংস্কারবশে পরকালের কথা ভাবিল—জন্মান্তরে যেন আবার এমনই দুঃখভোগ করিতে না হয়। সে পিতাকে বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয়, আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম কর্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত-নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি তাহার ব্যবস্থা

কর।” মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, “যে আমার ভ্রমরের এমন সর্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্বনাশ করিব।” তিনি কন্যাকে আপনার গৃহে লইয়া যাইয়া গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই “পামর-পামরী” কোথায় আছে, তাহার সংবাদ লইয়া তিনি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা প্রসাদপুরে গমন করিলে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিয়া নিরুদ্দেশ হইল। গৃহে ফিরিয়া মাধবীনাথ গোবিন্দলাল-রোহিণীর বিষয় তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা—ভ্রমরের ভগিনী যামিনীকে জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ভ্রমর তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। ভ্রমর মনে প্রতিহিংসাকে স্থান দান করে নাই; সে গোবিন্দলালকে ভালবাসায় বঞ্চিত করে নাই; সেইজন্য গোবিন্দলালের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হইল—গোবিন্দলালের হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিয়া লৌকিক দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের কথায় সে ভগিনীকে বলিল—“যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে যেন না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।” কিন্তু গোবিন্দলালের হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাবর্তন ভ্রমরের পক্ষে কি জটিল অবস্থার উদ্ভব করিবে, তাহা ভ্রমর জানিত; সেইজন্য ভগিনীকে বলিল,—“যদি গোবিন্দলাল প্রত্যাগমন করেন, তবে আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।” যামিনী ভ্রমর নহে—সে মনে করিল, গোবিন্দলাল যদি ফিরিয়া আইসে, তবে “তাহার চেয়ে আহ্লাদের কথা আর কি আছে?” শুনিয়া ভ্রমর ম্লানমুখে বলিল, “আহ্লাদ, দিদি! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে?” “ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানসচক্ষে ধূমময় চিত্রবৎ এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিতে পারিল না যে, গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিল না।”

ভ্রমরের ভালবাসা গোবিন্দলালের কল্যাণকামনাই করিতেছিল—সেইজন্য যদি গোবিন্দলাল অর্থের প্রয়োজনে—পুলিশকে বশ করিয়া লৌকিক দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য—হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া যায় ও বিপন্ন হয়, সেইজন্য ভ্রমর—স্ত্রীর কর্তব্যবোধে—একাকী হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া গেল। যামিনী বুঝে নাই—ভ্রমর তাহার হৃদয়-মন্দিরে বিশ্বাসের রত্নবেদী শ্রদ্ধার গঙ্গোদকে বিধৌত করিয়া তাহাতে যে দেবমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিল—প্রীতির পঞ্চপ্রদীপ ভক্তির গব্যঘৃত পূর্ণ করিয়া সেই প্রদীপশিখায় যে দেব-মূর্তির পূজা করিত—রোহিণীর পাপ আকর্ষণে সে মূর্তি বেদীচ্যুত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিগয়া মন্দিরে অবস্থিত; পঞ্চপ্রদীপের শিখা হতাশার ফুৎকারে নির্বাপিত; পূজার ফুল নিরাশার তাপে শুষ্ক; গঙ্গোদকের ঘট খণ্ডে খণ্ডে পরিণত মূর্তির আঘাতে ভগ্ন; সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরেরও হৃদয় ভগ্ন। সে হৃদয়ে যেমন আশার, তেমনই আহ্লাদের অবকাশ নাই।

এই স্থানে আর একটি কথা উঠিতে পারে। রোহিণীকে হত্যা করিবার পূর্বে যদি গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিত তবে কি হইতে পারিত? ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিয়াছিল, "এ স্নেহ নহে—এ সুখ নহে।" যদি "তখন গোবিন্দলাল রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, 'আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও', যদি বলিত, 'আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার; কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে। তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর'—বুঝি তাহা হইলে ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না রমণী দয়াময়ী, স্নেহময়ী; রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারে?"

যে কবি তাঁহার 'মহিলা' কাব্যে বলিয়াছিলেন,—

"লাজে গীত খুলি হৃদি-দ্বার;—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

তিনি বলিয়াছিলেন—

"ধাতার করুণা মর্তে নারী অবতার
নর-হৃদি বেদনা হরিতে।"

কিন্তু দেবতার করুণা যখন অবতরণ করে, তখন তাহার জন্য উপযুক্ত আধার প্রয়োজন। ভগীরথের সাধনা-তুষ্ঠা ত্রিপথগা যখন সাগর সন্তানগণের উদ্ধার সাধন জন্য মর্তে অবতরণ করিতে সম্মতা হইয়াছিলেন, তখন সমস্যা হইয়াছিল, কে তাঁহার বেগ ধারণ করিবেন? যিনি সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পৃথিবীর কল্যাণ কামনায় পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনিই সে বেগধারণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারই জটাজালমধ্যে পথ সন্ধানে আশঙ্কাতীব্র বেগে গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণীরূপে ধরাতলে প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। ভ্রমর যে গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিয়াছিল এবং তাহাকে হৃদয়প্রান্তে স্থানেও বঞ্চিত করে নাই, তাহা তাহার সকল কার্যেই সপ্রকাশ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ গোবিন্দলালের পাপাচরণে নিঃশেষ হইয়াছিল, তাহা পুনঃস্থাপিত হইবার নহে। ভ্রমর আবার পূর্বের মত গোবিন্দলালের আদর গ্রহণ সহ্য করিতে পারে, ইহা কল্পনাতীত। যে শস্যশূন্য বিশুষ্কপ্রায় ফলকে সাধারণ কথায় "ডাকিনী শোষিত" বলা হয়, তাহা যেমন দেবতার নৈবেদ্যে, যে ফুল আবর্জনাস্তূপে লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা তেমনই দেবপূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ভ্রমর যে গোবিন্দলালের কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করিত না—তাহার দেব-মন্দিরে দেবমূর্তি ভগ্নাবস্থায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন। তাহার স্বামীর যে মূর্তি সে হৃদয়ে রাখিয়াছিল তাহা যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহা কয় বৎসর তাহার ব্যবহারে স্বপ্রকাশ। "ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীও আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামীও আসিল না, কোন সংবাদও আসিল

না।" এদিকে ভ্রমরের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল—"নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর।" কিন্তু পঞ্চম বৎসরে যখন সংবাদ পাওয়া গেল—"গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাহার বিচার হইবে"—তখনই ভ্রমর পিতাকে আনাইয়া বলিল, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর। দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।" গোবিন্দলালকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গোবিন্দলাল যদি নিষ্কৃতি পাইয়া হরিদ্রাগ্রামে আসিত, তবে ভ্রমর কি করিত, তাহা যে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাহার গোবিন্দলালের লিখিত পত্রের উত্তরেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ভ্রমরের দয়ায় ও ভ্রমরের পিতার চেষ্টায় গোবিন্দলাল হত্যাপরাধে দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। সে জানাইয়াছিল, "ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা।" তাহার সে কামনা পূর্ণ হইল। কিন্তু সে মাধবীনাথের কথায় সম্মত হইল না—"জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।" সে হরিদ্রাগ্রামে গেল না—প্রসাদপুরে যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া জনারণ্য কলিকাতায় আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। যখন তাহার অর্থাভাব অন্নাভাবে পরিণত হইল, তখন সে ভ্রমরকে পত্র লিখিল—"পেটের দায়ে তোমাকে আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?" সে পত্রে সে লিখিল, তাহার মাতা পরলোকে—তাহার আর "স্থান নাই—অন্ন নাই"—"তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্যন্ত করিল তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?"

পত্রখানি গোবিন্দলালের উপযুক্ত। সে হরিদ্রাগ্রামে ফিরিতে চাহে—অন্নাভাব ও আশ্রয়াভাব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য। তাহার পত্রে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা আছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে। কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয়, সে যে যাইবার ছল খুঁজিয়া ভ্রমরকে অপরাধিনী বলিয়াছিল, সে কথা আর নাই—স্বীকৃতি আছে, সে "বিনাপরাধে" ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের সম্বন্ধেও অন্যায় অবিচার রহিয়াছে—"তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?" কৃষ্ণকান্তের কাজ যে কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রের মঙ্গলের উদ্দেশ্য, তাহাও যেন সে বুঝিতে পারে নাই।

সেই পত্র পাইয়া ভ্রমর তাহার যে উত্তর দিল, তাহা সর্বতোভাবে ভ্রমরের উপযুক্ত। সে লিখিল, "বিষয় আপনার। অতএব আপনি নির্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজ-সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।" সে লিখিল, কয় বৎসরে সম্পত্তির আয়ে অনেক টাকা জমিয়াছে—তাহাও গোবিন্দলালের। সে আসিয়া গ্রহণ করুক। কেবল—

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব, পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

এই পত্র ভ্রমরের উপযুক্ত। যে ভ্রমর আপনার ভালবাসার গৌরবে গোবিন্দলালকে লিখিয়াছিল, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস।"—ইহা সেই ভ্রমরের পত্র।

পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল ভাবিল—"কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু কোমলতাও নাই!"

গোবিন্দলালের বোধ হয়, তখনও বিশ্বাস যায় নাই যে, ভ্রমর যখন তাহার স্ত্রী তখন তাহার সহিত তাহার স্বামী গোবিন্দলালের সম্বন্ধ—"আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে"—সে তাহার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিবে। আর যদি সে বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়া থাকে, তবে সে মনে করিয়াছিল—স্ত্রীলোক সুখের সময় চঞ্চল ও অল্পে তুষ্টা হইতে অসম্মত হইলেও—

"When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou!"

ভ্রমরের এই পত্রের সমালোচনা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন, "ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্নী বটে।" এই আদর্শ কি? ভ্রমর-চরিত্রের বহু সমালোচনা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায়—তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত 'প্রচার' পত্রে তাঁহার বন্ধুস্থানীয় চন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছিলেন—(১২৯৫ বঙ্গাব্দ)—

"একই বিড়ম্বনায় পড়িয়া সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুইজনের আচরণ ভিন্ন রকম এবং আচরণের ফলও বিভিন্ন রকম হইয়াছিল। সূর্যমুখীর আচরণে সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, নগেন্দ্রের যে বংশে জন্ম সকলেই রক্ষা পাইল। সে আচরণের ফলে যে যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরম সুখে পবিত্র ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া গেল—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায়বংশ লোপ হইল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল। একটা সংসার, একটা সম্পত্তি, একটা ঐশ্বর্য ছারখার হইয়া গেল।

বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ এই শোচনীয় প্রভেদ ভাবিয়া সূর্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধাতুর পত্নীত্বের এত গৌরব করা হইয়াছে।"

লেখক যে সূর্যমুখীর আদর্শের স্ত্রীরই পক্ষপাতী তাহা দেখা যাইতেছে। তিনি ভ্রমরের দোষ দেখাইতে যাইয়া কিছু অসাবধান হইয়াছেন এবং কিছু অত্যুক্তি করিয়াছেন। গোবিন্দলাল গেল—তাহার নিজের দোষে—প্রথমে অসতর্কতায়, তাহার পরে রূপের আকর্ষণে।

হরিদ্রাগ্রামের রায়বংশ লোপ পায় নাই। কৃষ্ণকান্ত রায়ের নামও ডুবে নাই। কারণ, কৃষ্ণকান্তের ত্যাজ্যপুত্র হরলালেরও একটি পুত্র ছিল এবং তাঁহার আর এক পুত্র বিনোদলালও ছিলেন। গিয়াছিল কেবল রামকান্তের বংশ। আর গোবিন্দলালেরও ঐশ্বর্য ছারখার হয় নাই—ঐশ্বর্য নষ্ট হয় নাই। ভ্রমরের কার্যে তাহা বিবর্ধিত হইয়াছিল এবং রামকান্তের দৌহিত্র শচীকান্ত মাতামহের সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার লাভ-ক্ষতি বিচারের কোন প্রয়োজন আছে কি?

সে যাহাই হউক, ভ্রমরের পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল আর হরিদ্রাগ্রামে আসিল না—"অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনায়" ভ্রমর তাহাকে মাসে যে পাঁচশত টাকা পাঠাইত, তাহাতে কলিকাতায় জীবনযাপন করিতে লাগিল। তথায় বহু লোকের মধ্যে অনেক পরিচয় অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।

ভ্রমরের রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণতি লাভ করিল। ভ্রমরের কেবল দুঃখ, সে গোবিন্দলালকে শেষ যে কথা বলিয়াছিল, তাহা বুঝি সত্য হইল না—"আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই আর ত দেখা হইল না।"

সেই কথা বলিয়া ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে হিন্দু স্ত্রীর চিরাগত সংস্কার ত্যাগ করে নাই। যখন গোবিন্দলাল অন্নাভাবে লিখিয়াছিল—"আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব" তখন ভ্রমর উত্তরে লিখিয়াছিল, "আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" সেই কথার সহিত মৃত্যুদিনে ভ্রমরের দুঃখের অভিব্যক্তির অসামঞ্জস্য নাই। ভ্রমর ইহজন্মে যে স্বামীর প্রতি ভালবাসায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল, যে স্বামীর আদর্শ সে—"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ, দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ" সেইভাবে হৃদয়ে রাখিয়াছিল, গোবিন্দলাল সেই আদর্শ কলঙ্কিত করিয়াছিল—তাহার সহিত আর লৌকিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না—তাই ভ্রমর লিখিয়াছিল, ইহজন্মে তাহার সহিত আর গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ হইবে না। যখন ইহজন্মের শেষ—যখন সন্ধ্যা সমাগম—

"এই কূলে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদতরী।"

তখনই সে দুঃখ পাইয়াছিল—বুঝি তাহার কথা সার্থক হইল না। সে কথা যখন সার্থক হইল, তখন সে স্বামীর "চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, 'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া, আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।' সে নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল। ভ্রমরকে—

"যতনে রাখিবে রাই মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

ভ্রমর গেল—রাখিয়া গেল সংযমের, সতীত্বের, ধর্মপরায়ণতার, কর্তব্যনিষ্ঠার ও মানসিক তেজের আদর্শ। সৌরভে, গৌরবে, মানসিক বিভবে—কে ভ্রমরকে অতিক্রম করিবে? কে তাহার সমকক্ষ হইবে?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[**হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ**—প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বর্তমান কালে ইঁহাকেই প্রবীণতম সাংবাদিক বলা চলে। ইনি এখনও যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম আছেন। ইঁহার কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে দু-একটি উপন্যাস বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। ইঁহার অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি আছে, এখনও প্রায় প্রত্যহই বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করেন। বাংলাসাহিত্যে অসামান্য অনুরাগ। সমালোচক হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।]

রাজসিংহ: (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১)

রাজসিংহ বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। আপাতদৃষ্টিতে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতিও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া মনে হইতে পারে এবং কেহ কেহ এরূপ মতও ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ "পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পূর্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে ঠিক কি বোঝায় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সম্ভবত সে বিষয়ে কতকটা সন্দেহ ছিল। কারণ মৃণালিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" এই কথা দু'টি ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন ঃ "পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব।"

সুতরাং প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসের কি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি কোথাও এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই। তবে রাজসিংহের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ "স্থূল ঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে তেমনই রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেরূপ আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।"

ইহা হইতে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা মোটামুটি বোঝা যায়। কিন্তু আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে একমত নহেন। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত আনন্দমঠের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ "বঙ্কিম নিজে এই শ্রেণীর সাহিত্যকে একটি বড়ই সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।" দুর্গেশ-নন্দিনীর ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, ইহা "বঙ্গসাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস।" আনন্দমঠের ভূমিকা পড়িলে মনে হয় যে, আচার্য যদুনাথ সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ভূমিকায় তিনি এবিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং দুইজন বিদেশীয় পণ্ডিতের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই সমুদয় আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বিদ্যমান না থাকিলে কোন উপন্যাস 'ঐতিহাসিক' পদবাচ্য হইতে পারে না।

১। উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তিগুলি ইতিহাসে সুপরিচিত এবং তাঁহাদের মূল কাহিনী ও চরিত্র যথাসম্ভব সত্যের অনুযায়ী হইবে।

২। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ঘটনা এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমি হইবে।

৩। যে যুগে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী, চিন্তার ধারা, বিশ্বাস ও সংস্কার প্রভৃতি উক্ত উপন্যাসে যথাসম্ভব প্রতিফলিত হইবে।

৪। অপ্রধান চরিত্র ও অবান্তর ঘটনা সৃষ্টি বিষয়ে ঔপন্যাসিকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু তিনি এমন কিছু কল্পনা করিবেন না যাহা সুপরিচিত ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী। অর্থাৎ অপ্রধান চরিত্রগুলি ও ঘটনাবলী যে ঐতিহাসিক সত্য তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু 'ইহা সম্পূর্ণ অসত্য' এইরূপ মনে করিবার যেন সঙ্গত কোন কারণ না থাকে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই লক্ষণগুলি স্বীকার করিয়া লইলে রাজসিংহ ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসই এই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। দুর্গেশনন্দিনীর প্রধান নায়ক-নায়িকা—জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা—কেহই ঐতিহাসিক চরিত্র নহেন। জগৎসিংহ নামে মানসিংহের এক পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অল্পবয়সে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া মারা যান, এবং তিনি স্বয়ং নহেন, তাঁহার পুত্র মহাসিংহই বাংলায় গিয়া যুদ্ধ করেন। সুতরাং নাম ব্যতীত দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহ ও ঐতিহাসিক জগৎসিংহের অন্য কোন সাদৃশ্য নাই। মৃণালিনীর প্রধান নায়ক-নায়িকা পশুপতি, হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, মনোরমা—কেহই ঐতিহাসিক চরিত্র নহেন। ইহাতে কেবল দুইটি ঐতিহাসিক চরিত্র আছে—লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ার খিলিজি; কিন্তু এই দুইজনেই নিতান্ত অপ্রধান এবং মূল উপন্যাসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অতিশয় ক্ষীণ। আনন্দমঠে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ রূপ প্রধান ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য বটে, কিন্তু যে ঐকান্তিক দেশভক্তি এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য ও প্রাণ তাহা বর্ণিত যুগের পক্ষে একেবারে অসত্য। অর্থাৎ বৃটিশ অধিকারের প্রাক্কালে জন্মভূমির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা সত্যিকারের ভোজপুরী বিদ্রোহী সন্ন্যাসী তো দূরের কথা, বঙ্গমাতার কোন 'সন্তানকেই' অনুপ্রাণিত করে নাই, ইহা অবধারিত সত্য। দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম প্রভৃতি উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করিলে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহাই সর্বথা সত্য এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেও যে তাঁহার গূঢ় অন্তর্দৃষ্টি ছিল, ইহা তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

এক্ষণে দেখা যাউক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের উক্ত লক্ষণগুলি রাজসিংহে কতদূর বর্তমান। ইহার প্রধান চরিত্রগুলি—আওরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, রূপনগরের

রাজকুমারী—এবং কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। আওরঙ্গজেব ও রাজসিংহের চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক সত্যের অনুযায়ী। জেব-উন্নিসা ও রূপনগরের রাজকন্যার চিত্রও সে যুগের মুঘল বাদশাহজাদী ও রাজপুত-কন্যার সাধারণ চিত্র হিসাবে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। রাজসিংহের মূল কাহিনী—আওরঙ্গজেবের সহিত রাজসিংহের যুদ্ধ—একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমগ্র উপন্যাসের উপযুক্ত পটভূমি। এই উপন্যাসে মুঘল বাদশাহের অন্তঃপুর, আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ও তাহার ফলে রাজপুতের অসন্তোষ প্রভৃতি যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ঐ যুগের উপযুক্ত। সমগ্র উপন্যাসখানি পড়িলে ঐ সময়কার যে চিত্র আমাদের মনে জাগিয়া উঠে তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাহা প্রধান প্রধান লক্ষণ তাহা যে রাজসিংহে বর্তমান ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাজসিংহ লেখেন তখন ঐ যুগের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী ও মানুচীর বিবরণের সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত সংস্করণ অবলম্বন করিয়া টড ও অর্মে যে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাই তৎকালে সকলে বিশ্বাস করিত। রাজসিংহ উপন্যাসের প্রধান ঘটনাও এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে বহু গবেষণা করিয়া আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ অনেকে এই সময়কার যথার্থ ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাহা করিতে পারেন নাই এজন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না, এবং ইহাতে তাঁহার প্রতিভা ও কীর্তি ম্লান হয় নাই; কারণ, তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক নহেন। প্রচলিত ইতিহাস যথাযথভাবে অনুসরণ করিলেই তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য তাঁহার সময়েও কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যদৃচ্ছামত তাহার মধ্য হইতে কোন একটি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ বিষয়ে তাঁহার বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল কিনা যে কোন্‌টি গ্রহণীয় কোন্‌টি বর্জনীয়। এইরূপ বিচারের দায়িত্ব ঐতিহাসিকের—ঔপন্যাসিকের নহে। কারণ এরূপ বিচার করিতে হইলে এমন অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন যাহা অনৈতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নহে।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র নির্দোষ হইলেও কয়েকটি গুরুতর ঐতিহাসিক ভ্রমের জন্য বর্তমানে এই উপন্যাসখানির গৌরব কিছু ম্লান হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ "হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ একটি ক্ষুদ্র কথা বা ছোট গল্প মাত্র ছিল। বর্তমান সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়—উপসংহারে মাত্র তিনটি পংক্তিতে চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের বিবাহ ও পরবর্তীকালে দেবীরের ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের পরাজয়ের উল্লেখ

আছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র মুঘল বাহিনীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভই হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে; ইহার জন্য "রাজসিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উপন্যাসভুক্ত করিতে হয়।" পরিবর্ধিত সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া রাজপুতের অদ্ভুত বীরত্ব ও অপূর্ব সমর-কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি একদিকে আওরঙ্গজেবের সাগরসদৃশ সেনাবলের বিস্তৃত বর্ণনা ও অপরদিকে তাঁহার চরম পরাজয় ও লাঞ্ছনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটি অতিশয়োক্তি এবং শেষেরটি মোটেই ঐতিহাসিক সত্য নহে। সসৈন্যে পর্বতরন্ধ্র মধ্যে প্রবিষ্ট আওরঙ্গজেব রাজসিংহের কৌশলে অবরুদ্ধ ও পরাজিত হন নাই। আওরঙ্গজেব নিজে এই যুদ্ধে বরাবরই জয়লাভ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার কোন সেনানায়ক সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটনা কতকটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, উদিপুরী বেগম, জেব-উন্নিসা প্রভৃতির বন্দী হওয়ার কাহিনীও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুঘল সৈন্য যে রাজপুতের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বিজয়ী আওরঙ্গজেবের প্রত্যাবর্তনের পরের কথা। উপন্যাসের যে ঘটনাটি পাঠকের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত করা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল—এবং সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সফলতাও লাভ করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে রাজসিংহের মূল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে এবং যে উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহাও কতক পরিমাণে নিষ্ফল হইয়াছে। তবে পুরাপুরি নিষ্ফল হয় নাই। কারণ আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত পরাজয় ও লাঞ্ছনার কাহিনী অসত্য হইলেও এই যুদ্ধই যে পরিণামে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের অন্যতম মুখ্য কারণ, ইহা অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং ব্যাপকভাবে দেখিলে রাজসিংহ পড়িয়া পাঠকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা পুরাপুরি না হইলেও অনেকাংশে এবং মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাজসিংহের আর একটি মুখ্য ঘটনা কতকাংশে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে রূপনগর রাজ্যের বর্ণনা দিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত নাম কিষণগড় (কৃষ্ণগড়), এবং রাজকন্যার নাম চঞ্চলকুমারী নহে, চারুমতী। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু চারুমতী স্বয়ং কুলপুরোহিতের মারফৎ রাণা রাজসিংহের নিকট বিবাহের প্রস্তাব জানান এবং রাজসিংহও সদলবলে কিষণগড়ে আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি বিবাহ করেন। ইহার জন্য আওরঙ্গজেবের কোন সেনাবাহিনীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয় নাই, এবং এই ঘটনার বহু বৎসর পরে রাজসিংহের সহিত আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ বাধে।

অন্যান্য আরও দুই একটি ছোট খাট বিষয়ে এই উপন্যাসের সহিত ইতিহাসের অনৈক্য আছে। আওরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী যোধপুরী বেগম নিছক কল্পনা; কারণ, আওরঙ্গজেব যোধপুরের কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই। উদিপুরী বেগম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কয়েকটি বিষয়ে ইতিহাসের সহিত অনৈক্য থাকিলেও রাজসিংহ যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক ইতিহাসকে বিকৃত করেন নাই, বরং ইতিহাসের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অলৌকিক সাহিত্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়। এ বিষয়েও তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে যাঁহারা বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস, কাব্য ও নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই বঙ্কিমের আদর্শ অনুসরণ করেন নাই। ফলে "ঐতিহাসিক" এই বিশেষণ থাকিলেও এগুলির অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নহে।

এতক্ষণ আমরা রাজসিংহের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। উপন্যাস হিসাবে যে এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ, তাহা এক্ষণে একপ্রকার সর্ববাদীসম্মত। বস্তুতঃ এই উপন্যাসে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপন্যাসে দেখা যায় না। একদিকে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, স্বাধীনতার জন্য উদ্দাম সংগ্রাম, শৌর্য ও বীরত্বের অপূর্ব দৃষ্টান্ত, অন্য দিকে রূপের মোহ, প্রণয়ে বাধা, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের পদে নারীর অকুণ্ঠ প্রেম-নিবেদন, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সংসারের চির-পরিচিত সুখ-দুঃখের কাহিনী একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়াছে। ঘটনা-প্রবাহের অবিরাম স্রোত, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সমাবেশ ও তাহাদের চরিত্রের অপূর্ব বিশ্লেষণ, মানুষের অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্যয়, দস্যুতা, যুদ্ধ, নরহত্যা, পৈশাচিক প্রতিহিংসা, পারাবতের দৌত্য প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও আকস্মিক ঘটনার ঘাত-সংঘাত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকৃষ্ট করিয়া রাখে। দিল্লীর বেগম মহল, রাজপুতের অন্তঃপুর, রাজপুতনার গিরিসঙ্কট, মুঘল বাদশাহের শিবির প্রভৃতি নানাবিধ দৃশ্যের বৈচিত্র্য আমাদের মনকে একেবারে অভিভূত করে। মানবচরিত্রে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ এই উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। দরিয়ার অনাবিল একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ও জিঘাংসা, মবারকের রূপজ মোহ ও মহত্ত্ব, মাণিকলালের নৃশংস দস্যুবৃত্তি ও অপূর্ব প্রভুভক্তি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বিলাসিনী বাদশাহজাদী জেব-উন্নিসার কলুষ কামনার অন্তরালে যে অকৃত্রিম প্রণয়ের শিখা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল, মবারকের পবিত্র প্রেমের ইন্ধনে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র উপন্যাসখানি আলোকিত করিয়াছে। "হয় সাপ নয় মবারক"—এই ক্ষুদ্র একটি স্বগতোক্তি দ্বারা বঙ্কিম-চন্দ্র এই নারী-হৃদয়ের অপূর্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

এই উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, ঘটনার স্রোত যেন অত্যন্ত অনাবশ্যক-ভাবে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা রচনা-কৌশলের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যশিল্পের দিক হইতে এই গ্রন্থের যে বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন তাহার পর এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবি-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি লইয়া তিনি এই বৃহৎ উপন্যাসখানির অন্তর্নিহিত ভাব ও রচনা-কৌশলের যে অপূর্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চিরদিন বঙ্গ-

সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ "বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।" এই দুইটি মাত্র বাক্যে রবীন্দ্রনাথ এই উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস-খানির যে প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন মন্তব্য যোগ করা বৃথা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এই ভূমিকার উপসংহার করিলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার
সন ১৩৫২ সাল

[**রমেশচন্দ্র মজুমদার**—যদিও ইতিহাসের অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক হিসাবেই প্রধানতঃ ইঁহার খ্যাতি, তবু সাহিত্যরসিক হিসাবেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন যাবৎ ইতিহাসের প্রধানাধ্যাপক ছিলেন। নিজস্ব গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানকালে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে ইঁহার মতামত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। চম্পারাজ্য, স্বর্ণদ্বীপ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের কয়েকটি অংশ সম্বন্ধে ইঁহার অনেকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থ আছে। অদ্যাপি ইনি গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত আছেন।]

আনন্দমঠ : (প্রথম প্রকাশ ১৮৮২)

সে আজ অনেক দিনের কথা। আনন্দমঠ যখন প্রথম পড়ি তখন সবটা বুঝিতে পারি নাই। একে তো তখন ইস্কুলে পড়িতাম; তাতে আবার এক নিঃশ্বাসে পড়ি; সাধ্য কি যে বুঝি! তবু উপক্রমণিকার কয়েকটা কথা ভুলিতে পারি নাই। "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?"—"তোমার পণ কি?"—"পণ আমার জীবন সর্বস্ব।"..."জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"..."আর কি আছে? আর কি দিব?"—"ভক্তি।" এই মূলসূত্র তখন হইতে মনে গাঁথিয়া আছে। পরে প্রথম সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া পড়িয়াছি; এমন কি আনন্দমঠেও পাশ্চাত্য প্রভাব খুঁজিয়াছি; কিন্তু প্রাণ দেওয়াটা যে বড় কথা নয়, ভক্তিই যে আসল, সে কথাটা ভুলিতে পারি নাই।

আনন্দমঠের বর্ণনা তখন ভারি ভালো লাগিয়াছিল। সেই যে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা, যাহার সঙ্গে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার এখনকার ছবি বারে বারে মিলাইয়া দেখি—সেই যে সন্তানদের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ--শান্তির সাহস ও কার্যতৎপরতা, কল্যাণীর আত্মত্যাগ, জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্ত, সবটা মিলিয়া লাগিয়াছিল চমৎকার। সে চমৎকারিতার ভাব আজও যায় নাই।

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষা। এই দিক দিয়া দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। দেবী রাণী হইতে সামান্য ঘরকরণার কাজে স্বেচ্ছায় লাগিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। সীতারাম নিষ্কাম হইতে না পারায় যাহা কিছু গড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে ভাঙিতে হইয়াছিল। আর আনন্দমঠে মহাপুরুষ আসিয়া সত্যানন্দকে শিখাইলেন—জয়লাভের মুহূর্তেও বিরোধের ইচ্ছাকে সংযত করিয়া সংগ্রামক্ষেত্র ছাড়িয়া হিমালয়ে যাইতে হইতে পারে, কারণ আমরা তো যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী নই; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া যাইতে পারে। সেকালে এই কথাটা বড় ভালো লাগে নাই। মনে হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি চাকরির খাতিরে সত্যানন্দকে সরাইয়া লইলেন। আজ বুঝিতেছি, তাহা তো নয়; পূর্ণিমার রাত্রে মেলার মাঠে যুদ্ধের পর সন্তানদের সেই কষ্টলব্ধ মুহূর্তে মহাপুরুষ যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহা তো ফাঁকা নয়, তাহার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের চিন্তারও তো সাম্য আছে—বহির্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য ভারতবর্ষের এইটুকু দরকার ছিল।

একদিন লোকে ভয়ে ভয়ে আনন্দমঠ পড়িত। পাছে পুলিশ ধরে, যদি গোয়েন্দা দেখে, এমনি সাত পাঁচ কত কি ভাবিত। আজ তাহারা স্বাধীন ভারতের ঊষার আলোকে নির্ভয়ে পড়িতে পারিতেছে। সেদিনও মনে পড়ে, কারাপ্রাচীর ভেদ করিবার পক্ষে আনন্দমঠের কত বাধাই ছিল। একখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকে 'বন্দে মাতরম্' গানটি দেওয়া ছিল বলিয়াই তাহা পুস্তকরচয়িতার নিকটে পৌঁছিবার 'অনুমতি' পায় নাই, লেখক তখন জেলে ছিলেন। আজ সে সব বাধা নাই।

১২৮৯ সালে আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়; আমি সেই সংস্করণ দেখিয়াছি। তাহার পাঠ ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। বঙ্কিমবাবু নিজের লেখা বই যে কত কাটাকুটি করিতেন, কত অদল বদল করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত আনন্দমঠে যত পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বীরভূম হইতে উত্তরবঙ্গে দৃশ্যপট পরিবর্তিত তো হইয়াছেই, সাবেক বীরভূম রাজ্যের রাজধানী 'নগর' বা রাজনগরের কথা পালটাইয়া একেবারে সাধারণ সহরের কথা করা হইয়াছে। পূর্বতন পাঠ ছিল আরও জোরালো, আরও রংদার। এখন যেখানে শেষ করা হইয়াছে সেখানেও শেষ হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে; একটা প্রতিশ্রুতিমত দেওয়া ছিল, এখন তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমবাবু কিছু মনে করিয়া উঠাইয়া দিয়া থাকিবেন। পাঠভেদ সম্বন্ধে আমি 'উত্তরায়' একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। এই দিক দিয়া আনন্দমঠের আলোচনায় লাভের সম্ভাবনা প্রচুর। কৌতূহলী পাঠক এই আলোচনায় তাঁহার কল্পনার যথেষ্ট খোরাক পাইবেন।

আনন্দমঠ বাঙ্গালীকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। স্বদেশী যুগে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর পরস্পর সম্ভাষণের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও ইহাতে প্রাদেশিকতার দোষ স্পর্শে নাই। সাম্প্রদায়িক শুদ্ধির দিক হইতে আপত্তি উঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন বাঙ্গালী ও মারাঠীও আছে যে আজও 'বন্দে'—'মাতরম্' বলিয়া পরস্পর সম্ভাষণ করে, আর পত্র লিখিতে বসিয়া 'বন্দে মাতরম্' দিয়া শেষ করে। বঙ্কিমচন্দ্র যে অমৃতবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীর, ভারতবাসীর আজ জাতীয় সম্পত্তি। অল্পদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের মুখে 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছিলেন, দিলীপকুমার বাঙ্গালী, সুতরাং এই গান তো তিনি গাহিবেনই! জাতীয় সঙ্গীতের চারিদিকে আনন্দমঠে রহিয়াছে এক অদ্ভুত চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এই চিত্র আঁকিয়াছেন। ভবিষ্যৎ আন্দোলনের সূচনা তিনি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা না পড়িলে এই একশত বৎসরের বাঙ্গালীকে বোঝা যাইবে না; আবার আনন্দমঠ না পড়িলে বঙ্কিমচন্দ্রকেও জানা যাইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কার্তিক, ১৩৫৪

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

[**প্রিয়রঞ্জন সেন**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক বলিয়াই শুধু নয়—প্রবীণ ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রিয়রঞ্জনবাবুর একটি বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। গান্ধীবাদে নিষ্ঠাবান এই কর্মী রাজনীতিক মহলেও আদর্শ চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট, ব্রিটিশ আমলে সরকারী কোপেও পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। সাহিত্য ও শিক্ষায় ইঁহার অসামান্য অনুরাগ সর্বজনবিদিত।]

দেবী চৌধুরাণী : (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪)

"যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল।" এবং "ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।" উপন্যাসের উপসংহার এইখানেই হইয়া গিয়াছিল কিন্তু গ্রন্থকারের মনস্তুষ্টি হইল না, তিনি গীতার শ্লোক উদ্ধার করিবার উপলক্ষ্যে সহসা প্রফুল্লকে সমাজের সম্মুখে আহ্বান করিয়া বসিলেন। প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিয়াছে, সে আহ্বান তাহার কানে প্রবেশ করিল না; সমালোচকেরা স্বর্গারোহণ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই আগাইয়া আসিলেন। ফলে পাঠকদের পিছাইয়া যাইতে হইল।

> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমরা তো জানি শ্রীভগবান গীতায় এই উক্তি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য তো এই যে, পৃথিবীতে ধর্মের স্থান যখন অধর্মের দ্বারা অধিকৃত হয় তখন ভগবান্ স্বয়ং কোন-না-কোন রূপ ধরিয়া মর্তলোকে অবতীর্ণ হন এবং পাপীর শাস্তি এবং পুণ্যাত্মার পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ধর্মকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অর্থই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে প্রফুল্লের পরিচয় কি হয়? প্রফুল্ল কি ভগবানের অবতার? কি অনুকূল, কি প্রতিকূল কোন সমালোচকই ইহার সুসংগত ও সুসমঞ্জস উত্তর দিয়াছেন বলিয়া জানি না।

রূপার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া যে প্রফুল্ল নিরাসক্ত রাণীগিরি করিয়া আসিয়াছে তাহারই দ্বারা বাসন মাজাইয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন—এই কথা সর্বত্রই শুনি। কিন্তু এ কথাও কি সত্য? প্রফুল্ল কোন কালে রাণীও ছিল না, সন্ন্যাসিনীও ছিল না। সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলে তবে তো জয়ের কথা উঠিত! এখানে দ্বন্দ্ব কোথায়? প্রফুল্ল চিরকালই মনেপ্রাণে গৃহস্থের ঘরের কন্যা, গৃহস্থের ঘরের বধূ। দায়ে পড়িয়া দু-দিন সন্ন্যাসিনীর গেরুয়া ধারণ করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু হৃদয়ে গেরুয়ার রং লাগে নাই। সেই প্রফুল্লকে অবতার বলিব কি করিয়া?

প্রফুল্লর নিষ্কামতার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু নিষ্কামতার উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ততটা করা যায় কি-না, সে সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়। লেখক বলিয়াছেন, "প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।...প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।" কিন্তু সন্ন্যাসিনীত্বের নিদর্শন কোথায়? তবে তাহার তীক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল এবং স্নেহার্দ্র হৃদয় ছিল; তাই দুই সপত্নী

এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদের লইয়া হাসিমুখে সংসার চালাইয়াছে। যে স্বামী সপত্নীদের প্রতি আকৃষ্ট নয় সেই স্বামীকে তাহাদের প্রতি মন দিতে বলিয়াছে, তাহাদিগকে ভালবাসিতে বলিয়াছে। ইহাকে নিঃস্বার্থপরতা বলিতে পারি, মহত্ত্বও বলিতে পারি, কিন্তু নিষ্কামতা বলিব কেন? সে তো স্বামীর সাহচর্য যথেষ্টই পাইয়াছে। কিছুটা সপত্নীদের ছাড়িয়া দিয়াছে, এই মাত্র। তাহাকে ঔদার্য বলা যায়, নিষ্কামতা বলা চলে না।

তাহার বুদ্ধির জোরে তাহার স্বামীর তালুক-মুলুক বাড়িয়াছে, তাহার স্বামীর হাতে প্রচুর নগদ টাকা জমিয়াছে—ইহার মধ্যে নিষ্কামতা কোথায়? হাঁ, একথা সত্য যে ঐ জমানো টাকার মধ্য হইতে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া অতিথিশালা নির্মাণ করায়। ইহাতেও নিষ্কামতার পরিচয় কিছু নাই। এ পঞ্চাশ হাজার টাকা সদ্ব্যয় করিয়া সে তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছে মাত্র।

রাণীত্ব ছাড়িয়া যেদিন গৃহিণী হইল সেদিন হইতে প্রফুল্লর আর কোন দুঃখ নাই। তাহার পর হইতে দিব্য সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর পুত্র-পৌত্র রাখিয়া যথাকালে প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। তবে তাহার নিষ্কামতার নিদর্শন কোথায়? তবু, কি এই প্রফুল্লকে অবতার বলিতে হইবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাস,—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এবং সীতারাম—'ত্রয়ী' নামে পরিচিত। এই তিনটি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নবরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই উপন্যাস তিনটির মাধ্যমে তিনি ধর্মতত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল চর্চা করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্যপাশ্চাত্যের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১২৯১ সাল হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নব-জীবন' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ পত্রিকায় ঐ বৎসরের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ববিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'ধর্মজিজ্ঞাসা'। ১২৯২ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত 'মনুষ্যত্ব', 'অনুশীলন', 'সুখ' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলিই সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯৫ সালে ধর্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১২৯১ সাল বা তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা যে কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছিল 'নবজীবনে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই তাহার পরিচায়ক। অনুশীলন ধর্ম কি তাহা বুঝিবার এবং দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহের অবধি ছিল না। কিন্তু তিনি জানিতেন, প্রবন্ধের, বিশেষতঃ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের, পাঠক অল্প। তাই প্রবন্ধ লিখিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন না। উপন্যাসের মধ্য দিয়া ধর্মতত্ত্বকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। দেবী চৌধুরাণী তাঁহার অনুশীলন-তত্ত্বের এক ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যান। প্রফুল্ল সেই তত্ত্বের মানবী প্রতিমা।

'কৃষ্ণচরিত্র' লেখার যে উদ্দেশ্য 'দেবী চৌধুরাণী' রচনারও সেই উদ্দেশ্য। উভয় গ্রন্থেই তত্ত্বকে দেহ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। "অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়,

'কৃষ্ণচরিত্র' কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।" প্রফুল্লও সেই উদাহরণ। একই তত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমের মনোলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রফুল্ল এক হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রফুল্লকে বলিতে বলিতেছেন, "আমি সেই বাক্য মাত্র। কতবার আসিয়াছি,......আবার আসিলাম।" বাক্য বলিতে অবশ্য "পরিত্রাণায় সাধুনাং..."—এই শ্লোকটির কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ বক্তার কথাই লেখক ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। বাক্য তো যুগে যুগে আবির্ভূত হয় না, ভগবানই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

তৃতীয় খণ্ডের শেষ দুই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর দশ বৎসর ব্যাপী সাধনার সার্থকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই সাধনা ও সার্থকতার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দীর্ঘকালব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন ব্যতীতও আমরা নূতন বউয়ের মত নারীর কল্পনা করিতে পারি। সাধনার সাফল্য যদি দেখাইতেই হয়, সে তো রাণীর নিরাসক্তির মধ্যেই দেখানো হইয়া গিয়াছে। শেষ দুই পরিচ্ছেদ না দিলেও কোনো ক্ষতি হইত না। কিন্তু প্রফুল্লকে যে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের আসনে বসাইয়াছেন! গ্রন্থ শেষ করিবার আগে তাহাকে পাঠকের সম্মুখে না আনিলে প্রফুল্ল পাঠকের হৃদয়ে আশানুরূপ দাগ রাখিয়া যাইবে না—ইহাই বোধ হয় লেখকের ধারণা। শেষ দুই পরিচ্ছেদ থাকিলেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রফুল্লকে অবতার বলাতেই রসভঙ্গ হইয়াছে। এইস্থলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্বপ্রচারক বঙ্কিমের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

অনেকটা জোর করিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও প্রফুল্লকে এক ও অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন। সাহিত্যমাত্রই যে উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ হইবে এমন কথা বলিতেছি না। এমন কি মহাকবির কাব্যেও উদ্দেশ্য সব সময় গোপন থাকে না। কিন্তু সেটা যখন প্রকট হইয়া পড়ে, তখনই পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়। দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধেও পাঠকের মনে প্রশ্নোদ্রেক হওয়ার সংগত কারণ আছে। তৎসত্ত্বেও দেবী চৌধুরাণী আজ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে যে আনন্দ দান করিয়া আসিয়াছে, যে চিন্তার খোরাক জোগাইয়া আসিয়াছে, তাহার পরিমাণ বড় কম নয়।

দেবী চৌধুরাণী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত হাতের রচনা। ভাষা, ভংগী, চরিত্রচিত্রণ, বিষয়বিন্যাস—সকল দিক দিয়াই দেবী চৌধুরাণী অনবদ্য। বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালার সমাজ, বাঙ্গালার নরনারীকে বঙ্কিমচন্দ্র যে কত নিকট হইতে দেখিয়াছেন, কতখানি মমতা লইয়া দেখিয়াছেন দেবী চৌধুরাণী তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

দেবী চৌধুরাণী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসের অন্তর্গত কয়েকটা নাম এবং কয়েকটা ঘটনা ব্যতীত সবই অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের কথা বলিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিতে বসেন নাই, বস্তুতঃ উপন্যাস লিখিবার জন্যই তিনি কিছুটা ইতিহাসের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বঙ্কিমের স্বাভাবিক শক্তিবলে উপন্যাসের মধ্যেও ইতিহাস উপেক্ষিত হয় নাই। ইতিহাসের নাম-ঘটনার সাহায্য অতি অল্পমাত্র লইয়াও বাঙ্গালার তদানীন্তন

অরাজক অবস্থার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন, কেবলমাত্র ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত কি না তাহা জানি না।

আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা
২।৮।৪৮

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

[**বিজনবিহারী ভট্টাচার্য**—বহু গ্রন্থের লেখক এবং যশস্বী অধ্যাপক বিজনবাবু ছাত্রদের জন্য সংক্ষেপিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী সম্পাদন করার জন্যই সর্বাধিক বিখ্যাত। বাংলা-সাহিত্য তথা শিক্ষার ব্যাপারে ইঁহার মৌলিক চিন্তা নানা দিকে নানা কীর্তি স্থাপন করিয়াছে। বাংলা টেলিগ্রাফ ব্যাপারে বহুদিন ধরিয়া ইনি গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহার মনীষা ও কর্মতৎপরতা কোন গণ্ডীর মধ্যেই ইঁহাকে সীমাবদ্ধ রাখে নাই—নব নব কর্মের পথে চালিত করিয়াছে। সম্প্রতি রাজনীতিতেও কর্মদক্ষতা দেখাইবার অবসর আসিয়াছে। শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে—কাউন্সিলে নির্বাচিত হইয়াছেন।]

রাধারাণী: (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬)

যুগলাঙ্গুরীয়কে আমি বাংলার ছোটগল্পের অভ্যুদয়ের শুকতারা বলিয়াছি—রাধারাণীতেই বাংলার ছোটগল্পের সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ইহা অংকুর মাত্র—অঙ্কুরে বৃক্ষলতার ভবিষ্য-জীবনের সমস্ত অংগই প্রচ্ছন্ন থাকে, কোনটিই সুপ্রকট থাকে না। রাধারাণীতেও ছোট গল্পের সকল অংগেরই পূর্বাভাস আছে—কোনটি সুপ্রকট হয় নাই।

ছোটগল্প রচিত হয় সাধারণতঃ ছোটখাটো মানুষের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ লইয়া এবং সমাপ্ত হয় ছোট খাটো পরিসরের মধ্যেই। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট সংসারের একটি ছোট মেয়েকে আশ্রয় করিয়াই গল্পটি আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু ছোটগল্প রচনার অনুকূল মনোভূমি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। সেজন্য কাংগালিনী রাধারাণীকে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যেই রাজরাণী বানাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। ছোট গল্পের প্রধান লক্ষণ বাস্তব-নিষ্ঠতা। রাধারাণীতে বাস্তবনিষ্ঠতার চেষ্টা আছে। তবে বাস্তব-নিষ্ঠার একটা প্রধান ধর্ম সর্ববিষয়ে আতিশয্য বর্জন। বঙ্কিম রাধারাণীতে উপকথাসুলভ আতিশয্য বর্জন করিতে পারেন নাই। ধনসম্পদেও আতিশয্য, দারিদ্র্যেও আতিশয্য, করুণাতেও আতিশয্য, কৃতজ্ঞতাতেও আতিশয্য, লাভেও আতিশয্য, ক্ষতিতেও আতিশয্য,—সর্ব ব্যাপারেই আতিশয্য। আতিশয্য বর্জিত হইলে রাধারাণী সর্বাংগসুন্দর ছোট গল্পই হইতে পারিত।

গীতিকবিতার মত ছোট গল্পের মূল প্রেরণা থাকে কোন একটি সুকুমার হৃদয়বৃত্তি বা গভীর মনোবেগ। রাধারাণীতে তাহা আছে। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বা রুক্মিণীকুমারের পক্ষ হইতে করুণা—রাধারাণীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতাই এই গল্পের মূল প্রেরণা। Pity melteth into love. দেবেন্দ্রের এই করুণা অনুরাগে পরিণত হইল। অনুকূল উর্বর মনোভূমি পাইয়া করুণার বীজ বাহির হইতে কোন সহায়তা না পাইয়াও অনুরাগের মহীরুহে পরিণত হইল। আর কৃতজ্ঞতার বীজও বাহির হইতে কোন পুষ্টিরস না পাইয়াও রাধারাণীর নবোদ্ভিদ্যমান যৌবনের স্বাভাবিক রসে অনুরাগবল্লীতে পরিণত হইল। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনারায়ণ অন্ধকারে রাধারাণীর চেহারাটাও দেখেন নাই, তাহার বয়স তখন মাত্র এগারো, যৌবনের স্পর্শও তখন সে লাভ করে নাই, দেবেন্দ্রনারায়ণ কেবল তাহার শিশুসারল্যের পরিচয় পাইলেন—আর তাঁহার সম্বল থাকিয়া গেল অতিমধুর একটা কণ্ঠস্বরের স্মৃতি মাত্র। আর রাধারাণীও দেবেন্দ্রনারায়ণকে দেখেন নাই অন্ধকারে। তাঁহার বয়স কত তাহাও জানেন নাই, কি জাতির লোক তিনি তাহাও জানিলেন না—দুঃসময়ে দেবতার কৃপার মত তাঁহার করুণা হইল তাহার অকূল পাথারে ভেলার মত। রাধারাণীর হৃদয়ে দেবেন্দ্র চিরদিনের জন্য দেবতারই আসন দখল করিয়া

রহিলেন। এই ব্যাপারে যে অবাস্তবতা আছে, তাহাতে রাধারাণীর গল্প উপকথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

উপকথায় নায়ক-নায়িকার মিলনে অনেক বাধা থাকে, সে বাধা জয় করিতে হয় নায়কের পৌরুষ বলে; কিন্তু সমস্যা কিছু থাকে না।

রাধারাণীতে বঙ্কিম রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধারাণী তাঁহার কল্পিত দেবতাকে মনে মনে দেহমন সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা ঠিক নাই—তিনি কোন জাতি বা কোন সমাজের লোক তাহার ঠিক নাই, তিনি বিবাহিত কিনা তাহারও ঠিক নাই, অবিবাহিত হইলেও তিনি তাহাকে ভালবাসিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। তাঁহার জন্য চিরজীবন প্রতীক্ষা করাই চলে—তাঁহাকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ইহাই রাধারাণীর জীবনের সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র দৈবের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। দৈবকে আহ্বান না করিলে এই সমস্যা একখানি উপন্যাসে পরিণত হইতে পারিত। রাধারাণী পড়িয়া তাই মনে হয়, ইহা একখানি বৃহৎ উপন্যাসের ভিত্তি। তেতালা বাড়ীর ভিত্তি গাঁথিয়া শেষে লোকে আকস্মিক অর্থাভাবে যেমন খানিকদূর দেওয়াল তুলিয়া খড় কিংবা টিন দিয়া ছাউনি করিয়া সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়—বঙ্কিমচন্দ্র যেন তেমনি কোন কারণে এই কাহিনীটিকে দৈব্যের সাহায্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। এই উপন্যাসের সম্ভাব্যতা লইয়া একটি ছোট গল্প পরিণত হইয়াছে।

গল্পের সবচেয়ে মধুর ও সুন্দর অংশ দেবেন্দ্রনারায়ণ ও রাধারাণীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে বাগ্‌বিনিময়। এই বাগ্‌বিনিময়ে যে মনোভাবের লুকোচুরির খেলা ও বক্রোক্তিলীলা আছে তাহা বঙ্কিমের নিজস্ব রচনা-চাতুর্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করিয়া এই রঙ্গ-রসিকতা ও অবহিত্থার কলাচাতুর্য তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসেও বর্তমান। বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে ইন্দিরার নাম করা যাইতে পারে।

হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব একটা সওয়াল-জবাবের ঢঙ আছে—ইহা সত্যে পৌঁছিবার অতিমন্থর অথচ সরস শোভনভঙ্গী। রাধারাণীর এই অংশে তাহা চমৎকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির দুর্ভাগ্যের পথটা অতিদ্রুত পদসঞ্চারে অতিক্রম করেন—সৌভাগ্যের পথটা অতিক্রম করেন মন্থর গতিতে।

বঙ্কিমের বিশাল পুষ্পোদ্যানে রাধারাণী যূথীর মত এক কোণে বিকশিত—কিন্তু ইহার সৌরভে কে না আকৃষ্ট হইবে?

শ্রীকালিদাস রায়

[**কালিদাস রায় কবিশেখর**—ইনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শুধু নয়, যখন মধ্যগগনে তখনই অল্প যে কয়জন কবি বাংলাদেশে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন্‌ কবিশেখর তাঁহাদেরই একজন। ছাত্রাবস্থাতেই ইঁহার বিখ্যাত

কবিতা 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' লিখিত হয়—এবং বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন উপস্থিত করে। ইনি নিজে ইস্কুলের শিক্ষক হইয়াও অসামান্য পাণ্ডিত্যবলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও বি. এ পরীক্ষায় পরীক্ষক ও প্রশ্ন-কর্তার কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার রচিত ইস্কুল-পাঠ্য বইগুলিও একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করে। সম্প্রতি সমালোচক হিসাবে প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও ইঁহার অশ্রান্ত লেখনী নানা দিক দিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া চলিয়াছে। 'কথাসাহিত্যে' প্রকাশিত 'কবিজীবনের অভিজ্ঞতা' এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিচালন সমিতির সহিত যুক্ত আছেন।]

সীতারাম : (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৭)

যিনি যে ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে নিজে মনে মনে নিঃসন্দেহ হইবেন এবং ধৃত ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার সকল প্রতিভা নিয়োজিত করিবেন, এরূপ ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ধর্ম মানুষকে বল দেয়, ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক হয়। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি স্বধর্মে আস্থাবান হইয়াও পরধর্মে বিদ্বেষ করেন না, বিশেষই তাঁহাকে সামান্যে শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসবান ছিলেন না; তিনি স্বীয় বুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিচারের দ্বারা তন্মধ্যে বহু বিকৃতির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কালের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির মত হিন্দুধর্মের আশ্রয় তিনি ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মানসনেত্রে হিন্দুর ধর্মের একটি রূপ তিনি সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেন। বাক্যে এবং ব্যবহারে তাহারই প্রচার তাঁহার শেষ জীবনের একমাত্র কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র লেখক এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' লিখিয়াছিলেন; এই সকল উদ্দেশ্যমূলক রচনার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শিল্পপ্রতিভাকে খর্ব করিয়াছেন—বহু শিল্প-রসিককে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনা যায়। কিন্তু যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের অন্যান্য রচনা—তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন', তাঁহার "দেবতত্ত্ব" ও তাঁহার গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না; ইহা না করিলে তিনি নিজ জীবনের সকল সাধনাকেই নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া পীড়িত হইতেন। হিন্দুধর্মবিষয়ক এই প্রচারকে তিনি নিজের দেশবাসীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই; ইংরেজী ভাষাতেও, যে হিন্দু-ধর্মে তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাহার একটা রূপ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে শাস্ত্র ও তত্ত্বকথার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' গল্পচ্ছলে, নায়কনায়িকাদের কল্পিত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সেই তত্ত্বকথাই প্রচারের চেষ্টা দেখি। যাহাকে তিনি অনুশীলন-ধর্ম আখ্যা দিয়াছেন, এই তিনখানি উপন্যাসে তাহারই ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই তত্ত্বকথা প্রচার ছাড়াও এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দুইটি ধারণা ওতপ্রোত হইয়া আছে—হিন্দু ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং বাঙালী হিন্দুর বীরত্ব। 'মৃণালিনী'তে যাহার বীজ, 'কমলাকান্তের' "আমার দুর্গোৎসবে" ও "একটি গীতে" যাহার অঙ্কুর, 'আনন্দমঠে'র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতে যাহার মন্ত্ররূপ, 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'সীতারামে' তাহারই পরিণতি এবং সমাপ্তি। হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে পারিলেও বাঙালীর বীরত্বকে ফলপ্রসূ করাইতে পারেন নাই। যে

অভিশাপে 'মৃণালিনী'র পশুপতির নিমিত্তাধীনে বাঙালী বীর হেমচন্দ্র বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিশাপেই তাঁহার শেষ উপন্যাসের নায়ক সীতারাম গঙ্গারামের নিমিত্তাধীনে উচ্ছন্ন গিয়াছেন। স্বামী সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক কেহই বঙ্কিমচন্দ্রকে শেষ ভরসা দিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে বাঙালী নারীমহিমার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র অধিক আস্থাবান ছিলেন, প্রফুল্লকে দিয়া সংসার গড়িয়াছেন; সাম্রাজ্য ভাঙান নাই। নারীজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপূজা মাতৃপূজার রূপ লইয়াছে।

এই মাতৃপূজার সহিত 'আনন্দমঠে' অন্য যে একটি প্রবৃত্তি মাখামাখি হইয়া আছে, **১২৮১** বঙ্গাব্দের ফাল্গুন-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে'র 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "একটি গীতে" তাহার প্রথম দর্শন পাই; 'আনন্দমঠ' ঠিক ইহার আট বৎসর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। হিন্দুজাতিকে স্বাধীন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের মনে কখনও নির্বাপিত হয় নাই; যদিচ পরিণত বুদ্ধির সহায়তায় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দুর লক্ষ্য নয়। তাঁহার 'আনন্দমঠে'র শেষ দৃশ্যে বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীন হইবার এই প্রবৃত্তি তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন নাই এবং এই কারণেই 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা মৃত্যুপণ করিয়াছিল। "একটী গীতে" দেখিতে পাই—

"গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি।

...মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন।"

'আনন্দমঠে'র সন্তানসম্প্রদায় বঙ্গজননীর এই লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপরিসীম প্রবৃত্তি স্বত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়গৌরব দিতে পারেন নাই। 'আনন্দমঠে'র ট্র্যাজেডি ইহাই।

'সীতারামে' এই ট্র্যাজেডি ভয়াবহ এবং শোচনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে এই পুস্তক রচনার ইতিহাস বলা একটু প্রয়োজন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার-রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া প্রাদ্রি হেস্টি হিন্দুধর্মের প্রতি যে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" নামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের ঘটনা। ফলে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখেন *Letters on Hinduism.* এই অসম্পূর্ণ

পত্রগুলিতে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী' রচনার সূত্রপাত--'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী'র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (১২৯১, শ্রাবণ) বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এই মাসেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন'ও আত্মপ্রকাশ করে। এই দুইটি সাময়িকপত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন ধারণা লিপিবন্ধ এবং প্রচারিত করিতে থাকেন। 'সীতারাম' 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যা হইতেই বাহির হইতে থাকে। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে ১২৯৩ সালের মাঘ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ইহা প্রকাশিত হয়, মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যাতেই (শ্রাবণ, ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র পরপর দুইটি প্রবন্ধ লিখিলেন— "বাঙ্গালীর কলঙ্ক" ও "হিন্দুধর্ম"। এই দুইটি রচনায় 'সীতারাম' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। "বাঙ্গালার কলঙ্কে" তিনি লিখিলেন—

"যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তান মাত্রেই আমাদের সহায় হউন।

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গলারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতিসম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্ন-দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটি কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল্য নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাসমাত্র।...

বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী তেজস্বী বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"

এই মনোভাব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, মেনাহাতী (মৃন্ময়) নিতান্ত তাঁহার মানসপুত্র নয়।

এই গেল 'সীতারামে'র এক দিক। অন্য দিকে "হিন্দুধর্ম"। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংখ্যা 'প্রচারে'র দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"...জাতীয় ধর্মের পুনর্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা পাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।"

অনেকের এখনও বিশ্বাস আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নূতন টিকি-বৈদ্যুতিক হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন কি ইহার উল্লেখ করিয়া সে-যুগের ব্রাহ্মসমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয়, তাহার প্রমাণস্বরূপ এই স্থানে উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের পাদটীকাটি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।"

ইহার পরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"...যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা। আর এক হিন্দুধর্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি।...যে সমাজ ধর্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ধর্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, কোন্ ধর্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।...কতকগুলো বন্য জাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলি অনার্য জাতিকে অধিকৃত

করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই।...

যখন ধর্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কি গতি আছে?

...যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম।...এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দু-ধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে।"

এই বিশ্বাস এবং আস্থা লইয়া 'সীতারামে'র সূত্রপাত। "হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দু সমাজের আর কী গতি আছে?" এই মন্তব্য সপ্রমাণ করিবার জন্যই যেন গঙ্গারাম ও ফকিরের কথা দিয়া উপন্যাস আরম্ভ করা হইয়াছে।

"গঙ্গারাম অতীব দুঃসময়ে, নিতান্ত অকারণে বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছে; বিমূঢ় হিন্দু দর্শকেরা শুধু ভিড় বাড়াইতে আসিয়াছে, তাহাদের কিছু কবিবার নাই। গঙ্গারামের হইয়া তাহার ভগিনী শ্রী সীতারামের শরণাগত হইয়াছিলেন। সীতারাম বিনীতভাবে বধ্যভূমিতে কাজির নিকট গঙ্গারামের জীবন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ধনসম্পদের দিক দিয়া সর্বস্ব পণ করিয়া বলিয়াছেন, ফকির রাজি হন নাই।

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্বস্ব দিতেছ?

সীতারাম বলিলেন—

ও আমার যেই হৌক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম।

কাজি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, সীতারাম পুনরায় বলিলেন—

এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে। রাজা ঔশীনর, আপনার শরীরের সকল মাংস কাটিয়া দিয়া একটি পায়রাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আমাকে গ্রহণ করুন—ইহাকে ছাড়ুন।"

এই ঘটনার পর যাহা ঘটিয়াছিল 'সীতারামে'র পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বধ্যভূমি হইতে গঙ্গারামকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার পরে আরও কিছু ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ আরও কিছু বঙ্কিমচন্দ্র ঘটাইয়াছিলেন, যাহা বর্তমান যুগের পাঠকের দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গিয়াছে। যে কোনও কারণেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচারে' এবং প্রথম সংস্করণ পুস্তকে ইহা ছিল। অর্থাৎ ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেন নাই। 'সীতারাম' এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে এই পরিত্যক্ত অংশের পুনঃসংস্থাপন প্রয়োজন।

"সকলেই চলিয়া গেল। মাঠে আর কেহ নাই। কেবল একা সীতারাম—সেই বৃক্ষমূলে, যে ডালের উপর চণ্ডীমূর্তি শ্রী দাঁড়াইয়া, রণজয় করিয়াছিল, সেই ডাল ধরিয়া ভূতলে

দাঁড়াইয়া সীতারাম একা। আমাদের সকলেরই কখনও কখনও এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্তের দ্বারা সমস্ত জীবন শাসিত হয়। সীতারামের তাই হইল। ভাবিতে-ছিলেন, এ কাণ্ড কি? কেন হইল? কে করিল? ভাল হইয়াছে কি? ইহার কারণ কি? উপায় কি? কিসের লক্ষণ?

যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেই দিকে দেখিতে পান, মুসলমানের অত্যাচার।

সুরাসুর মনে পড়িল। বৃত্র, সম্বর, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ, বলি, প্রহ্লাদ, বিরোচন—কে মারিল? কেন মরিল? কেনই বা হইল? কেনই বা মরিল?

তাহার পর রাক্ষস—মানুষ, ইহাদের কথা মনে পড়িল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, অলম্বুষ, হিড়িম্ব, বক, ঘটোৎকচ, দন্তবক্র, শিশুপাল, একলব্য, দুর্যোধন, কংস, জরাসন্ধ—কে মারিল? কেন মরিল? নহুষ কেন অজগর হইল?

শেষে মনে মনে স্থির হইল, সেই দুর্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রক্ষিপ্ত সার এই পাইলেন—দেব। দেব—অর্থে ধর্ম।

তখন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সীতারামের মনের ভিতর উপস্থিত হইল। যেমন আলোক দেখিতে দেখিতে চোখ বুজিলে, তবু অন্ধকারের ভিতর একটু রাঙ্গা রাঙ্গা ছায়া দেখা যায়, প্রথমে মনে হয়, ভ্রম মাত্র, তার পর বুঝা যায় যে, সব ভ্রম নয়, সত্য আলোকের ছায়া, সীতারাম সেই রকম একটু রাঙ্গা ছায়া দেখিলেন মাত্র। তার পর, যেমন বনস্থ ভূপতিত পত্ররাশি মধ্যে প্রথম যেন একটু খদ্যোতোন্মেষবৎ অগ্নি দেখা যায়, বড় ক্ষীণ বটে, কিন্তু তবু আলো, তেমনি আলো বলিয়া, সীতারামের বোধ হইল। হায়! হৃদয়ের ভিতর আলো কি মধুর! কি স্বর্গ! অথবা স্বর্গ ইহার কাছে কোন্ ছার! যে একবার, আপনার হৃদয়ে আলো দেখিয়াছে, সে আর ভুলে না! জগতের সার সুখ প্রতিভা। প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।

জোনাকির মত তেমনই একটা আলোক, সীতারাম আপনার হৃদয়মধ্যে দেখিলেন। যেমন বনতলস্থ শুষ্ক পত্ররাশি মধ্যে সেই খদ্যোতবৎ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, ক্রমে একটু একটু করিয়া বাড়ে, ক্রমে একটু একটু করিয়া জ্বলে, সীতারামও আপনার হৃদয়ে তাই দেখিলেন। দেখিলেন, ক্রমে অনেক শুষ্ক পত্র ঝরিয়া গেল, ক্রমে সেই অন্ধকার বন আলো হইতে লাগিল। ক্রমে সে শ্যামল পল্লবরাশি শ্যামলতা হারাইয়া উজ্জ্বল হরিৎ প্রভা প্রতিহত করিতে লাগিল,—ফুলে, ফলে, পাতায়, লতায়, কাণ্ডে, দণ্ডে, উজ্জ্বল জ্বালা কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সব আলো শেষ ঘোর দাবানল, সব অগ্নিময়, শত সূর্য-প্রকাশ!। তখন সীতারাম বুঝিলেন, হৃদয়ের সে আলোটা কি। বুঝিলেন, হৃদয়ে সহসা যে প্রভাকর উদিত হইয়াছে, তাহার নাম—

হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন!

বুঝিলেন, এই সূর্যে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

সীতারাম বুঝিবামাত্র ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। প্রতিভাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধৈর্য রক্ষা করে! প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বলিলেন, 'এই বাহু! ইহাতে কি বল

নাই? কে এমন তরবারি ধরিতে পারে? কাহার বন্দুকের এমন লক্ষ্য! কাহার মুষ্টিতে এত জোর! এ রসনায় কি বাগ্দেবীর প্রসাদ নাই? কে লোকের এমন মন হরণ করিতে পারে! আমি কি কৌশল জানি না—'

সহসা যেন সীতারামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হৃদয়ের আলো একেবারে যেন নিবিয়া গেল। 'এ কি বলিতেছি! আমি কি পাগল হইয়াছি! আমি কি করিতেছি! আমি কে! আমি কি! আমি ত একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা -সমুদ্র-তীরের একটি বালি! আমার এত দর্প! এই বুদ্ধিতে হিন্দু-সাম্রাজ্যের কথা আমার মনে আসে! ধিক্ মনুষ্যের বুদ্ধিতে!'

তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্ব কার্যের প্রবর্তক, সর্ব কর্মের ফলদাতা, সর্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন, তিনিই বল! তিনিই বাহুবল! তিনিই ধর্ম! ধর্মচ্যুত যে বাহু-বল, তাহা পরিণামে দুর্বলতা। সীতারাম তখন বুঝিলেন, ধর্মই হিন্দুসাম্রাজ্য-সংস্থাপনের উপায়।

"সীতারামের হৃদয় অতিশয় স্নিগ্ধ, সন্তুষ্ট ও শীতল হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বধর্ম প্রচার তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। তাই বলিয়া কল্পনা করিবার হেতু নাই যে, তিনি অন্য ধর্মকে হিংসা বা বিদ্বেষ করিতেন। একজন সৎ খৃষ্টান অথবা সৎ মুসলমান স্বধর্মের প্রচার ও প্রসার কামনা করিয়া যদি পরধর্মবিদ্বেষী না হন, বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাতেই ধর্মবিদ্বেষ ধরিয়া লওয়া হয় কেন? তিনি যে বিদ্বেষী ছিলেন না, তাহার জন্য প্রমাণ 'সীতারামে'ই ছিল, দুঃখের বিষয় সে অংশও পরিত্যক্ত হইয়াছে। শ্যামপুরে রাজ্যস্থাপন করিবার পর সীতারাম সপরিবারে ভূগর্ভস্থ লক্ষ্মীনারায়ণজিউর মন্দির দেখিতে গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়ই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিনজনে মন্দিরদ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে মন্দিরদ্বারে দেবমূর্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে বাবা তুমি?'

মুসলমান বলিল, 'আমি ফকির!'

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্বনাশ।

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্বনাশ কিসে হইল!

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈকি! তোমার এমন দুর্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমার এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দিরদ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথায়? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্বব্যাপী সর্বঘটে সর্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন!

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না-- আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, 'এইরূপ আমাদের দেশাচার।'

ফকির বলিল, 'বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্ম-রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে; অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান-রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।"

সীতারাম যখন "রাত্রি ডাকিনী" অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছেন, তখন এই চাঁদশাহ ফকির মহম্মদপুর ত্যাগ করিয়া মক্কা যাত্রা করেন। কারণ-স্বরূপ তিনি চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে বলেন—

"যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

এই পংক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র বুকের রক্ত দিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই কথা আমরা যেদিন উপলব্ধি করিব সেই দিনই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস রচনা সার্থক হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[**সজনীকান্ত দাস**—কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক—সব দিকেই সজনীকান্তের কীর্তি অসামান্য। ইঁহার সম্পাদনায় 'শনিবারের চিঠি' সাময়িক পত্র-জগতে এক নূতন ধরণের বৈশিষ্ট্য আনিয়াছে। এই কাগজটিকে ভয় করেনা—এমন লোক দুর্লভ। সজনীকান্ত বহুদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। কিছুদিন বঙ্গশ্রীরও সম্পাদনা করেন। কাব্যরচনায়—বিশেষত রঙ্গ কবিতায়—ইঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা। গদ্যরচনাও ইঁহার কবিখ্যাতির খুব পিছনে পড়িয়া নাই। ব্রজেন্দ্রনাথের সহযোগী হিসাবে এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে ইনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন তাহা সত্যই অমূল্য। এজন্য সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। দীর্ঘদিন সাহিত্যপরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন—অধুনা এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এমন বন্ধুবৎসল লোকও বিরল। ইঁহার সমসাময়িক বহু সাহিত্যিক বন্ধু তাঁহাদের খ্যাতির জন্য সজনীকান্তের কাছে ঋণী। ইঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহ অতিশয় মূল্যবান। একটি প্রেস, সাময়িক পত্র, প্রকাশক প্রতিষ্ঠান—এতগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্র—ইহা ছাড়াও বাহিরের বহু বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রেও ইঁহার ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে শিক্ষাবিভাগেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।]

বঙ্কিমচন্দ্র

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫) রাত ৯টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মেদিনীপুরের ডেপুটি-কলেক্‌টার। ছ' বছর বয়সে মেদিনীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একদিনে তিনি বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেন। এগারো বছর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ষোল বছর বয়সে জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। আঠারো বছর বয়সে সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। দু'বছর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়েন। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং তার পরের বছর সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৮ সালের ২৩শে আগষ্ট তিনি যশোহরে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি-কলেক্‌টরের কাজে যোগ দেন। ১৮৬৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দিয়ে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৮৪৯ সালে এগারো বছর বয়সে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গাঁয়ের এক বালিকার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। কনের বয়স তখন পাঁচ বছর। দশ বছর পরে এই পত্নীর মৃত্যু ঘটে। ১৮৬০ সালে জুনমাসে তিনি তিনি আবার বিবাহ করেন, কন্যা হালিসহরের চৌধুরী-বাড়ীর বারো বছরের মেয়ে, নাম রাজলক্ষ্মী দেবী।

১৮৫২ সালে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় সংবাদ-প্রভাকরে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, এবং প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয় ওই কাগজেই ২৩শে এপ্রিল তারিখে।

গ্রন্থাবলী :

১। ললিতা ও মানস (কাব্য)—১৮৫৬
২। দুর্গেশনন্দিনী—১৮৬৫
৩। কপালকুণ্ডলা—১৮৬৬
৪। মৃণালিনী—১৮৬৯
৫। বিষবৃক্ষ—১৮৭৩
৬। ইন্দিরা—১৮৭৩
৭। যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪
৮। লোক রহস্য—১৮৭৪ (প্রবন্ধ)
৯। বিজ্ঞান রহস্য—১৮৭৫ (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)

১০। চন্দ্রশেখর—১৮৭৫
১১। রাধারাণী—১৮৮৬
১২। কমলাকান্তের দপ্তর—১৮৭৩-৭৫ (প্রবন্ধ)
১৩। বিবিধ সমালোচনা—১৮৭৬
১৪। রজনী—১৮৭৭
১৫। উপকথা—১৮৭৭ (ছোট ছোট উপন্যাস : ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে)
১৬। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী—১৮৭৭
১৭। কবিতা পুস্তক—১৮৭৮
১৮। কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৭৮
১৯। প্রবন্ধ পুস্তক—১৮৭৯
২০। সাম্য—১৮৭৯
২১। রাজসিংহ—১৮৮১-২
২২। আনন্দমঠ—১৮৮২
২৩। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—১৮৮৪
২৪। দেবী চৌধুরাণী—১৮৮৪
২৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস—১৮৮৬ (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, একত্রে)
২৬। কৃষ্ণচরিত্র—১৮৮৬
২৭। সীতারাম—১৮৮৭
২৮। বিবিধ প্রবন্ধ—১৮৮৭ (বিবিধ সমালোচনা ও প্রবন্ধ পুস্তক একত্রে)
২৯। ধর্মতত্ত্ব—১৮৮৮
৩০। বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯২
৩১। সহজ রচনা-শিক্ষা—১৮৯৪
৩২। সহজ ইংরেজী-শিক্ষা -১৮৯৪
৩৩। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা—১৯০২
৩৪। Rajmohon's wife—১৮৬৪

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাংলাভাষায় উপন্যাস-লেখক। তাঁর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরে দুলাল' নামে একখানি বই লেখেন বটে কিন্তু তা' আদর্শ বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়ঃ—

প্রথম পর্ব—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী

দ্বিতীয় পর্ব—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহ

তৃতীয় পর্ব—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম

১৮৫৮ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত তিনি ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন। এই সময় যশোর, মেদিনীপুর, খুলনা, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, বহরমপুর, বারাসত, হুগলী, হাওড়া, আলিপুর, জাজপুর (কটক), ঝিনিদহ, ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে তাঁকে কাজ করতে হয়।

১৮৮৭ সালে তিনি উত্তর ভারতে মির্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, কাশী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ও এলাহাবাদ ভ্রমণ করেন।

১৮৮৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হয়েছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৮৯২ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য 'বেংগলি সিলেক্সন' প্রকাশ করেন।

১৮৯২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পান। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে সি-আই-ই উপাধি পান।

বঙ্কিমচন্দ্র সৌখীন পুরুষ ছিলেন। রোজ দাড়ি কামাতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য রক্ষা করে চলতেন, কিন্তু 'বাবু' ছিলেন না। জামার বুকের বোতাম বাড়ীতেও খোলা থাকতো না। চশমা ঝক্‌ঝক্ করতো। ঘরের আসবাব-পত্র থাকতো সুবিন্যস্ত। প্রতিবারে লেখার পর কলমটি মুছে রাখতেন। গুড়গুড়ি থাকতো মাজা। তিনি মিঠা সুগন্ধি তামাক খেতে ভালবাসতেন।

বঙ্কিমবাবু গান গাইতে পারতেন। যদু ভট্ট তানরাজ নামে এক বিখ্যাত সংগীত শিক্ষককে তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন দিয়ে গান শিখেছিলেন।

আলীপুরে চাকরী করার সময় তিনি কলেজে শরীরতত্ত্বও

১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে তেরো মাস তিনি হাঁপানীতে খুব ভুগেছিলেন। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে বহুমূত্র রোগে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, তেইশ দিন ভুগে ৮ই এপ্রিল (২৬শে চৈত্র ১৩০০) বেলা ৩।২৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ছিল না, তিন কন্যা ছিল—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। বিধবা রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহুদিন জীবিত ছিলেন।